(বিবিধ প্রবন্ধ)

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্, এ,

অধ্যাপক, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ,

কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ

Calcutta.

PRINTED BY A. BANERJEE :
Metcalfe Printing Works, 34, Mechua Bazar Street.

১৩২০

 [মূল্য ॥• আ

ভূমিকা

[শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক লিখিত]

পঞ্চম বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে আমি বলিয়াছিলাম, 'গ্রন্থকার আমাদের অতি শ্রদ্ধার পাত্র।' অথচ তাঁহার ভাষার নিন্দা করিয়াছিলাম। সেই সময়ে তাঁহার 'নিবেদন' উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলাম যে, তিনি তাঁহার ভাষাব জন্য বিশেষ দুঃখিত এবং বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গালা ভাষা আয়ত্ত করিবার প্রয়াসই জীবনের সাধনায় প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। * * আমারও সাধনা সিদ্ধিলাভ করে নাই।" আমি বলিয়াছিলাম, "আমার বিশ্বাস, গ্রন্থকার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবেন।"

সেই "সাধনা" এখন আমার সম্মুখে উপস্থিত। গ্রন্থকার যে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এমন কথা না বলিতে পারিলেও, তিনি যে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থের ভাষার কথা এই পর্য্যন্ত। ভাবের কথা এইবার বলিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু এই ১৭১ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থখানি একেবারে ভাব-সমুদ্র। সমুদয় ভাবের একটা যেমন তেমন খতিয়ান করিয়া পাঠকগণের সম্মুখে ধরিব, সে ক্ষমতা আমার নাই। দুই চারিটি বিষয়ে নমুনা দেখাইব মাত্র।

বিনয় বাবু মিল্ স্পেন্সর প্রভৃতি পাঠ করিয়া বুঝিয়াছেন, আমিও ঐরূপেই বুঝিয়াছি, না হয়, বয়সে বড় বলিয়া তাঁহার চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বুঝিয়াছি—"প্রত্যেক দেশের জাতির ও সমাজের ক্রমবিকাশের এক একটি ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে। সেই সেই নিয়ম মেনে চল্‌তেই হবে। সকল সমাজের প্রকৃতি এক নয়—এ জন্য সকলের ব্যবস্থাও এক নয়। এক সমাজের নিয়ম আর এক সমাজের পক্ষে হানিকরও হ'তে পারে। যার যেখানে প্রাণ, সেখানটা খুঁজে বের ক'রে তবে কাজ করা উচিত।

স্বাতন্ত্র্যটা কোথায়, কোন্ বিষয়ে কোন্ কাজে লুকিয়ে আছে, এটা ঠিক ক'র্‌তে না পার্‌লে সকল শ্রমই পণ্ড হয়ে যায়। আমড়া-গাছে আমের জন্য উৎসুক হয়ে থাক্‌লে যেরূপ হয়, প্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তিও সমাজের কাছে নিবৃত্তির নিদর্শন আশা কর্‌লেও সেইরূপ ফল লাভ হয়। তাই 'ইউরোপ এ অবস্থায় এ কাজ করেছিল, আমরাও তাই করি'—এরূপ না ভেবে আমাদের এই এত হাজার বছরের জাতটা কি ভাবে চ'লে এসেছে এবং কোন্ বিষয়ে ইহার প্রকৃতির বিকৃতি ঘটেছে, এ সব অনুসন্ধান ক'রে আমরা আমাদের চরম উন্নতির জন্য কি কর্‌তে পারি, এরূপ চিন্তার স্রোত বয়েছে।" আমরা বলি, স্রোত বয় নাই, তবে দু'দশ জনের হৃদয়ে ঐরূপ চিন্তার উদয় হয়েছে বটে।

বিনয় বাবু আবার বলিয়াছেন ঃ—"ইউরোপের মনপ্রাণ বাহ্য বস্তুর দিকে। ইহার সভ্যতা ও আদর্শ স্থূল জগতের অকিঞ্চিৎকর পদার্থের সহিত জড়িত। অর্থ ইহার মূলে—সংসারের পার্থিব উন্নতিই চরম লক্ষ্য। এ জন্য প্রতিযোগিতা, জীবন-সংগ্রামের প্রকোপ এত বেশী, আর শিল্প-বাণিজ্য, কল-কারখানার এত সমাদর। তাই জড়বিজ্ঞান ইউরোপে এত উন্নত। আর টাকাকড়ির ঝন্‌ঝনানি এত বেশী ব'লে, পৃথিবীর জিনিষের প্রতি এত আশক্তি ব'লে, হৃদয়ের কোমলভাব একেবারে নাই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। * * * স্বদেশ-হিতৈষিতা ওদের কাছে মাতৃপ্রেম নয়, মনোবিজ্ঞানের সৃষ্ট একটা কেঠো নীরস "abstract conception."

আর আমাদের এই স্বদেশী—এটা কি? বলিতে লজ্জা হয়, অনেক-স্থলে এটা কি কেবল বিজাতি-বিদ্বেষ নয়? না হলেই ভাল।

বিনয়বাবু আবার বলিতেছেন ঃ—"ভারতবর্ষের সভ্যতা ও আদর্শ ঠিক ইহার বিপরীত। সাহিত্য, শিল্প, সমাজ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি—সকল বিষয়েই এক ভিন্ন ভাবের চিহ্ন পাওয়া যায়। 'সর্ব্বং পরবশং দুঃখং'—আর আত্মবশই যে সুখ, এ ভাব ভারতবাসীর মজ্জাগত। এ জন্য

বাহিরের জিনিষের প্রতি মন যাতে বিশেষ আকৃষ্ট বা আসক্ত না হয়, হিন্দুসমাজ সর্ব্বদা সেই চেষ্টাই ক'রে এসেছেন। ধর্ম্মই এ সভ্যতার মূলে। এখানে ইউরোপের প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হয় না—সহানুভূতি, প্রেম, স্বার্থ-ত্যাগ ও একান্নবর্ত্তিতাই এ দেশের প্রথা। ব্যবসাবাণিজ্যেও তাই। অর্থের প্রতি এত অনাদর বলেই জড়বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই এবং রেল-গাড়ী ও টেলিগ্রাফ্ আবিষ্কারের প্রয়োজন বোধ হয় নাই।"

এই স্থানে আমার একটা কথা বলা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। যে সকল জড়বিজ্ঞানে মানুষের শ্রম লাঘব করে বা অর্থাগম বৃদ্ধি করে, অথবা comfort বৃদ্ধি করে, সে সকল হিন্দু অবহেলা করিয়াছে বটে, কিন্তু যে সকল জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চায় শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষা হয় বা অস্বাস্থ্য হইলে, স্বাস্থ্য পুনর্লব্ধ হয়, সে সকল বিজ্ঞানের চর্চ্চায় হিন্দু অবহেলা করে নাই, কেন না, হিন্দু জানে যে, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" সেই জন্য হিন্দু স্বাস্থ্যতত্ত্ব (sanitation and hygiene) অবহেলা করেই নাই, পরন্তু সদাচারের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রভারকর এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন, Heart of Hinduism—the art of Achar সদাচারই হিন্দুত্বের মজ্জা। আমরা—ইংরাজী শিক্ষিতেরা এই মজ্জার কথা ভুলিয়াই, এত রোগে শোকে ভুগিতেছি এবং অনেকেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছি। কিন্তু বিনয়বাবু বলিতেছেন, "ইংরাজী জানা বা শিক্ষিত লোক সমাজে কয় জন? কেবল তাঁদের দ্বারাই কি দেশের উন্নতি হইবে? অনেকে মনে করেন, এঁরাই ত চরিত্র সম্বন্ধে অধিক অবনত— এঁদের কর্ত্তব্যপরায়ণতার অভাব যথেষ্ট, কষ্টের মধ্যে মন স্থির রাখিতে অনেক সময় এঁরা অসমর্থ, আর বর্ত্তমান স্বার্থের লোভে সমস্ত সমাজের ভবিষ্যৎ আশা নির্ম্মূল করিতে ইহাঁরা কুণ্ঠিত নন। এঁদের মধ্যেই অনেকে অপকারী হয়ে দাঁড়াবেন, সম্ভাবনা আছে। কিন্তু নিম্নশ্রেণী ও

জনসাধারণের চরিত্রে অনেক গুণ আছে। তাদের শরীর বেশ শক্ত—তাদের পর-নির্ভরতার ভাব নাই। তাদের মধ্যেই স্বদেশের সনাতন আদর্শ সম্পূর্ণ বিদ্যমান—এরাই দেশের প্রতিষ্ঠালাভের প্রধান অবলম্বন।"

বাস্তবিক যাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত শিক্ষার গুণে বিকৃত হয় নাই, সমাজের প্রকৃতিপদ্ধতি যাহারা কতকটা বুঝে তাহাদের দ্বারা যে প্রতিষ্ঠা হইবে, বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিগণের দ্বারা তাহা কিরূপে হইবে?

এরূপ বিড়ম্বনার প্রতীকার কিরূপে হইবে? বিনয়বাবু বলেন, আমাদের নিজে বুঝিতে হইবে এবং সকলকে বুঝাইতে হইবে, "আজকাল যাঁরা নেতা বা নায়ক ব'লে পরিচিত বা নেতৃত্ব-পদের আকাঙ্ক্ষী, তাঁরা বাস্তবিকই কোন সমাজ বা সম্প্রদায়ের নেতা হ'বার উপযুক্ত নন।" "নেতাদের মধ্যে দশ বিশ জন খাঁটি থাকিলেও থাক্‌তে পারেন; প্রায়ই মেকী।" কিন্তু "আমাদের স্বদেশসেবকেরা বর্ত্তমান নেতাদের দোষ দেখে' যেন ভগ্নোৎসাহ না হন। প্রকৃত নেতার অভাব মনে ক'রে দুঃখিত-হৃদয়ে দেশের সেবা হতে বিরত হবেন না। প্রকৃত নায়ককে যথার্থরূপে হৃদয়ের সহিত সম্মান করবার উপযুক্ত হতে চেষ্টা করুন। তাই নিজেরা এখন হ'তে স্বার্থত্যাগী হ'তে শিখুন; কারণ, নিজের স্বার্থত্যাগই নেতার প্রকৃত অর্চ্চনা।" প্রকৃত হিন্দুর মত স্ত্রীপুত্র আর পাঁচটী পরিবার লইয়া, অতিথি অভ্যাগতের সেবা করিয়া, পাড়া প্রতিবাসীর সাহায্য করিয়া—গৃহস্থালীর কেন্দ্রে বসিয়াই স্বার্থত্যাগ শিক্ষার প্রশস্ত উপায়।

আমাদের শিক্ষিতগণের চরিত্রে বিশেষভাবে এই কয়টি দোষ লক্ষিত হয়—

"(ক) অদূরদর্শিতা এবং অসহিষ্ণুতা।

(খ) স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তির অভাব এবং পরনির্ভরতা।

(গ) ব্যাপকভাবে আলোচনা-শক্তির অভাব।"

এইগুলির কারণ হইতেছে ঃ—

"(১) কর্ম্মে অনভ্যাস।

(২) ইতিহাস-বিজ্ঞানে অনধিকার।

(৩) ইউরোপের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ বিষয়ে অসম্পূর্ণ ধারণা।

(৪) স্বাধীন চিন্তা ও স্বায়ত্ত কর্ম্মের অভাব।"

এই সকল বিষয়ে আমরা সমালোচনা করিব না—গ্রন্থের প্রকরণ-পদ্ধতির নমুনা দেখাইতেছি মাত্র।

তার পর ধর্ম্মের কথা,—ভাষা-বিজ্ঞানের কথা, এ সকলের আলোচনাও এ স্থলে করিব না। একটু কারণ বলি;—এ সমস্তই প্রায় য়ুরোপীয় মতের অনুবাদ। আর য়ুরোপীয় মতের একটা প্রধান দোষ এই যে, তাঁহারা বেদকে সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ স্বীকার করেন, অথচ সেই সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থে সর্ব্ব-উন্নত মতবাদ কিরূপে আসিল, তাহা বুঝিবার একটুও চেষ্টা করেন না। এই স্থলে 'ক্রমবিকাশ'-পদ্ধতির বিষম ব্যভিচার দেখিয়া, তাঁহারা ঐ সকলের বিচারই করেন না—আমিও এ ক্ষেত্রে এই সকলের আলোচনা সেই জন্য করিলাম না।

বঙ্গ-সাহিত্য বিষয়ে গ্রন্থের প্রধান কথা "যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের বিদ্যালয়সমূহের সকল পর্য্যায়ে মাতৃভাষা প্রচলিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে না।" এখন সকলকেই ভাবিতে হইবে—"কি উপায়ে এবং কতদিনে আমাদের সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি গভীর শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের ফরাসী, জর্ম্মণ ও ইংরাজী সাহিত্যের স্থান অধিকার করিতে পারিবে।" সুতরাং আমাদের এখন প্রয়োজন ঃ—

"(১) শিক্ষা ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষা জাগরণ;

(২) অনন্যচিত্ত ও অনন্যকর্ম্মা সাহিত্য-সেবী;

(৩) আন্তরিক ভাবুকতা ও প্রকৃত বৈরাগ্য;

(৪) ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যবোধ ও সাধনা।”

সাধনায় আরম্ভ, সাধনায় শেষ। এই গ্রন্থ একটি বিরাট সাধনা। গ্রন্থের প্রকরণ-পদ্ধতির যদি যৎকিঞ্চিৎও নমুনা না দিতে পারিয়া থাকি, সে দোষ ত আমার আছে—বোধ করি, গ্রন্থেরও একটু থাকিবে। এমন গুরুতর বিষয়ে, এমন সর্ব্বজনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে, এমন আড়ম্বরশূন্য, অলঙ্কারশূন্য, নিরেট ভাষায়, এত কথার আলোচনা,—বোধ হয় বাঙ্গালায় আর নাই। ‘বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচারে’ নাই, ‘অনুশীলনতত্ত্বে’ নাই, ‘ভক্তিযোগে’ নাই—বোধ করি, আর কোথাও নাই। অথচ ঐ সকল গ্রন্থের মত লেখার ধারাবাহিকতা বা ভাবের ক্রমবিকাশ বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সুচারুরূপে নাই—সুতরাং আমার মত লোক গ্রন্থের খতিয়ান করিতে গিয়া, যে অনেকটা নিজের অকৃতিত্ব-দোষে এবং গ্রন্থের দোষে বিড়ম্বিত হইবে, তা বলিতেই হইবে।

তা থাকুক গ্রন্থে দোষ, কিন্তু এমন স্বাধীন চিন্তার পরিচয় অল্প গ্রন্থেই পাওয়া গিয়াছে। বিনয় বাবু নব্য যুবক, তিনি উৎসাহশীল, পরিশ্রমী, সহিষ্ণু। তিনি যদি গ্রন্থের পারিপাট্য সাধন তাঁহার সাধনা করেন, করিতে পারিবেন, এমন ভরসা করা অন্যায় নহে। আমরা আরও ভরসা করি, চিন্তাশীল পাঠক এই গ্রন্থের লিখিত বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়া, গ্রন্থের উপদেশাবলির শতাংশের একাংশও কার্য্যে পরিণত করিয়া শ্রীমান্ বিনয়কুমারের সাধনার সম্বর্দ্ধনা এবং আমাদের মুখ রক্ষা করিবেন।

কদমতলা, চুঁচুড়া
১৩ই শ্রাবণ
সন ১৩১৯ সাল।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

নিবেদন

ছাত্রজীবনের যতগুলি অসম্পূর্ণতা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে মাতৃভাষায় অনধিকার অন্যতম; সুতরাং মাতৃভাষা আয়ত্ত করিবার প্রয়াসই জীবনের সাধনায় প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

সকলের সাধনা সিদ্ধিলাভ করে না। আমারও সাধনা সিদ্ধিলাভ করে নাই; কিন্তু আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের কোন স্তরেই মাতৃভাষার সহিত কোনরূপ সংশ্রবে না আসিয়া কোন্ বাঙ্গালী কিরূপ বাঙ্গালা লিখিতে পারে, কাহারও কাহারও সে বিষয়ে কৌতূহল থাকা অসম্ভব নহে, এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অনেকেরই আমার দৃষ্টান্তে ভয় ভাঙ্গিতে পারে। এইরূপ ভাবিয়া গত পাঁচ বৎসরের লেখাগুলি প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।

সাহিত্য-চর্চ্চাকেই মুখ্যভাবে জীবনের কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে যেরূপ ফললাভের আশা করা যায়, এই রচনাগুলিতে তাহার কোনও চিহ্ন লক্ষিত হইবে না। একেবারে না লিখিলেই যদি চলিতে পারিত, তাহা হইলে সাহিত্য-সংসারে অনধিকার-প্রবেশের দায় হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম; কিন্তু কর্ত্তব্যের উপরোধে অনেক সময় লেখনী গ্রহণ করিতে হইয়াছে বলিয়া সাহিত্যিক-সমাজে দাঁড়াইতে হইল। এরূপ অবস্থায় অনেক ত্রুটী থাকিয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পণ্ডিতেরা তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

কিন্তু ঘষিয়া মাজিয়া ভাষার পারিপাট্য সাধন করিলেই বা কি হইবে? ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, এম্ এ, পি এইচ ডি প্রস্তুত করণ, শিল্প ও বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য বিদেশগমন ত তুমুল বেগেই চলিতেছে।

পরের কথা ভাবিবার জন্য কয়জন প্রস্তুত হইতেছেন?—ভাবের বন্যায় গা ঢালিবার জন্য কয়জন শিক্ষিত হইতেছেন?—দশের জন্য সুবিধা সৃষ্টি করিবার নিমিত্তই বা কয়জন সংকল্প করিতেছেন?—নিজকে ভুলিবার জন্য কয়জন চেষ্টা করিতেছেন?

কারখানায়, ফ্যাক্টরীতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ যথেষ্ট হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থের হিসাবটা বাড়িয়াছে। পণ্ডিত হইয়া সকলে নিজকেই বড় করিতে শিখিয়াছেন। সেরূপ পাণ্ডিত্য বাড়াইবার আর প্রয়োজন নাই। এখন দরিদ্রের বন্ধু, অশিক্ষিতের সহায়, নিম্নশ্রেণীর উপদেষ্টা লোকহিতৈষী 'মানুষের' সৃষ্টি করা যায় কি না, দূরদর্শী ব্যক্তিগণের তাহাই ভাবিবার বিষয়।

এই প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন কোনটী প্রকাশ্য সভায় পঠিত হয়। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে আরও কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। সেই গুলি সম্প্রতি 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধ' ও 'শিক্ষা-সমালোচনা' নামক স্বতন্ত্র দুই খণ্ড গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। নব্যভারত, সাহিত্য, প্রবাসী, সুপ্রভাত, আর্য্যাবর্ত্ত, বাণী, মানসী, ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন এবং প্রতিভা—এই সকল মাসিক পত্রিকার সম্পাদকগণ রচনাগুলি তাঁহাদের পত্রিকায় স্থান দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অনেকস্থলে ভাষার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। এই সুযোগে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্ এ, পি এইচ ডি, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার, কবিবর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস্

এবং প্রবীণ সমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্ মহোদয়গণ মৎ-প্রণীত ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া আমাকে সাহিত্যসংসারে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। এই অকিঞ্চিৎকর সাহিত্যানুশীলনের সঙ্গে তাঁহাদের মহনীয় নাম সংযুক্ত থাকিল, এ জন্য নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধগুলি কোনও এক বিষয় লইয়া লিখিত নহে; অথচ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় লিখিত বলিয়া স্থানে স্থানে পুনরুক্তি দৃষ্ট হইবে।

কলিকাতা
বৈশাখ, ১৩১৯। } শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এই সংস্করণে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইল না। প্রত্যেক প্রবন্ধের আলোচিত বিষয়গুলি পৃষ্ঠার পার্শ্ব হইতে ভিতরে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ জন্য পুস্তকের আকার কিছু বাড়িয়া গেল। বন্ধুবর্গের পরামর্শানুসারে মূল্য ১৲ টাকার পরিবর্ত্তে ॥০ আনা করা হইল।

কলিকাতা
বৈশাখ, ১৩২০ } শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

সূচীপত্র

সাধনা

বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা *

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দন্তি মানবাঃ ॥

যাঁহা হইতে জীবের উদয় হয়—যিনি এই নিখিল বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন—নিজের কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া মানুষ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।

শক্তির সাধন।

কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তেই মানুষের শক্তির বিকাশ হ'য়ে থাকে। শারীরিকই হ'ক আর মানসিকই হ'ক, সকল শক্তিই কষ্ট, বিপদ্, বাধার ভিতর দিয়া জন্মে। যদি কোন কাজ ক'র্‌তে না হ'ত, তবে জোর আছে কি না, বুঝাও যেত না, আর জোরের কোন দরকারই থাক্‌তো না। সেই জন্য লোকে "আগে আমার জোর হ'ক্, তার পর কাজ কর্‌তে বস্‌ব; আগে আমার মাংসপেশীগুলি পুষ্ট হ'ক, তার পর ব্যায়াম আরম্ভ কর্‌ব; আগে বুদ্ধির ও জ্ঞানের উন্মেষ হ'ক, তারপর মস্তিষ্কসঞ্চালন ক'রব; আগে আমার চিত্তশুদ্ধি হ'ক, তার পর দান-ধর্ম্ম ক'রব; আগে লোককে ভালবাস্‌তে শিখি, তারপর পরোপকার ক'রব"—এরূপ ভেবে কখনও বসে

---

* মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির প্রতিষ্ঠোপলক্ষে পঠিত। জুন, ১৯০৭।

থাকে না। যদি কোন দিন ব্যায়াম না ক'রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন না করি, তবে শরীরের শক্তি ও স্ফূর্ত্তি কোন দিনই অনুভব ক'রতে পারব না। আমি পাঁচসের বোঝা লইতে পারি, কি পঁচিশ সের বহিতে পারি, তাহার প্রমাণ কেবল সেই সেই পরিমাণ বহিবার চেষ্টা। আমি যদি কোন দিনই গণিতশাস্ত্রের একটী প্রশ্নও মীমাংসা না করি অথবা ইতিহাসের বা রাজনীতির কোন কূট সমস্যার কিনারায় আসতে চেষ্টা না করি, তবে আমার বুদ্ধিশক্তি আছে কি না, কেহ প্রমাণও পাইল না, আর আছে বলিয়া বড়াই করিবারও অধিকার আমার থাকবে না। সেইরূপ দান কর্‌তে কর্‌তে, পরের জন্য খাট্‌তে খাট্‌তেই ক্রমশঃ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম আবির্ভাব এবং দিন দিন উন্নতি হ'য়ে থাকে। "আগে সাঁতার শিখি, তার পর জলে নামিব," অথবা "শিশু হাটিতে শিখ্‌লে পর স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে শেখান যাবে"—এ সব কথা কেবল পাগলের মুখেই শোভা পাইলেও পাইতে পারে। কিন্তু সংসারের কোন লোকই ওরূপ যুক্তি ক'রে কোন বিষয়ে কখন নিশ্চেষ্ট থাকে না। দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে অনেক আছাড় খাইতে হয়, শিশুকে মাম্‌মাম্‌মা বল্‌বার পূর্ব্বে অনেক বেগ, অনেক চেষ্টা পেতে হয়। মানুষের সাত্ত্বিকভাবে দান ক'রতে পারার আগে অনেকবার রাজসিক ভাব হ'য়ে থাকে, নিজের অভিমান—"আমার যশ হক্"—এ সব ভাব বড় শীগ্‌গির ছাড়ে না। এই জন্য সকলেই আগে কাজ আরম্ভ করে, তার পর তার সাধনপথেই এবং কাজটাকে সুসাধিত কর্‌বার চেষ্টাতেই নিজের শক্তির পরিচয়ও দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পুষ্টিসাধনও ক'রে থাকে।

চরিত্র-গঠনের কারখানা—কর্ম্মক্ষেত্র

এ দেশে একটা কথা শুনা যায়, "আমরা কোন বিষয়েই দু'জনে একমত হতে পারি না, তা আবার আমরা কাজ ক'রব!" এ রকম কথা দায়িত্বহীন

বিনা পয়সায় পরামর্শদাতাদের মুখেই বেশী শুনা গিয়া থাকে। তাঁহাদের বিষয় বল্‌বার কোন দরকার নাই। তাঁদের কথা আমরা শুনি, এতদূর আশা তাঁদেরই নাই। আমরাও ইহাকে "advice graits" এর, বিনা পয়সায় পরামর্শের চুপড়ীর ভিতরে ফেলিয়া দিলে তাঁদের মন ক্ষুণ্ণ হবার কোন কারণ দেখি না। তবে এক কথা—অনেকে আছেন, যাঁরা দেশের ও সমাজের হিত হ'ক, এ ইচ্ছা হৃদয়ে বেশ পোষণ করেন এবং আমাদের লোকের ও ধর্ম্মের যাতে অভ্যুত্থান হয়, এ জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে থাটেন—তাঁদের মুখেও অনেক সময় আমাদের অনৈক্য, মতভেদ, গৃহবিবাদ, দলাদলির কথা শুন্‌তে পাই। আমাদের মঙ্গলের জন্য ইহাঁদের তিরস্কার বটে, কিন্তু এঁদের একটু বুঝ্‌বার গোল থেকে যায়।

মানুষের স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি যাঁরা রাখেন, মানসিক ও নৈতিক জগতের নিয়ম যাঁরা বুঝেন; অথবা অন্যান্য লোকেরা যা কিছু করেছে—এবং অন্য দেশে অন্য কালে মনুষ সমাজ নিজের কাজ কি উপায়ে গুছিয়ে নিয়েছে, এই সব বুঝ্‌তে চেষ্টা করেন,—এমন কি, প্রত্যেক মানুষের দৈনিক কার্য্যকলাপের ভিতরেই বা কি নিয়ম, কি পদ্ধতি লক্ষিত হয়, তার আলোচনা করেন—তাঁরা বুঝেন যে, 'আমরা আগে একমন একপ্রাণ হই, তার পর স্বদেশের কাজে ব্রতী হব,—এটা অস্বাভাবিক। কাজ যদি আরম্ভই না হ'ল—তবে একমত হ'ব কি লইয়া? একটা ইন্‌সিওরেন্‌স কোম্পানী যদি খোলা হয় বা খোলা হবে, এরূপ কোন খবর পাওয়া যায়, তবেই না সন্ধান পাওয়া যায়, কার কার মূলধন আছে, এবং কে কে অন্য ব্যবসা ছেড়ে এই পথে আস্‌তে চায়—অর্থাৎ এ সম্বন্ধে কার কার মত এক। তা না হ'লে কি হাওয়ায় হাওয়ায় ঐক্য, সামঞ্জস্য হয়? মতের একতা হবে কি বিষয়ে? আর কার মতের দরকার? কবে দরকার? কেন দরকার? মতে এক হওয়া যাবে, কি 'নানা মুনির নানা মত' হবে—এটা বুঝা যায় কখন্?—যখন মুনিদের একত্র সমাবেশ হয়েছে, তার আগে

কথনই নয়। পরে যখন অভিসন্ধি বুঝা গেল—এক জায়গায় হবার উদ্দেশ্য জানা হ'ল—কাজের তালিকা বাহির করা হ'ল, তথনই দেখা যায়, কজন এ দিকে, কজন ও দিকে এবং কেনই বা এ দিকে ও দিকে,—আর অন্তত কটা বিষয়ে সকলের মত এক এবং শুধু সেই বিষয়েই কাজ আরম্ভ যুক্তিসঙ্গত কি না।

তাই সকল কাজেরই চেষ্টার মধ্যে কর্‌বার প্রয়াসে ঐক্য হয়ে থাকে এবং ক্রমশঃ একতার প্রসার বাড়িয়া যায়। পাঁচজনে না মিলিলে একতা কথনই হয় না। তাই 'আগে একতা হক্', 'আগে আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হক্', 'আগে আমাদের দেশের লোকেরা স্বার্থত্যাগ করতে শিখুক',—'আমাদের অনেক দোষ, সে সব দোষ না শোধরালে কোন কাজের আশাই করা যায় না,'—"এ কাজ যে ক'চ্ছ হে বাপু, কত টাকার দরকার, খোঁজ রাখ—কাহারও কিছু দিবার প্রবৃত্তিই নাই,"—"চাঁদার খাতা বাহির করিলেই লোক পশ্চাৎপদ হবে," "আগে লোকের মন তৈরি কর"—ইত্যাদি অনেক কথা নিষ্কর্ম্মা বা কাজ কর্‌তে অনিচ্ছুক বা একেবারে অবোধ লোকেরাই বল্‌বেন। ও সব কথায় আমরা কাণ দিই না। আমরা জানি—দেখি, শুনি ও বুঝি—ব্যায়াম না কর্‌লে গায়ে জোর হয় না। কষ্ট না কর্‌লে কেষ্ট মেলে না—পাঁচ জনকে এক জায়গায় না মিলালে তারা এক, কি পাঁচ, কি পঁচিশ, তা বুঝা যায় না। আমরা বুঝি এই যে, মতভেদ থাকাই বাঞ্ছনীয়—কারণ, তাতেই এক মতের উপায় করিয়া দেয়। অসামঞ্জস্য আছে বলিয়া সামঞ্জস্যের এত আদর এবং তাহা সৃষ্টি করবার এত প্রয়াস। ভুল কর্‌তে শক্তি আছে বলিয়া একদিন সত্যের পথ আবিষ্কার ক'র্‌তে পার্‌ব, আশা আছে—যে শক্তি আমাকে বলিতেছে, "ভুল ক'রলে," সেই সত্য আনিয়া দিবে। আর যদি জড়ভরত হয়ে বসে থাকি অথবা উদাসীনভাবে কাল কাটাই, তাতেও এক প্রকার শান্তি পেতে পারি, কিন্তু তা মৃত্যুর চিরশান্তি। জীবিত অবস্থার শান্তি আর

এক রকমের—ইহাতে গোলমালের ভিতর নিস্তব্ধতা খুঁজিয়া লইতে হয়—বিপদের মধ্যে সম্পদ্ বাহির করিতে হয়—বিভিন্নতার ভিতর একতার চেষ্টা ক'র্‌তে হয়, বিরহেও মিলনসুখ উপলব্ধি করতে শিখতে হয়। যত কাল শরীরে প্রাণ আছে, ততকালই দন্ত চর্ব্বণ করে আর উদর নিজের কাজ করে—কিন্তু কৈ? প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কাজ থাকা সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হয়েও বড় কাজটার ত কোন বিঘ্নই উৎপাদন করে না? কিন্তু মরিলেই সব নিস্তব্ধ হয়ে যায়—তখন দন্তের আর উদরের দলাদলি থাকে না বটে, কিন্তু তখন ঐক্যই বা কোথায়?

তাই এখন আমরা একতার প্রভাব সম্বন্ধে লিখে বা বক্তৃতা শুনে এবং আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ষ্টেটসের উদাহরণ পেয়ে নিশ্চেষ্ট থাক্‌তে ইচ্ছা করি না। আমরা কাজের ভিতর দিয়া সেই শক্তির উপলব্ধি কর্‌তে চাই।

স্বদেশসেবার পুরাতন মত—কর্ম্মে ঔদাসীন্য

আমাদের এখন কি কাজ? কিছুকাল আগে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন ছিল। কারণ, তখন লোকের মনে এই ভাব ছিল—কেন? বেশ ত, প্রবলপরাক্রান্ত রাজার শাসনে আছি—টাকা পয়সার রোজগার বেশ হচ্ছে—রেলগাড়ী ডাকঘর অনেক হ'য়েছে—মান মর্য্যাদা খ্যাতি অনেক পাচ্ছি, ইচ্ছা ক'রলে দান ধর্ম্ম তীর্থ গমন বেশ সুবিধার সঙ্গেই ক'রতে পারছি—আমাদের আবার অভাব কিসের? সকল সুবিধাই সরকার বাহাদুরের সুশাসনে আমরা বিনা ক্লেশে ভোগ ক'রছি। আমরা সম্ভবতঃ কি আর ক'রতে পারি? সবই ত ওঁরা ক'রে দিচ্ছেন। নিজেদের খাট্‌বার আর দরকারই বা কৈ? কিছু চাই? ভাবছ কি? দরখাস্ত কর। একবারে পেলে না—আবার দরখাস্ত কর। এবারও জুটল না? ভয় কি? প্রেমের নিয়মই ত তাই—"জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তির-

পিত ভেল।” ‘প্রত্যাশী হ’তে ছেড়ো না,’ ‘নিজের দিকেই যদি তাকালে ত আর ভালবাস্‌লে কৈ?’ ‘ভালবাসার অর্থ পরনির্ভরতা। একবারে হ’ল না, দুবারে হ’ল না—আশা ছেড় না—হবেই, হৃদয়দুয়ার খুলবেই।’ “কেবল দরখাস্ত—‘অধিকন্তু ন দোষায়’। দুর্ভিক্ষ হয়েছে, কেন? রাজার ধনভাণ্ডার ত পূর্ণ আছেই—তোমাদেরই জন্য ত? টাকা পয়সা নিয়ে বা জমিজমা নিয়ে গোল বেধেছে—ভাবনা কি? এস উকিলের কাছে, কাছারীতে সব মীমাংসা হ’য়ে যাবে। ছেলেগুলোর ধর্ম্মশিক্ষা হচ্ছে না, দরখাস্ত কর,—শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর এখনই ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা ক’রে দেবেন।” এ এক রকম নবাবী আমল বা রামরাজ্য আর কি? কোন ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, মজা ক’রে টাকা রোজগার, পেটপূজা—হেসে খেলে বেড়ান,—আর খুব জোর মিটিং করা। “যাই করি না—বাপ্ কি আর তাড়িয়ে দিতে পারে?”—ঠিক যেন সেই ভাব! ‘অন্ততঃ কিছু ত পাবই,’ ‘তা’ নাকে তেল দিয়ে ঘুমালেই চল্‌বে।’

জাতীয় কর্ম্মে আত্মনির্ভরতার ক্রমিক অভ্যুদয়

আজ কাল কিন্তু এক নূতন ভাব দেখা যাচ্ছে। এখন যেন লোকেরা কিছু কিছু বুঝেছে যে, কোন কাজ পরে ক’রে দিলে নিজের লাভ কিছুই হয় না। আর ক’রে দেবেই বা ক’দিন? শেষে ছেড়ে দিলে ক’রব কি? নানা কারণে আমাদের দেশে এই স্বাবলম্বনের চিন্তা এসেছে। অনেকে পৃথিবীতে মনুষ্যসমাজের উন্নতির উপায় আলোচনা করে আগে হ’তেই বুঝেছিলেন। অনেকে আবার পরনির্ভরতায় বেশী কিছু হল না দেখে, হবার আশাও নাই বুঝে, নিজের শক্তির উপর দাঁড়াতে এবং “নিজেরা কি ক’রতে পারি,” এরূপ ভাবতে শিখেছেন। যে কারণেই হ’ক, এই স্বাবলম্বন, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনচিন্তার ভাব আমাদের দেশে ও সমাজে যে প্রবেশ ক’রেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

তাই আমরা কি কাজ করব এবিষয়ে উত্তর দেওয়া আর কঠিন নয়। মানুষের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক,—যত যা কাজ থাকৃতে পারে সকল বিষয়েই নিজের অধিকার স্থাপন কর। দেশের শিক্ষা আগাগোড়া দেশীয় নিয়মে ও সম্পূর্ণরূপে দেশের লোকের দ্বারা চালাও। ধর্ম্মের উন্নতির জন্য মার্টিনো বা হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের পরামর্শ তত বেশী না ল'য়ে—নিজেদের ঘরের মহাত্মাদের পথ অবলম্বন ক'রে দেখ কোন্ দিকে যাওয়া যায়। মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি ক'রতে হ'বে? সকলকে শেখান হ'ক—দেশের লোকেরাই সে সব কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন ক'রতে পারে—শালিসী পঞ্চায়েতী বাইশী ছত্রিসীর পুনরায় উত্থাপন করা হ'ক। দুর্ভিক্ষ নিবারণ ক'রতে হবে--চেঁচার্চেচি ক'রে দরকার কি? দেশের কৃষিশিল্প, বাণিজ্য পরের হাতে না দিলেই হ'ল। আমাদের দেশে কোন জিনিষেরই অভাব নাই, অন্য দেশের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য বন্ধ ক'রলে আমাদের ষোল আনা লাভ। আর মানমর্য্যাদালাভ, তা'ত সমাজের উপকারী দশটা কাজ করলেই হয়। নিজের চেয়ে দেশকে বড় মনে করলে, দেশকে উঁচুভাবে দেখলে এবং ভক্তি ক'রতে শিখলেই দেশও তোমাকে মাথায় করে রাখবে। রাস্তায় আবর্জ্জনা হয়েছে?—গ্রামে পুকুরগুলো শুকিয়ে ব্যারামের আকর হয়ে প'ড়েছে?—যাতায়াতের সুবিধা হচ্ছে না?—লোককে খবর দিতে হবে?—দূরদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখ্‌তে হবে? বেশত, সব কাজই নিজের দ্বারা সম্ভব। স্বাস্থ্যরক্ষা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার, মাম্‌লা মোকদ্দমা, শিক্ষা দীক্ষা, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন—সব বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকা কি ভাল? এখন যদি খাটতে না শিখি, পায়ের উপর দাঁড়াতে না পারি, ভবিষ্যতে কি উপায় হবে?

জাতীয় সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য

এই রকম সাত পাঁচ ভেবেই বোধ হয় আমাদের লোকেরা সকল কাজ নিজের হাতে নিয়ে "নিজেরা যতটুকু পারি তাতেই সন্তুষ্ট থাক্‌ব" এই ইচ্ছা প্রকাশ কর্‌ছেন এবং কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। অল্পদিনের ভিতরেই নিজেদের মর্য্যাদাও অনুভব কর্‌তে পেরেছেন, এবং বুঝেছেন যে বাস্তবিক দেশ পেছিয়ে নেই—এই "মরা হাড়েও ভেল্‌কি খেলান যায়।"

মিল্, স্পেন্সার, রুসো, হেগেল প্রভৃতি মহাত্মাদের পরামর্শ এত-দিন ভাল ক'রে বুঝতে না পেরে ভারতবাসী স্বদেশ, স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজকে ইউরোপের কাছে একবারে বিকাইয়া দিয়াছিল। রাষ্ট্রশাসন প্রণালী, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ধর্ম্মের উন্নতি, কৃষিবাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষার নিয়ম—সকল বিষয়ই যেন বিদেশ হইতে আমদানী না কর'লে আমাদের দেশকে আর সভ্য করা যায় না এভাব ঢুকেছিল। এখন আবার সেই মহাত্মাদেরই পরামর্শ ভাল ক'রে দেখে বুঝা গেল যে, প্রত্যেক দেশের, জাতির ও সমাজের ক্রমবিকাশের এক একটী ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে। সেই সেই নিয়ম মেনে চল্‌তেই হবে। সকল সমাজের প্রকৃতি এক নয়—এজন্য সকলের ব্যবস্থাও এক নয়। এক সমাজের নিয়ম আর এক সমাজের পক্ষে হানিকরও হ'তে পারে। যার যেখানে প্রাণ সেখানটা খুঁজে বের ক'রে তবে কাজ করা উচিত। জাতির স্বাতন্ত্র্যটা কোথায়—কোন্ কোন্ অনুষ্ঠানের মধ্যে দেশীয় আদর্শ গুলি বিশেষ ভাবে রয়েছে, কোন্ কোন্ কাজে জাতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব প্রভাব বিস্তার করেছে এই সত্য ঠিক না করতে পার্‌লে সকল শ্রমই পণ্ড হয়ে যায়। আমড়া গাছে আমের জন্য উৎসুক হয়ে থাক্‌লে যেরূপ হয়—প্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তিও সমাজের কাছে নিবৃত্তির নিদর্শন আশা ক'র্‌লেও সেইরূপ ফল লাভ হয়। তাই "ইউরোপ

এ অবস্থায় একাজ ক'রেছিল আমরাও তাই করি"—এরূপ না ভেবে 'আমাদের এই এত হাজার বছরের জাতটা কিভাবে চলে এসেছে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে ইহার প্রকৃতির বিকৃতি ঘটেছে—এ সব অনুসন্ধান ক'রে আমরা আমাদের উপযোগী, আমাদের চরম উন্নতির জন্য কি ক'র্‌তে পারি'—এরূপ চিন্তার স্রোত বয়েছে।

ইউরোপীয় ও ভারতীয় মানবজীবনের পার্থক্য

এখন বুঝেছি, ইউরোপ ও ভারত দুই ঠিক এক পথের পথিকও নয়—গন্তব্য স্থানও এক নয়। সুতরাং সকল বিষয়ে নকল করিলে সুফলের আশা করা বৃথা। ইউরোপের মন প্রাণ প্রধানতঃ বাহ্য বস্তুর দিকে। ইউরোপীয় সভ্যতা ও আদর্শ স্থূল জগতের অকিঞ্চিৎকর পদার্থের সহিতই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অর্থ ইহার মূলে - সংসারের পার্থিব উন্নতিই চরম লক্ষ্য। এজন্য প্রতিযোগিতা, জীবন সংগ্রামের প্রকোপ এত বেশী, আর শিল্প বাণিজ্য কল কারখানার এত সমাদর। তাই জড়বিজ্ঞান ইউরোপে এত উন্নত। আর আজ কাল ওখানে টাকাকড়ির ঝন্‌ঝনানি এত বেশী ব'লে, পৃথিবীর জিনিষের প্রতি এত আসক্তি ব'লে দেশীয় আচার ব্যবহারে চিত্তের যথার্থ উদারতা, হৃদয়ের কোমল ভাব ও প্রেম একেবারে নাই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। মাথা খাটিয়ে দেশের কাজে একটা অনুরাগের (public spirit) আবির্ভাব করা হয়ে থাকে বটে, কিন্তু তাতে হৃদয়ের গন্ধ মাত্র থাকে না। স্বদেশহিতৈষিতা ওঁদের হিসাবে সরস মাতৃভক্তি নয়, মনোবিজ্ঞানের সৃষ্ট একটা কেঠো নীরস ধারণা মাত্র (abstract conception); আর এজন্যই ওঁদের সমাজে প্রকৃত সাম্য নাই। একদিকে যেমন ধনাঢ্য লক্ষপতি, অপরদিকে অসংখ্য ধনহীন পরিশ্রমজীবী। আবার বিজ্ঞান ইউরোপকে বাহ্য জগতের 'হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা' ক'রে দিয়েছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গেই

ইউরোপ নিজেও বাহ্যজগতের 'কেনা গোলাম' হ'য়ে পড়েছে। ইউরোপীয়েরা তড়িৎ ও বাষ্পের শক্তি সঞ্চালন ক'রে দেশ কালকে একেবারে খর্ব্ব ক'রে ফেলেছেন সত্য। কিন্তু বাহ্য বিজ্ঞানেরই বশে থাক'য় পরমাত্মার বিষয় ভাবনা উহাঁদের একেবারে লোপ পেয়েছে। "আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি"র চেষ্টা ইহাঁদের কাছে পাগ্‌লামী ব'লে বোধ হয়।

ভারতবর্ষের সভ্যতা ও আদর্শ ঠিক বিপরীত। সাহিত্য, কলা, শিল্প, সমাজ, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি সকল বিষয়েই এখানে এক ভিন্ন ভাবের চিহ্ন পাওয়া যায়। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং" আর আত্মবশতাই যে সুখ—এভাব ভারতবাসীর মজ্জাগত। অবশ্য বাহ্য জগতের প্রতি ভারতবাসী সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু বাহিরের জিনিষের প্রতি মন যাতে বিশেষ আকৃষ্ট ও আসক্ত না হয়, হিন্দু সমাজ সর্ব্বদা এই চেষ্টাই করে এসেছেন। ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক ভাবই এ সভ্যতার মূলে। এখানকার কোন কাজে ইউরোপের প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হয় না—সকল বিষয়ে সহানুভূতি, প্রেম, স্বার্থত্যাগ ও একান্নবর্ত্তিতাই এদেশের প্রথা। ব্যবসা বাণিজ্যেও সেই ধর্ম্মের প্রভাব, সহযোগিতা, যৌথকর্ম্ম ও সমবায়। এজন্য অর্থের প্রতি কম আদর ব'লেই জড় বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই এবং রেলগাড়ী ও টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের প্রয়োজন বোধ হয় নাই।

এই দুই ভিন্ন পথের পথিকের সম্মিলনে এক ঘোরতর সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। সেই সংগ্রাম আমাদের দেশে এখন চ'লছে। ইহার ফলে এই হবে যে, ত্যাগপথাবলম্বী ভারতসমাজ ভোগী ইউরোপের জলে ধৌত হ'য়ে নূতন উদ্যমে ত্যাগের নূতন পথে চ'ল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌বে। এ সমাজের ধর্ম্মভাব কখন লুপ্ত হ'বার নয়—তবে এই বিংশ শতাব্দীর নূতন ভাব সমূহের সংঘর্ষণে যাতে বিপর্য্যস্ত না হয়, বরং দৃঢ় ও বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী হ'য়ে স্বীয় গন্তব্য স্থানে যেতে পারে এজন্য ইউরোপের ভারতে

আসার দরকার ছিল। ইউরোপ তাহার কর্ত্তব্য ক'রেছে। এখন ভারতের পালা। বিংশ শতাব্দীর নূতন কর্ম্মরাশি ও শক্তিপুঞ্জের সাহায্যে ভারত-বাসিগণ স্বকীয় বিশেষত্ব ও জাতীয় সভ্যতার স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ সাধন ক'র-বার জন্য চিন্তার রাজ্যে ও কর্ম্মের আসরে যে স্বদেশী আন্দোলন ক'রছেন, তাতেই সে কর্ত্তব্য পালিত হ'বে।

আধুনিক ভারতবাসীর লক্ষ্য ও আদর্শ

এখনকার আমাদের কাজ হচ্ছে—স্বায়ত্তকর্ম্ম ও স্বাধীন চিন্তার নানা-বিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন। কিন্তু কি উপায়ে? এই কাজটা অনেকমুখো। কেবল একদিকে বা এক বিষয়ে শক্তির সঞ্চালনে সুসাধিত হবার নয়। নানাদিকে নানা বিষয়ে এক সঙ্গে নানা লোকের চেষ্টার প্রয়োজন। একদিকে নূন চিনি কাপড় জুতা যাতে 'স্বদেশী' হয় তার চেষ্টা—অপর দিকে কি উপায়ে অভাব কমান যায় সে বিষয়ও ভাব্‌তে হবে। জলদান হ'তে বিদ্যাদান পর্য্যন্ত সকল কাজ যেমন নিজের হাতে ক'র্‌তে হ'বে—তেমনি সামাজিক উন্নতির চেষ্টাও সঙ্গে সঙ্গে ক'র্‌তে হ'বে। অর্থের প্রতি লালসা কমিয়ে স্বার্থত্যাগের নূতন নূতন পথ যেমন আবিষ্কার ক'রে দিতে হবে—তেমনি আমাদের সনাতন বর্ণাশ্রমী সমাজে সামাজিক কাজকর্ম্মে নানাকারণে যে অর্থপৈশাচিকতার ভাব ঢুকেছে তাও নিবারণ ক'র্‌তে হবে। আবার আমাদের ধর্ম্ম জীবনে যে বিদেশীয়ভাব ঢুকে নৈতিক ও মানসিক বিপর্য্যয় ঘটিয়েছে তারও প্রতীকার ক'র্‌তে হবে। জ্ঞান ও তর্কের নীরস কচ্‌কচানি, এবং অবিশ্বাস ও সন্দিগ্ধচিত্ততার প্রভাব কমিয়ে আমাদের সনাতন ভক্তি বিশ্বাস ও প্রেমের ধ্বজা উড়াতে হবে। এরূপে নানা কাজের ভিতর দিয়ে নানা উপায়ে আমাদের বাসনার কেন্দ্রকে করতলগত করার চেষ্টা পেতে হবে।

"জাতীয় শিক্ষা"

এই উপায় সমূহের মধ্যে শিক্ষা একটী প্রধান জিনষ। মানুষের মন গড়্‌তে পার্‌লেই আর সব কাজ সহজ হয়ে পড়ে। যদি সমাজের সর্ব্বত্র আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের মহিমা ও কাহিনী কীর্ত্তিত হ'তে থাকে—যদি আমাদের দেশের ইতিহাস অপমান ও লজ্জার ছবি না হ'য়ে আমাদের কাছে গৌরবের জিনিষ হয়, যদি আমরা নিজেদের মহাপুরুষগণকে যথোচিত সম্মান ক'র্‌তে শিখি, তবে আর কেবল নূন চিনি কেন—ক্রমশঃ সকল বিষয়েই যে আমরা খাঁটী স্বদেশী হ'তে পারব—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই জন্য অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে, কর্ম্মকেন্দ্রের ভিতর দিয়ে, ত্যাগের ভিতর দিয়ে যাতে আমাদের মন আমাদের দেশের দিকে আকৃষ্ট হয়, যাতে আমরা দেশের মাটির সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে পারি, সর্ব্বাগ্রে সেই চেষ্টা আবশ্যক।

কাজ কর্‌বার আগে মানুষ ভেবে থাকে, চিন্তা ক'রে থাকে। সেই চিন্তা ও ভাবনাই ভাবী কাজের উপর ছাপ মেরে দেয়। চাঁদার খাতা দেখ্‌লে দু'এক পয়সা দিব কি না তা আমার পরিবারের ও আমার শিক্ষার খবর যে রাখে সে পূর্ব্বেই ব'লে দিতে পারে। দেশী কাপড় পরব না বিলাতী কাপড় প'র্‌ব এ প্রশ্নের উত্তরে জিজ্ঞাসা করা উচিত—লোকে আদৌ কাপড় পরে কেন? যদি সমাজ না থাক্‌ত—যদি 'লোকে কি বল্‌বে' এভাব মনে না হত, যদি চক্ষু-লজ্জা না থাক্‌ত তবে কি কাপড়ই পর্‌তাম—যে দেশী বিদেশী ল'য়ে তর্ক ক'র্‌ব? অর্থাৎ আমার মনের ভিতর যেরূপ একটা কাজ হয় তদনুযায়ী বাহিরের কাজ ক'রে থাকি। তাই এ মনটাকে যত বিষয়ে যত উপায়ে দেশের জিনিষের সঙ্গে সংলগ্ন করা যায়—তীর্থ, উৎসব, ব্যবসা, কৃষি, দেবতা, মহাপুরুষ—যত বেশী জায়গায় দেশকে চিন্‌তে ছুঁতে ও দেখ্‌তে পারি, ততই স্বদেশী হবার

পক্ষে সুবিধা। তাই আমাদের জাতীয় উন্নতির জন্য 'জাতীয়' শিক্ষার এত প্রয়োজন। এইরূপ শিক্ষার ফলে যে স্বায়ত্ব কর্ম্ম ও চিন্তার পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে, কেবল তাহাই নহে—দেশের লোকের হাতে দেশের শিক্ষার ভার অর্পণ করাটাই স্বায়ত্ব কর্ম্মের এক লক্ষণ। জাতীয়-শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় উন্নতির সোপানে পদার্পণ করা হ'ল বুঝ্‌তে হবে।

স্বাধীন ভাবে কাজ কর্‌তে না পেলে যে মানুষের বৃত্তিনিচয়ের পুষ্টি হয় না—একথা যুক্তি দ্বারা বুঝাবার বোধ হয় আর প্রয়োজন নাই। সকলেই স্বীকার করেন প্রত্যেকের জীবনের উদ্দেশ্য কেবল স্বায় কর্ম্ম ও চেষ্টা দ্বারাই সুসাধিত হয়ে থাকে—নিজের আত্মার উন্নতি পরের সাহায্যে হবার নয়। যতটুকু দান নিজে কর্‌লাম—সে পরিমাণে আমার নাম মুক্তির খাতায় লেখা থাকবে। আর নিজে নিজের অভাব মোচন কর্‌তে না পার্‌লে ভগবান্ কাহারও সহায় হন না।

ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য-বোধ

যাহ'ক, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত ত হল—এখন রক্ষা করে কে? এ প্রশ্নের উত্তর সকলেরই নিজের কাছে। তরণী নদীবক্ষে ভাসান হ'ল—এখন এটা তীরবেগে চল্‌বে, কি এক জায়গায়ই দাঁড়িয়ে থাক্‌বে—এটা মাঝিদের প্রত্যেকের উপর নির্ভর ক'র্‌ছে। আমাদেরও যে কাজ আরম্ভ হ'ল—ইহার সুফল হবেই যদি আমরা প্রত্যেকেই নিজের যতটুকু শক্তি আছে অম্লানবদনে তাহার প্রয়োগ করি। অন্য কাণ্ডারীরা কি ক'র্‌ছে—আমার সহযোগীরা আমাকে সাহায্য কর্‌বে কি না—'যাহারে কাণ্ডারী করি ভাসাইয়াছিনু তরী' সে তরণীর অঙ্গে পা দিল কিনা আমাদের দেখবার দরকার নাই। নিজের যা দান দিবার আছে—যে প্রাণ, নিষ্ঠা ও ভক্তি আছে—তা সামান্য হলেও তারই সদ্ব্যয় আমাদিগকে

কর্‌তে হবে। 'আমি দশের একজন—অন্য লোকে যা করবে আমিও তাই ক'রব'—একথা কেবল কাজ কর্‌তে অনিচ্ছুক লোকেরাই ব'লে থাকেন। প্রত্যেকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আর কেউ ত দায়ী নয়—তবে কেন মুখ তাকাতাকি, লজ্জার ভাব? তা ছাড়া, দিনের নিত্য কর্ম্মের সময় যখন কোন বিষয়ে পরের মত জিজ্ঞাসা করা হয় না, কোন বেলা খাব কিনা—এ পরামর্শ যখন প্রিয়তম বন্ধুর কাছেও লইবার দরকার হয়না, তখন দেশের, ধর্ম্মের ও সমাজের এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের নিজের একটা ভবিষ্যৎ উপকারের কাজে 'ওঁর সঙ্গে, ওঁর সঙ্গে বুঝে যা হয় ক'রব'—একথা বল্‌লে নীচাশয়তারই প্রকাশ পায়।

তাই এ বিদ্যালয় টিকবে কি না এ সংশয় যদি কেহ করেন তবে বুঝ্‌তে হবে—তিনি ইহাকে টিকাইতে অনিচ্ছুক অথবা অপারগ—অথবা যাতে না টিকে তার চেষ্টা ক'রে থাকেন। আচ্ছা, যখন কোন লোকের ছেলে হয় তখন কি কাহারও এ সন্দেহ হয়—ছেলেটা বাঁচ্‌বে কি না? কখনই না—কারণ সে লোক যতই গরিব হ'কনা, সে জানে তার জীবনের শেষ রক্ত সেই শিশুর ভরণ পোষণের জন্য ব্যয় কর্‌বে। তার পর বাঁচা না বাঁচা অন্য নিয়মের কথা— যার উপর মানুষের কোন হাত নাই। তাই আমাদের এ শিশু বাঁচ্‌বে কিনা—ইহার ভূমিষ্ঠ হবার দিনে কেহ যেন ওরূপ অমঙ্গল ভাবনা না ভাবেন—তাহলে তাঁর কর্ত্তব্য স্খলন হবে। যার আজ জন্ম হ'ল তাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তেই হবে—এভাবই প্রত্যেকের হওয়া উচিত।

জাতীয় শিক্ষার আবশ্যকতা

অনেকে বল্‌তে পারেন—এতগুলি স্কুল কলেজ যখন আছে তখন আবার একটা নূতন ধরণের ছেলের কারখানা খুলে কাজ কি? অর্থাৎ আমাদের এ বিদ্যালয়ের লাভালাভের কথা কেউ শুন্‌তে ইচ্ছুক হ'লেও হ'তে

পারেন। আজ কালকার অবস্থা যে একটু দেখ্‌বার চেষ্টা করে সেই বুঝ্‌তে পারে—দিন কাল যা পড়েছে তাতে অন্নসংস্থানের কতকগুলি নূতন উপায় বাহির করা দরকার। সরকারী চাকরী কটা? আর, কজনই পাবে? সরকারের নিয়মানুসারে কজনই বা পাবার উপযুক্ত? ওকালতী ডাক্তারী কটা পাশের পর হয়! আর হয়েই বা সকলের সুবিধা কৈ? সর্ব্বশুদ্ধ পাশই বা হ'চ্ছে কজন, আর দিন দিন কতই বা হবে? এসব দেখ্‌লেই বেশ বুঝ্‌তে পারা যায় যে, যেকটা বাঁধা উপায় আছে তার পথ মারা গেল, আর সে আশায় ঘরে হাঁড়ী চড়িয়ে ব'সে থাক্‌লে পেটের আনন্দ হবার কোন সম্ভাবনা নাই। তাই আমাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই আমাদের এই সকল স্কুল খোলা। আমাদের ছেলেরা হয়ত সরকারের চাকরী পাবে না, আর উকীল হতে পার্‌বে না।

দেশের আর্থিক অভাব মোচন

যদি এমন লোক এখনও থাকে যে দেশের দুরবস্থা বুঝতে পেরে এবং দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু ও অনাহারজর্জ্জরিত লোকের সঙ্গে দিন রাত থেকেও—নিজের সুবিধা আছে বা পাশ কর্‌বার শক্তি আছে অথবা পশার আছে বা খোসামোদী ও মুরুব্বির জোর আছে ভেবে নিজ পরিবারের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য লালায়িত হয়—তাদের উপর আমরা চটি না—রাগ কর্‌বার কোন দরকার নাই—তারা যাক্‌, ঘরে ব'সে ঐশ্বর্য্যের আলিঙ্গন করুক্—ভগবান্ যা হয় করবেন, আমাদের ভাববার কোন দরকার নাই। আর সকলে মিলে আমাদের দশের যাতে দুপয়সা আসে সে চেষ্টায় মন প্রাণ সমর্পণ করি।

আমাদের এখানে এরূপ ভাবে শেখান হবে যে যদি কোন বালক অল্প বয়সেই, অর্থাভাবে বা অন্য কিছুর অভাবে বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে পৌছিতে না পারে তবুও সে আজকালকার "discontented graduates"দের মত যেন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে ঘুরে না বেড়ায়, বরং

নিজের চেষ্টায় সাধ্যমত ছোট খাট একটা স্বাধীন জীবিকার উপায় নিজেই করে নিতে পারে। তাতে মুরুব্বির দরকার হবে না—খোসামোদ ক'রতে হবে না। আর এ উপায়ে তারা স্বহস্তে অর্জ্জিত যে অন্নের গ্রাস মুখে তুল্‌বে তা প্রভুর ঝাঁটা লাথি গালির সহিত অধঃকরণ কর্‌তে হবে না। তার ফলে মনের সুখে পাখীর মত সদাই অবাধে বিচরণ ক'রতে পার্‌বে। ব্যবসার কথা শুন্‌লেই আমরা চম্‌কে যাই, অত টাকা কৈ? যেন সকলকেই Whiteaway Laidlaw বা সুজনলাল মাড়োয়ারীর মত বড় একটা কাজ ফাঁদ্‌তে বলা হচ্ছে! কুড়ি টাকার পঁচিশ টাকার চাকরীর জন্য যদি বি, এ, পাশ ক'রে ঘুরে বেড়াতে পারলাম, ত ২০।২৫৲ আয় হয় এমন একটা কাজ আরম্ভ ক'র্‌তে পারিনা? এতে যে সার্টিফিকেটের আদৌ দরকার নাই। এজন্য জাতীয় বিদ্যালয়ে সাধারণ মামুলি উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কল কারখানার শিক্ষার বিশেষ আয়োজন করা হ'য়েছে। দেশের লোকদের যত রকম অভাব আছে—ছুরী, কাঁচি, টেবিল হ'তে গরদ মোজা ছবি যন্ত্র ইত্যাদি সকল প্রকার অভাব পূরণ করবার শিক্ষা দেওয়া হ'বে। পরাধীন আর হ'তে হবে না—নিজের ভাত কাপড়ের যোগাড় নিজেই করে নিতে পার্‌বে।

এ লাভালাভের কথা কিন্তু আমার নিজের মনে কখনও উদয় হয় না। দুদিনের একদিনের স্বার্থসিদ্ধির কথা আমি নিজে কখনও ভাবি না। আমি এই স্কুলকে কেবল একটা ছেলে পিটিবার জায়গা মনে করি না। আমি একে আর এক ভাবে দেখি। ইহা'র বর্ত্তমান সামান্য অবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত সমস্ত ভবিষ্যৎকে দেখ্‌তে পাচ্ছি।

আমি দেখ্‌ছি যে, ভারতসমাজের প্রথম আবির্ভাব হ'তে এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে যত যা হ'য়েছে—যত দৃশ্যের অভিনয় হ'য়েছে—ইহার

বাণীকুঞ্জে যত পিকবর সুস্বরে প্রাণ ঢেলে দিয়েছে—যত কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীরের আবির্ভাব হয়েছে—যত কাব্য, পুণ্য, মাহাত্ম্য ও মহাপ্রাণতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে--যত ত্যাগ, বৈরাগ্য, নির্ব্বাণের কাহিনীতে পূর্ব্বপুরুষদের চিত্ত উৎফুল্ল করেছে—কঠোর কর্ত্তব্যময় সংসারজীবনের সহিত সন্ন্যাসের যত সমন্বয় হ'য়েছে-বিশ্বসভ্যতার যত স্রোত এসে ভারতীয় বিশেষ সভ্যতার কলেবর পুষ্ট করেছে, সকলগুলি এইস্থানে পুঞ্জীকৃত ভাবে আধুনিক যুগের কর্ম্ম ও ভাব সমষ্টির সহিত এক অদ্ভুত মিলনসূত্রে গ্রথিত হ'য়ে অব্যাহত গতিতে আমাদিগকে জাতীয় মোক্ষের পথে অগ্রসর করে দিচ্ছে। এক একটী জাতীয় বিদ্যালয় এক এক প্রয়াগক্ষেত্র—আমাদের জাতীয় জীবনগঙ্গা হিমাদ্রিসদৃশ অটল সত্যের শৃঙ্গ হ'তে বহির্গত হ'য়ে এতদিন বিশেষ একভাবে চলে আসছিল এবং বিশেষ এক উপায়ে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল দিয়ে আস্‌ছিল। এই চতুর্ব্বর্গ লাভের উপায়—ভোগের পথে থেকে কিরূপে ত্যাগের কাজ করা যায় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সেই চেষ্টা। সংসারের সকল কাজ-কর্ম্ম বজায় রেখে তার উপরে কিরূপে আধ্যাত্মিক জীবনের ছাপ মারা যায়, ইহাই হিন্দুসমাজের সনাতন সাধনা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অপূর্ব্ব সম্মিলন ক্ষেত্র

এখন এই প্রয়াগক্ষেত্রে নূতন এক স্রোতের সাক্ষাৎ হ'ল। আমাদের পক্ষে এই স্রোত একেবারে নূতন নহে—কেবল অনেক দিনের অবসাদের পর এসেছে বলে নূতন বোধ হচ্চে। তা ছাড়া প্রভাবটা কিছু প্রবলভাবে আমাদের উপর পড়েছে। যাক্—কথাটা এই। পার্থিব জীবনের উন্নতি প্রয়োজন—অর্থ একবারে অনর্থের মূল নয়—জড় বিজ্ঞানেরও দরকার আছে—রাজনৈতিক বিষয়েও উন্নতি আবশ্যক—বাহ্যজগতের প্রতি একেবারে অমনোযোগী হ'লে চল্‌বে না। কেবল নিজের পল্লী বা পরগণার ভাবনা ভাব্‌লে এখন আর চলে না—স্বদেশ একটী বড় সমষ্টি, তার

বিষয়েও খোঁজ নিতে হবে, এবং খোঁজ নিবার সুবিধাও আছে—ছাপাখানা, ডাকঘর, রেলগাড়ী, খবরের কাগজ, এবং যাতায়াতের সুবিধায় ভাবের আদান প্রদান এখন সুসাধ্য। এই সকল বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় ভাব পাশ্চাত্য জগতেই বিশেষরূপে পুষ্ট হয়েছে। এজন্য এগুলিকে প্রধানতঃ ইউরোপীয় ভাব বলে থাকে। ইউরোপীয় এভাব এসে এখানে মিলিত হ'ল। আমাদের জাতীয় সভ্যতায় শিল্প, রাষ্ট্র, ধনসম্পত্তি, কখনও একেবারে ফেলে দেওয়া হয় নাই। তাই আজ কাল এগুলোকে নিজস্ব ক'রে লওয়া আমাদের কঠিন হবে না। বরং এখন হ'তে দুয়ে মিলে মিশে নূতন বিজ্ঞানকে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের সহায় ক'রে দিবে, এবং এই সমন্বয়ে সাগরগামিনী স্রোতোবহার মত সমাজে নূতন নূতন উপায়ে চতুর্ব্বর্গলাভের সুবিধা ক'রে অনন্তের সঙ্গে মিল্‌তে চল্‌বে।

আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি এখন হ'তে আমাদের সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা চ'লে গিয়ে স্বাভাবিক ভাব হ'বে। সমাজের প্রথম গঠনের সময়ে অধিকারিভেদানুসারে যে জাতিভেদের ব্যবস্থা হয়েছিল, সেই অধিকারি-ভেদের নিয়মই আজকালকার নূতন অবস্থানুসারে কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হ'বে। বর্ণাশ্রমের ভিত্তি বিস্তৃততর ও দৃঢ়তর হবে, এবং ব্রাহ্মণের গৌরব, ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম, বৈশ্যের কর্ত্তব্য, শূদ্রের অধিকার কিছু নূতন আকারে সমাজে আবার প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রবে। রেলগাড়ীতে চড়্‌লে ধর্ম্মের যে হানি আশঙ্কা ক'রে থাকি তাও আর ভয় ক'রতে হবে না। এখন বুঝ্‌তে পার্‌ব যে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের নিষ্ঠুর উপদেশে আমাদের ধর্ম্মের বিপ্লব ঘটাতে পার্‌বে না। বিজ্ঞানকে আমরা যতই নিজের ক'রে নিতে পার্‌ব ততই বেশ বুঝ্‌ব যে আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ অত্যুচ্চ বিজ্ঞা-নের নিয়মেই গঠিত।

তার পর, দুর্ভিক্ষ অনাহারের প্রকোপ যখন কমে আস্‌বে—পরে একদিন এই ভারতের ধর্ম্মনেতারা দেশ হ'তে দিগ্বিজয়ে বহির্গত

হবেন এবং একে একে ইউরোপের সকল দেশকে বৈরাগ্যের কথা শুনিয়ে মন প্রাণ কেড়ে লবেন। দেখব, ভারতের ধর্ম্মবিজ্ঞান ইউরোপের কর্ম্মবিজ্ঞানকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়ে উহাদের জীবন সংগ্রাম ও সাংসারিকতার হ্রাস করে দেবে। ইউরোপীয় সমাজ এখন বৈষয়িক ভারে জর্জ্জরিত,—এই আধ্যাত্মিক নবজীবনের জন্য ব'সে আছে। ভারতের জাতীয় উন্নতিতেই ইউরোপের মুক্তি।

মানব জাতির অভাব মোচন

আমি আমাদের এই পর্ণকুটীরের ক্ষুদ্রবিদ্যালয়কে সেই মহান্ ভবিষ্যতের প্রথম সোপান মনে কর্‌ছি। কেবল মাল্‌দা নয়, কেবল ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র ইউরোপ, সমগ্র পৃথিবী—সমস্ত মনুষ্যসমাজের যে যেখানে আছে তাদের প্রত্যেকেরই আমাদের এই ছোট স্কুলের দরকার হ'য়ে পড়েছে। এই কর্ম্মক্ষেত্রে মনুষ্যজাতির কার্য্য সাধিত হচ্চে। তাই আমি সামান্য লাভালাভ, স্বার্থসিদ্ধি, টাকা পয়সা, ওকালতী ডাক্তারী, সরকারী চাকরী—এ সকলের কথা ভাবি না। এসব এখন অতি তুচ্ছ। ইচ্ছা করি, কেহই ও নীচ ভাবে যেন মনকে কলুষিত হ'তে না দেন।

কার্য্যকরী ভাবুকতা

আমার নিজের আশার সীমা নাই—সাহসের কোন ভয় নাই। দেশ সম্বন্ধে, জাতি সম্বন্ধে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উচ্চতম ও দুরূহতম বিষয়ও আমাকে টলাতে পারে না। আমি বুঝি মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই—আমারও অসাধ্য কিছুই নয়। অনন্ত প্রেম, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত কর্ম্ম—সকলই যেন ছেলেখেলা। হ'তে পারে, আমাদের সমাজের বিপ্লবের সময়ে জন্মেছি ব'লেই বোধ হয় আমরা ভবিষ্যতের অন্ধকার দেখি না, সবই যেন সুস্পষ্ট—দু দু গুণে চারের মত—'জলবৎ তরল',—যা ভাবি তাই করতে পারি। হ'তে পারে জাতীয় জীবনের কোন বিষয়ে নিষ্ফলতা দেখিনি

ব'লে হতাশ বা ভগ্নোদ্যম হওয়াত দূরের কথা, এসব কাকে বলে তাও জানি না। কিছু দিন আগে জন্মগ্রহণ করলেই হয়ত দার্শনিকের মত আগেপিছে ভাব্‌তে শিখ্‌তাম—দেশের লোককে গাল দিতাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও তিরস্কার কর্‌তাম, আর দেশের ও ধর্ম্মের উন্নতিকে "melancholy dream" বা দুঃস্বপ্ন মনে কর্‌তাম।

কিন্তু যখন চক্ষু উন্মীলন করিলাম তখনই দেখিলাম আমাদের জাতীয় জীবনের নূতন প্রভাতের অরুণিমা চারি ধারে হাসিতেছে। সেই তরুণ রবির অরুণ কিরণচ্ছটায় সকলের মন প্রফুল্ল। এখন কবিদের গাইবার সখ হয়েছে। দাতাদের দানে ইচ্ছা হয়েছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আবার যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন। আমরাও তাই প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে মিলবার জন্য মন খুলে বেড়াতে শিখেছি। আমরা এই নূতন হাওয়া, নূতন আলোর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে চাই। সেই জন্যই ভাবজগতের লোক বলে পরিচয় দিই। কিন্তু যদিও এই উচ্চতর সোপানে উঠ্‌বার জন্য এত ব্যগ্র—পাগলের মত, পাখীর মত হাওয়ায় উড়ে বেড়াতে ইচ্ছা হয়—আধ্যাত্মিক জীবনের কথা লয়ে এত নাড়াচাড়া করি—মুক্তি, নির্ব্বাণ, ত্যাগ, বৈরাগ্যের কথা বল্‌তে সঙ্কোচ হয় না, তা ব'লে যে পৃথিবী হ'তে পা ফেলে দিয়েছি তা নয়। ইচ্ছা হয় পাখা হক্—কিন্তু সে মুহূর্ত্তেই দেখি আমাদের কেবল মাথা আছে তা নয়, কেবল হৃদয় আছে তা নয়—পাও আছে, শরীরও আছে। স্বর্গের পথে চল্‌তে হবে বটে—কিন্তু এই বৃক্ষরাজিশোভিত বন্ধুর ও অসমতল পৃথিবী ভুল্‌লে চল্‌বে না। এই পৃথিবীতে, এই কষ্টের ও অসম্পূর্ণতার, এই কোলাহলের ভিতরেই কি উপায়ে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় তার চেষ্টা ক'রতে হবে। তাই আমাদের এই নূতন ভাবুকতা একেবারে পাগ্‌লামিও নয়—অসম্ভবও নয়।

ভাবুকতার ভিত্তি

আমাদের এত আশার কারণ কি? যদি আপনাদের কাহারও এখন পর্য্যন্ত নবীন বয়সের প্রথম উদ্যমশীলতার চিহ্ন থাকে তবে অনুভব করাতে পারি। আর অন্ততঃ যদি মন প্রাণ একেবারে অবশ বা পাথরের মত ঠাণ্ডা না হয়ে গিয়ে থাকে—তবে অনুভব করতে না পারেন অন্ততঃ বুঝতে পার্‌বেন—বাস্তবিক এই ভাবুকদের কর্ম্মরাজ্যে কোন আধিপত্য আছে কিনা। বুঝ্‌বেন যে, দেশের এখন যে অবস্থা সেই অবস্থাই অত্যন্ত আশাপ্রদ, এবং সকলকে "মরা গাঙ্গে বাণ এসেছে" ব'লে 'জয় মা' ব'লে ভাসা তরী' উপদেশ দিচ্চে। একেবারে অন্ধ হয়ে যিনি বসে নন—অথবা যিনি সময়ের হাব ভাব বুঝ্‌তে চেষ্টা করেন—তিনি বুঝ্‌তে পারেন এ দু'বছরে দেশ কতখানি এগিয়েছে। চারিদিকে কেবল স্বার্থত্যাগেরই দৃষ্টান্ত—ধনী ধন দান কর্‌ছেন, বিদ্বান্ বিদ্যা দান কর্‌ছেন, কর্ম্মী দশের কাজে সময় দিচ্ছেন। দেশময় কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে—কোথাও ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য, কোথাও জাতীয়তা বর্দ্ধনের জন্য—কোথাও স্বদেশী ভাব প্রচারের জন্য। এই অসংখ্য সভা সমিতির বিশেষ সুলক্ষণ এই—প্রত্যেকটীতেই বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠের অংশ খুব কম। সকলেই কাজের জন্য ব্যস্ত। আর কোন ফল না হলেও, আমরা যে এত জায়গায় এত রকম বিষয়ে বিশেষ কোনও এক উদ্দেশ্যে মিল্‌তে শিখেছি, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। এ রকম ছোট ছোট দল বাঁধার ভিতর দিয়াই বড় দল বাঁধতে হয়।

পরস্পর সহানুভূতি ক্রমশই বাড়্‌ছে, আত্মসম্মানের সঙ্গে সঙ্গে সাহসিকতা ও আত্মনির্ভরতার উদাহরণ আজ কাল অনেক দৃষ্ট হয়। অনেক নির্য্যাতন ভোগ ক'রেও আমাদের লোকেরা স্বভাব স্থির ও

প্রতিজ্ঞা অটল রাখ্‌তে পার্‌ছে। নৈতিক জীবনের ইহা কম উন্নতি নয়। শারীরিক শক্তির প্রতি সর্ব্বত্র লোকের দৃষ্টি পড়েছে। বই মুখস্থ করাই আজ কাল আর ভাল ছেলের একমাত্র লক্ষণ নয়। কষ্টসহিষ্ণুতা, বিলাস-বর্জ্জন, সংযমশিক্ষা ছেলেরা দলে দলে আরম্ভ ক'রেছে। কুলী মজুরের কাজ কর্‌তে কেহ আর পশ্চাৎপদ হয় না। দারিদ্র্যের মুকুটে মস্তক শোভিত ক'র্‌তে সকলেই অগ্রসর হচ্ছে। মোটা কাপড়, মোটা ভাত লোকে ইচ্ছা ক'রেই ব্যবহার ক'র্‌তে শিখ্‌ছে। "আমরা পথে ঘাটে যাব সারে সারে—মা'র নাম গেয়ে বেড়াব দ্বারে দ্বারে"—একথা এখন আর কেবল কবিতার পদ নয়। ইহা কার্য্যে পরিণত হয়েছে, সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ভ'রে—পাড়ায় পাড়ায় জেলায় জেলায় মুষ্টি ভিক্ষার প্রথা প্রচলিত। তারপর, চাকরীর কুহকে পড়ে' মানুষ আর মন প্রাণকে হতাশ হতে দিচ্ছে না। অনেকে স্বেচ্ছায় চাকরী ছেড়েছেন, অনেকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছেন—কেহ কেহ স্বাধীন ব্যবসার চেষ্টায় আছেন। আজকালকার বাপ মারা ছেলেদের চাকরীর আশা ছেড়েছেন—শিল্প-বাণিজ্যব্যবসা দোকানদারী শেখাতে অত্যন্ত যত্নবান্।

দেশময় শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার রব উঠেছে। কত লোক বিজ্ঞান-চর্চ্চার জন্য, কল কারখানা প্রস্তুত করা শিখবার জন্য, অন্যান্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস তৈয়ারী করার উপায় উদ্ভাবনের জন্য—দূর বিদেশে গমন কর্‌ছেন। জাপান, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি যেন আজ কাল ঘরের কোণে বলে বোধ হয়। এক কথায় বল্‌তে গেলে—দেশের যত প্রকার কাজ হ'তে পারে—মানুষের মন সব দিকেই ধাবিত হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ বাহুবলে ও নিজ চেষ্টায় কিছু একটা গড়ে তুল্‌বার জন্য ব্যগ্র। সামাজিক শাসন অনেক দূর এগিয়েছে। দেশের পাঁচজন যা স্থির ক'রে দেয় অন্যে বিনা বাক্যব্যয়ে এখন তা শুনে থাকে। দেশের লোককে এখন আমরা মান্‌তে শিখেছি। লোকেরা ক্রমশঃ কম মাম্‌লাবাজ

হয়ে যাচ্ছে,—মোকদ্দমার কারণ যে নাই তা নয়। দেশের লোক হঠাৎ একেবারে সাধু হয়ে পড়েনি। তবে কথাটা এই—লোকে শিখেছে, অপরিচিত আদালতে যেয়ে অর্থব্যয়ের চেয়ে নিজের গাঁয়ের চেনা মোড়লদের দিয়ে সব বিবাদ চুকিয়ে নেওয়াই ভাল। এতে ওকালতীর আশা কিছু ক্ষীণ হয়ে পড়েছে বটে—কিন্তু সমাজের স্বাধীনতা ও আত্মনিষ্ঠা বেশ বাড়ছে।

এ রকম কত কি হয়েছে—যাতে আমাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আর্থিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সকল বিষয়েরই যথেষ্ট উন্নতির প্রমাণ পাওয়া যায়। ছেলেদের আড্ডায় আজ কাল আর খোস গল্প হয় না—কেবল নৈতিক উন্নতির আন্দোলন। আজ কালকার দেশের হাওয়াতেই রাজনীতি ও সমাজনীতির উপদেশ রয়েছে। তাই দেশের আপামর সকলেরই দেশ, জাতি, রাজা প্রজার সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু নৈতিক শিক্ষা বেশ হচ্ছে। কত শত 'ইউনিয়ন' হয়েছে। তাতে এক ব্যবসায়ের লোকেরা বা কর্ম্মচারীরা একত্র হয়ে যে নিয়ম করে সে নিয়মানুসারে সকলেই চল্‌তে বাধ্য। এই উপায়ে নেতার অধীনতা শিক্ষা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পরস্পর মিলে মিশে কাজ করার ক্ষমতা বাড়ে। নিয়োগকারীদের জব্দ কর্‌বার জন্য কর্ম্মচারীরা যা যা বলে তাই জোর ক'রে আদায় ক'র্‌তে পার্‌ছে। এত সব ধর্ম্মঘট সেই একতার পরিচায়ক। রজ্জুত্ব প্রাপ্ত তৃণ দ্বারা মত্ত হস্তীকে বাঁধা হচ্ছে। তারপর স্বার্থত্যাগ, জীবনোৎসর্গ ইত্যাদি কথা আজ কাল পথে ঘাটে হাটে বাজারে শোনা যায়। কাজ হ'ক বা না হ'ক, এ কথাটা যে এত বলা যাচ্চে ও শোনা যাচ্চে—ইহাও কম আশার কথা নয়। জেলায় বড় সমিতির অধিবেশন হচ্চে—তাতে আমাদের দেশের লোকেরা অপরের সাহায্য না নিয়ে কি কি ক'র্‌তে পারে ও কি উপায়ে সেই কাজ আরম্ভ করা যায়—কেবল তাহারই আলোচনা হ'য়ে থাকে।

তাই দেখা যাচ্ছে—এই বিশাল ভারতক্ষেত্রের মধ্যে স্বদেশী, স্বাবলম্বন এবং আত্মোন্নতি প্রচার ও অনুষ্ঠানের জন্য অসংখ্য কেন্দ্র নির্ম্মিত হয়েছে। এই সব কেন্দ্রই আমাদের জাতীয় শক্তির আধার। এই সকলের সমষ্টিতে আমাদের সমাজের প্রতিষ্ঠা। তা ছাড়া, এমন কি আমাদের জাতীয় মহাসমিতি কংগ্রেসও এখন অনেকটা ঘরমুখো হয়ে পড়েছেন। এতদিন কংগ্রেস ভাব্তেন যে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ভার-কেন্দ্র বিদেশে, সকল বিষয়েই আমাদিগকে বিদেশের শরণাপন্ন হ'তে হবে। কিন্তু এখন সে মোহ ভেঙ্গেছে। আমাদের চিত্ত আর তত সংমোহিত নয়।

এসব দেখে শুনে আশা হয় না কার? এখনও কি নৈরাশ্যের সময় আছে? যাদের কাছে কখনও কিছু আশা করা যেত না তারাও 'grand scheme', 'noble idea' "মহৎ উদ্দেশ্য" বলে ডেকে অর্থ সাহায্য কর্‌ছে। এখনও যারা তত অগ্রসর হতে পারেনি—তারা আর সমাজের সাম্‌নে মুখ দেখাতে সাহসী নয়। নিজেদের দোষ ঢাক্‌তে চেষ্টা করাও লজ্জার বিষয়। দেশ শুদ্ধ সকলেই যখন কিছু না কিছু স্বার্থ ছাড়্‌তে পারছে—তখন স্বার্থ নিয়ে যে দু-একজন বসে আছে বা থাক্‌বে তাদের অবস্থা সকলেই বুঝ্‌তে পারছেন।

বিঘ্নের উপকারিতা

অবশ্য আশার কারণ এত আছে বলে যে দেশের সব লোকই স্বার্থত্যাগী হয়ে পড়বে—এরূপ যেন না ভাবি। স্বার্থান্ধ লোক শেষ পর্য্যন্ত অনেকেই থাক্‌বে। বিঘ্ন চিরকালই থাকে। প্রত্যেক দেব-কার্য্যেই দৈত্য দানব আছে। ইতিহাসে যজ্ঞবিঘ্নকারীর অভাব নাই। যতকাল জগতে ভাল কাজ থাক্‌বে—হিরণ্যকশিপু, বৃত্রাসুর, কংস, রাবণ ততকাল পৃথিবীতে থাকবেই, ইহা ঠিক। তবে ভগবানের কাজ

ভগবান্ গুছিয়ে লবেন—আমাদের ভাব্বার দরকার নাই। এক দিন সকল বাধা বিঘ্নই দূরীভূত হয়ে যাবে। তাই আমরা যেন বিপদের অস্তিত্বে ভয় না পাই। এটা জানা কথা—যে দেশের অনেক লোকই আমাদের সহায় হবেন না।

এই বিঘ্ন বিপদ্ই ক্রমশঃ আমাদের প্রকৃত শক্তির স্থান বাহির ক'রে দিবে। মানুষের অপকার সাধন কর্বার কারণ যত বেশী থাকে—ততই সে আত্মনির্ভরতা ও স্বাবলম্বন শেখে; ততই সে চেষ্টা করে কি উপায়ে সে কাহারও বাগে না পড়্তে পারে। যদি কোন সমাজের মধ্যে দু এক বিষয়ে বিভিন্ন মতাবলম্বী ছোট কয়েকটী দল থাকে তবে দেখা যায় যে, সেই ছোট দলের বিশেষ মত দুএকটীই অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে পড়েছে। কারণ তাদের অস্তিত্ব প্রতি মুহূর্ত্তেই লোপ পেতে পারে। যেখানে যত বিরোধ ও সংগ্রাম, সেখানে তত শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা। তাই কষ্ট, বাধা, বিপদ্, আমরা এখন চাই। ইহাতেই আমাদের আন্তরিকতার প্রকৃত পরীক্ষা হবে। তাতে আমরা অবস্থা বুঝে নূতন নূতন ব্যবস্থা কর্তে অভ্যস্ত হয়ে যাব।

প্রকৃত ধর্ম্ম—স্বার্থত্যাগ

প্রবীণ ব্যক্তিরা অভিভাবকগণ অগ্রপশ্চাৎ ভাব্তে গিয়ে আমাদের এই পুণ্যের পথ রোধ যেন না করেন। নবীনেরা আজ কাল সাধারণতঃ যা ভেবে থাকে তা অতি মহৎ ও উদার। সত্য কথা বল্তে গেলে, প্রায়ই উহাতে উদ্দামতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিহ্ন মাত্র লক্ষিত হয় না। বাঙ্গালার প্রায় সকল যুবকই আজকাল ধর্ম্মের ত্যাগপথাবলম্বী এবং বুঝেছে যে "যত সুখ ত্যাগে—আর সব দুঃখ ভোগে"। এই ভাবের স্রোতে গা ঢেলে দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য—এবং অন্যান্য সকলকে গা

ঢালতে বলাও উচিত। এই ত্যাগের পথে—মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হতে লোককে অবাধে পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। কোন ভয়ের কারণই নাই। যদি এমনই হয়—কোন অনধিকারী এ পথে কিয়দ্দূর এগিয়ে পরে অনুতাপ ক'র্‌তে বাধ্য হয় এবং 'ইতো নষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ' হয়ে পড়ে—তাতেও পরামর্শদাতার খেদের কোন কারণ থাকবে না। তিনি তাহার সম্মুখে জীবনের উচ্চ আদর্শ দেখিয়ে তার আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় হয়েছিলেন। হয়ত সে ব্যক্তিকে অর্দ্ধপথেই রণে ভঙ্গ দিতে হ'ল। কিন্তু যে কষ্ট স্বীকার তাকে ক'র্‌তে হল তাতে তার ধর্ম্মজীবন গঠিত হয়ে গেল—এবং পর জীবনের রাস্তা পরিষ্কার হ'য়ে রইল। উঁচু জায়গায় উঠ্‌তে হ'লে অনেক আছাড় খেতে হয়—কিন্তু তাই ব'লে কি উঠ্‌তেই চেষ্টা ক'র্‌ব না? না কাউকে পরামর্শ দেব না?

ব্যক্তিত্ব

ববং জেনে শুনে এই আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ রোধ করাই পাপ। কাহারই সে অধিকারও নাই। পৃথিবীতে যত জীবের সৃষ্টি হয়েছে—তা কার জন্য? এত ফুল ফুটে, পাখী গায়, সুন্দর এত বস্তু দেখা যায় সমাজ, সংসার, অনেকানেক অনুষ্ঠান—সব কিসের জন্য? বাপ মার, স্ত্রী স্বামীর, পিতা পুত্রের সম্বন্ধ-এ সবের চরম লক্ষ্য কি? প্রত্যেকেরই আত্মার উন্নতি। প্রত্যেকই জন্মেছে—নিজের শেষ লক্ষ্য যত দিন না সাধিত হয়, তত দিন আবার জন্মাবে। ফুলের সৃষ্টি কোটের বোতামের ঘরে থাক্‌বার জন্য নয়—ফুটাতেই ফুলের সম্পূর্ণ বিকাশ। সমাজ, সংসার, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দান, ধর্ম্ম যত যা দেখি—সকলেরই উদ্দেশ্য মানুষকে সম্পূর্ণরূপে বিকাশ করা—উহার মনুষ্যত্ব প্রকটিত করে দেওয়া। সমাজের জন্য, সংসারের জন্য, পরিবার ভরণপোষণের জন্য কোন ব্যক্তির সৃষ্টি হয় নাই। ব্যক্তিকে

ভালরূপে ফুটাইবার জন্য এই সমুদয়ের সৃষ্টি। ইহারা উপায় মাত্র—লক্ষ্য ব্যক্তির চরমোন্নতি। উহাদের নিজের জন্য কোন আদর নাই। লোকে ধর্ম্মের জন্য সমাজের জন্য প্রাণত্যাগ কর্‌ল, এতে সমাজের উন্নতি বা ধর্ম্মের উত্থান হ'ল বটে। কিন্তু সেই ব্যক্তির পক্ষে প্রধান জিনিষ—তার প্রাণদানের ফলে ভববন্ধন হ'তে মুক্তি।

কাজের কথা বল্‌তে গিয়ে অনেক বাজে কথা ব'লে ফেল্‌তে হ'ল। ধৃষ্টতা মাপ কর্‌বেন। কথাটা ঠিক ব'লেই বল্‌তে ভয় কর্‌ছেনা। পিতার পিতৃত্ব তখনই ভাল রকম সাধিত হয়—যখন তিনি সন্তানের পরমাত্মার উৎকর্ষসাধনের উপায় হন। পুত্রের উপর পিতার সর্ব্বময় অধিকার এরূপ ভাবা পিতৃত্ব নয়—ভোগ-লালসা। মানুষের বিবাহ হয়—পরিবার ভরণপোষণ মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। এই পরিবারের ভার গ্রহণ ক'রে মানুষ ক্রমশঃ চিত্তের উন্নতি লাভ কর্‌তে পারে ব'লেই পারিবারিক জীবনের দরকার। যখন দেখা গেল পরিবারই মুক্তির কণ্টক হ'য়ে পড়েছে, তখন ও বন্ধন ছিঁড়ে ফেল্‌লে কোন দোষই হয় না। ইহাই হিন্দুর চিরন্তন আদর্শ। মানুষ যে সামাজিক জীব এ কথাটারই অর্থ কি? লোকের সঙ্গে মিলে মিশে যদি না থাকে তবে তার কি ইহলৌকিক, কি পরত্রের উপকার হয় না। সুতরাং ব্যক্তিত্ব বিকাশই সামাজিকতার উদ্দেশ্য। রাজার শাসনে থাক্‌বারও সেই উদ্দেশ্য। বন্ধনের ভিতর দিয়াই মুক্তির উদ্দেশ্যে চল্‌তে হয়। এ জন্য রাষ্ট্রের নিয়মাধীন হ'লেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হয় না। তাই বল্‌ছি—কেহ যেন এই ব্যক্তিত্ব বিকাশের, মুক্তির পথের বাধা না হন, বরং সকলেই আনন্দের সহিত প্রত্যেককে এই পুণ্যের পথ দেখাইয়া দিন। অন্ততঃ যাহারা এই পথে চলতে ব্যগ্র, যাদের হৃদয়ে ব্যাকুলতা এসেছে, বা যাদেরকে বুঝিয়ে দিলে ব্যাকুল হ'তে শিখছে—তারা যা ক'রছে করুক, সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ ক'র্‌বেন না। কোন অধিকার নাই।

বিংশ শতাব্দীর যুগাবতার

এ সব বড় বড় কথা—সংসার-সমাজের সঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তির কি সম্বন্ধ, আর কার্য্যকালে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ। ইহার উপদেষ্টা আমি কখনই হ'তে পারি না। আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বলবার আমার অধিকার নাই। কিন্তু আমার অধিকার না থাক্‌তে পারে -শীগ্‌গিরই তিনি আস্‌ছেন যিনি এক হাতে বিজ্ঞান ও প্রকৃতিপুঞ্জের স্বায়ত্তশাসন, অপর হাতে ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও ভক্তি নিশান লইয়া সমগ্রদেশকে মজাইবার জন্য যুগান্তর সৃষ্টি কর্‌বেন। তাঁর জন্য সকলের প্রস্তুত হওয়া দরকার। বৈদিক কাল হ'তে আরম্ভ ক'রে আমাদের সমাজ যত ভাবের ভিতর দিয়ে এসেছে—যত চিন্তা ও কর্ম্মের স্রোতে নিজের কলেবর পুষ্ট ক'রেছে—যুগে যুগে দেশকালপাত্রানুসারে যত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে—এই বিংশ শতাব্দীর বৈষয়িক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগে—সেই অটল অচল জীবন্ত সমাজ নিজের স্বাতন্ত্র্য ও পারম্পর্য্য রক্ষা ক'রে এক রূপান্তর দেখাবার জন্য আসন্নসত্ত্বা গর্ভিণীর ন্যায় দোহদাভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। যার যা দিবার আছে নিয়ে এস—"দোহদস্যাপ্রদানে তু গর্ভোদোষমবাপ্নুয়াৎ"—অভিলাষ পূর্ণ না হ'লে গর্ভের সুফল লাভ হয় না। সেই আমাদের নূতন ভাবের নূতন জননায়ক হিন্দু সমাজকে গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাবার জন্য এক ধাপ অগ্রসর ক'রে দিবেন।' সেই মহা-পুরুষের দ্বারা আমাদের হৃদয়সাগরে যে ভাবতরঙ্গ উত্থিত হবে তার আঘাত কতদূর গিয়ে পৌছিবে কে জানে? তাঁর সঙ্গে যোগদান ক'র্‌তে পারি, এখন হ'তে সেজন্য প্রস্তুত হ'তে হবে।

মহম্মদ, যীশুখ্রীষ্ট, শঙ্করাচার্য্য, নানক, চৈতন্যাদি মহাপুরুষদের আবির্ভাব কি নিয়মে হয় বলা কঠিন। শাস্ত্রে আছে—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

কিন্তু ঠিক কোন্ সময় ধর্ম্মের যথেষ্ট গ্লানি হয়েছে—কখন পৃথিবী অধর্ম্মে, অত্যাচারে, পাশবিকতায় একেবারে অধীর হ'য়ে পড়েছে—ঠিক কোন্ মুহূর্ত্তের পর ধরণী রসাতলে গমন কর্‌বেন—তারত কোন স্থিরতা নাই। অল্পবুদ্ধি মানব বুঝবেই বা কি উপায়ে? তবে এ কথাটা ঠিক যে, মানুষের অন্যান্য কাজেও যেমন, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জগতেও প্রয়োজন আয়োজনের এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যদি কোন জিনিষের দরকার হয়, তবেই না তা কি উপায়ে কোথায় পাওয়া যায় তাহার অনুসন্ধান করা যায়। বৈষয়িক জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগতে ও Demand Supply এর, প্রয়োজন আয়োজনের সম্বন্ধ বেশ বুঝা যায়। আধ্যাত্মিক জীবন ত আর সৃষ্টিছাড়া একটা জিনিষ নয়। ইহাতেও প্রাকৃতিক সকল নিয়মই চ'লে থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য কাজেও যেমন কার্য্যকারণের সম্বন্ধ লক্ষিত হয়, কার্য্যপরম্পরার নিয়ম দেখা যায় ধর্ম্মজীবনেও ঠিক সেই ভাব। যখন আমরা 'নেতা চাই, নেতা চাই'—'দেশের নায়ক কৈ' ব'লে এত চীৎকার কর্‌ছি, যখন 'এভাবে আর কদিন চল্‌বে'—'এ যে ঘোর কলি'—'ধরিত্রী দ্বিধা হও তোমার মধ্যে প্রবষ্ট হই!'—অধর্ম্ম অত্যাচারে, দুর্ভিক্ষ মহামারীর উপদ্রবে এক দণ্ডও তিষ্ঠান যে দায় হ'য়ে পড়ল'— ব'লে আর্ত্তনাদ কর্‌ছি, তখন কে জানে—আমাদের এই সুবিশাল ভারতভূমির কোন্ নিভৃত স্থানে ব'সে কোন্ শ্রীচৈতন্য দেশের, সমাজের, ধর্ম্মের পূর্ব্বাপর সকল অবস্থা বুঝে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন? আমার সে কথা বলবার বা বুঝাবার কোন অধিকারই নাই। কিন্তু তিনি এসে তাঁর প্রেমে সকলকে ভাসিয়ে ল'য়ে যাবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই এখন হ'তে মনপ্রাণ তৈয়ারী করা দরকার। ইন্দ্রিয় সংযত ক'রে রাখা উচিত।

চক্ষু যেন আর কুদৃষ্টি না দেখে। কর্ণ যেন ভোগবিলাসের বাণী না শুনে ; হৃদয়ে মলিনতা, দীনতা, নীচাশয়তার ভাব একেবারে নির্ম্মূল করে ফেলি। তবেই তিনি যখন আস্‌বেন, যথেষ্ট সৎকার করতে পারব—তাঁকে বুঝ্‌তে পার্‌ব, আমাদের কথা দিতে পার্‌ব, হৃৎকমলাসনে বসাতে পারব। এইরূপে বাহ্যেন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয় শোধন না কর্‌লে—বর রাস্তা দিয়ে চলে গেলে পর "বর কৈ, বর কৈ" বলে মনের দুঃখ র'য়ে যাবে। এখনকার আমাদের কর্ত্তব্য—অদ্বৈত, নিত্যানন্দের মত মহাপ্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করা।

একাকী কার্য্যারম্ভ

তাই এখন অন্যে কি কর্‌ছে না কর্‌ছে—'আমাকে লোকে সাহায্য করবে কি না'—'আমি একা কতটুকুই বা করতে পারি'—এরূপ ভাববার সময় নয়। যোগবলে বাসনার দড়ি ছিঁড়ে ফেলে 'পরমাত্মায় লীন হয়ে যাবার উপায় আমাদের বেদান্তের উপদেশ। এই বৈষয়িক আন্দোলনের যুগে—রেলগাড়ী খবরের কাগজের দিনে সেই বৈদান্তিক মুক্তির উপদেশ আর এক রকমের। এখন কর্ম্মের কাল। যোগও এক প্রকার কর্ম্মই বটে। কিন্তু এখনকার লক্ষ্য দশে পাঁচে মিলে—কেবল একজনের নয়—সমগ্র সমাজের চিত্ত, বুদ্ধি ও কর্ম্মের মুক্তি 'সাধন করা। সেই কর্ম্মক্ষেত্রে সকলেই অবতীর্ণ হও। কাহারও দিকে তাকাবার দরকার নাই। ভবিষ্যৎ ত সুস্পষ্টই—সুফল অবশ্যম্ভাবী। হিন্দুর আবার ফলাকাঙ্ক্ষাই বা কিসের ? "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"। অগ্রপশ্চাৎ ভাব্‌বার সময় নাই। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তা হ'লে একলা চলরে'। অনেকে ভয় ক'রবে—অনেকে বাধা দিবে—অনেকে 'মুখ ফিরিয়ে থাকবে'। কিন্তু তুমি নিষ্কামভাবে—ভগবানের ডাকে অগ্রসর হও।

গীতায় আছে "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ" অর্থাৎ কর্ম্মকে যিনি অকর্ম্ম মনে করেন আর অকর্ম্মকে যিনি কর্ম্ম মনে করেন—তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী ও সাধু। শাস্ত্রের উপদেশমাত্রই বা মহাপুরুষ যা বলেন বিনা আপত্তিতে সুফল কুফলের কথা না ভেবে কাজ করাই "কর্ম্ম"। আর নিজের অভিমান, কর্ত্তৃত্ব, বা ক'র্‌লে পাপ হবে বা পুণ্য হবে—এরূপ ভেবে করা "অকর্ম্ম"। তাই গীতা বল্‌ছেন—মানুষের মনে করা উচিত, যে শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশে যা করা হ'ল তা নিজের করা নয়—তাতে নিজের কোন বন্ধন বা আসক্তি নাই। আর শাস্ত্র বা গুরুর আদেশ লঙ্ঘন ক'রে যে অকর্ম্ম করা হ'ল তাই নিজের কর্ম্ম অর্থাৎ বন্ধনের উপায়—তাতে নিজের ফলভোগ কর্‌তে হবে।

তাই সকলে "ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে" একথা বলে বহির্গত হই। কৃষ্ণের বাঁশরী বেজেছে—গোপিনীগণ যে যেখানে যে অবস্থায়ই থাকুক—তখনই ছুটবে। আমাদেরও ভাবা উচিত 'মহাকাশ হ'তে ঐ বারেবারে আমারে ডাকিছে সবে'। কেজানে আমাদের অকিঞ্চিৎকর শক্তি দ্বারা কি হ'তে পারে! ভগবান্ লীলাময়—কোন্ লীলার অবতারণা হবে জানা নাই। কেবল "এনেছি মোদের দেহের শকতি, এনেছি মোদের হৃদয়ের ভকতি, এনেছি মোদের প্রাণ।" আর জানা উচিত যে "শুনে তোমার মুখের বাণী আস্‌বে ফিরে বনের প্রাণী—হয়ত তোমার আপন ঘরের পাষাণ হিয়া গলবে না—তা ব'লে ভাবনা করা চল্‌বে না।" মানুষের জীবনে পুণ্য কর্ম্মের সুবিধা অতি অল্পই ঘটে থাকে—যেটুকু যখন পাওয়া যায় তখনই তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। এখন নিশ্চেষ্ট হ'লে শেষে ভুগ্‌তে হবে। 'আমি শুধু রইনু বাকি'—এ খেদে জীবন কাটাতে হবে। তাই এ সুযোগকে কেহ উপেক্ষা ক'র না। আমি সকলকে সেই উচ্চ স্থানে উঠ্‌বার জন্য আহ্বান কর্‌ছি—

প্রত্যেককে প্রত্যেকে সাহায্য কর। টাকা পয়সা মান ধন—এসব অকিঞ্চিৎকর পদার্থ লইয়া এত যুঝাযুঝি করি? যদি 'লোকে আমায় ভাল বললে কি না,' 'আমার কাছে লোকে কি আশা করে'—'লোকের মন যোগাইয়া চলা উচিত'—ইত্যাদি ভেবে প্রাণপণ চেষ্টা করা সম্ভব হয়—যদি এসব দুদিনকার জিনিস নিয়ে ধন প্রাণ সবই পণ করা যেতে পারে—তবে স্বর্গরাজ্যের আস্বাদ পাবার জন্য চেষ্টা করা কি একেবারে অসম্ভব?

অভিভাবকের কর্ত্তব্য

এখন সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম্ম, মহাপুরুষ, স্বদেশের ভবিষ্যৎ, মুক্তি, বিজ্ঞান—এই সব বড় কথা ছেড়ে দুএকটা কাজের কথা ব'লে শেষ করি। আমাদের এখনকার কি কর্ত্তব্য তাই ঠিক করা যাক্। এখানে অনেক অবস্থার লোকই আছেন—কর্ত্তব্য এক একজনের এক এক রকম। কে কি ক'রলে, আর কি উপায়ে ক'রলে—আমাদের এই বিদ্যালয় চিরস্থায়ী হ'তে পারে—প্রত্যেকেই ভাব্‌বেন ও কর্‌বেন। আমি যা ভেবেছি তাই বলি।

অভিভাবকদের প্রতি আমার এই প্রার্থনা—তাঁরা যেন দেশের এ দুর্দ্দিনের অবস্থাটা বেশ ভাল ক'রে বুঝেন। নিজে দুপয়সা রোজগার ক'রতে পার্‌ছেন বলে, অনাহারে শীর্ণ মৃতপ্রায় ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কেবল মুখের সহানুভূতি প্রকাশ করেই যেন ক্ষান্ত না হন। নিজের দুবেলা

বিলাস বর্জ্জন ও অভাব দমন

পেটে ভাত না জুট্‌লে যে ভাব হয় ঠিক সেভাব যাতে মনে সর্ব্বদা থাকে, তার জন্য যত্ন ক'রবেন। তা'হলে—'এ নাহলে ভদ্রতা থাকে না'—'ও নাহলে লোকের কাছে বের হওয়া অসম্ভব'—এভাব আর মনে হবে না। তাঁহাদের মনুষ্যত্বের কাছে আমার এই করুণ নিবেদন যে, সকলেই দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত পাড়া-

পড়সীর অবস্থা হৃদয়ঙ্গম ক'রে--যত রকমের যা অভাব আছে সব কমাতে যত্নবান্ হ'ন। আমার বিবেচনায়—যা দিন কাল পড়েছে তাতে কেবল দুবেলা পেটে থাওয়াই একমাত্র দরকারী জিনিষ, আর সবই বিলাসিতা। চাদর জামা ছাতা ছড়ী, পান তামাক গদী তোষক চৌকি চেয়ার ইত্যাদি যা এতদিন খুব প্রয়োজনীয় বলে বোধ হচ্ছিল তা একেবারে অনাবশ্যক। চাল ডালের দর চড়েছে কথাটা ঠিক। কিন্তু এখনও ত ভদ্রতার খাতিরে, পাঁচজনের সৌজন্যের জন্য অনেক অপব্যয় হয়ে থাকে। একথা বুঝ্‌তে হবে যে, খরচ কমিয়ে একেবারে নিঃস্বের মত থেকে যে ভদ্রতা বা সভ্যতা হয় তার জন্য ধোয়া জামা ও ফুর্-ফুরে চাদরের ভদ্রতা পরিত্যাগ ক'রতে হবে। সময় বড় ভয়ানক—এদিক্ ওদিক্ ভাবা পাপ। এ উপায়ে খরচ কমাতে পারলেই অনেক দানের সুবিধা হয়ে যাবে।

অবশ্য সকল জিনিষই যদি ত্যাগ ক'র্‌তে হ'ল, তবে সূক্ষ্ম শিল্প, উন্নত কারুকার্য্য সবই যে লোপ পেয়ে যাবে। এর উত্তর "যাক্, সব লোপ পেয়ে যাক্; যদি কোন দিন সুদিন আসে তবে সভ্যতার সে অঙ্গটি ফিরে আনাবার চেষ্টা করা যাবে। আর যদি নৈপুণ্য একবার গেলে আর ফেরান না যায়, দরকার নাই—শিল্প সম্বন্ধে ততটা গরিব চিরকালই থাকব, কিন্তু তার বদলে পাব মনুষ্যত্ব ও পেটে দুবেলা ভাত।" এজন্য ছেলেদিগকে ত্যাগের পথে চলতে উপদেশ দেওয়া ও সাহায্য করা নিতান্ত দরকার। যখন পাড়ার সর্ব্বত্র লোকে না খেয়ে মর্‌ছে, তখন 'খালি পায়ে বেড়ালে অসুখ হবে বা কাঁটা ফুটবে বা সাপে কামড়াবে, বা ভদ্রলোকের বাড়ী যাবার সময় জুতা পরা উচিত'—ইত্যাদি কথা বল্‌লে স্বার্থপরতা ও হীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ছেলেরা ত স্বভাবতই দুর্ব্বলচিত্ত; তাতে বৃদ্ধদের কাছে ওরূপ কথা শুন্‌লেত একবারেই পেছিয়ে পড়্‌বে। কেবল জামাজুতা

ছাড়্‌তে ব'ললে চল্‌বে না, চিরজীবন যাতে কষ্টসহিষ্ণু হ'তে পারে তারও কেবল কথায় নয়, অনুষ্ঠানে, কাজের বেলাও সুবিধা ক'রে দিতে হবে। বলা হচ্ছে—'খরচপত্র কমাও,' অথচ তাম্বুলবিহারের কৌটার অভাব নাই বা টেবিল হারমোনিয়মে ঘর জুড়ে রাখা হ'ল বা মস্ত মস্ত মানুষের আকারপ্রমাণ আয়না কেনা হ'ল —তাতে সংযমশিক্ষা হয় না। বিধবা কন্যাকে যে সংযম পালন করতে হুকুম করা হবে, তার আগে কি বুঝা উচিত নয় সংযমপালনের সুবিধা নিজের বাড়ীতে আছে কি না? শুধু আতপ চাল আর কাঁচা কলা হবিষ্যি ঘরে দিলেই সংযমের ব্যবস্থা করা হ'ল না। বাপ মা, ভাই বোন সকলকেই সে পথে থাকতে হবে।

সংযমশিক্ষার উপায়

তাই অতি সামান্য বিষয় হ'তে আরম্ভ ক'রে বড় বিষয়ে ছেলেদের কিসে ইন্দ্রিয়সুখভোগের লালসা কমে তার চেষ্টা করতে হবে। মেয়েদিগকে স্বাধীনতার শিক্ষা দিয়ে ঘরে বেঁধে রাখ্‌বার চেষ্টা বৃথা। যখনই প্রকাশ্যভাবে স্কুলে যেতে শিখেছে তখনই জেনে রাখা উচিত —ওরা বক্তৃতাও দেবে—উকীল ডাক্তার সবই হবে—রাজনৈতিক আন্দোলনেও যোগদান কর'বে। তখন আর পর্দ্দার নিয়ম জারি করা মূর্খমি। যদি বাপ মার ইচ্ছা হয় ছেলেরা বড় হ'লে তাঁদের কথামত কাজ ক'র্‌বে—গুরুজনকে দেখ্‌লে প্রণাম ক'র্‌তে শিখ্‌বে—তবে তাদের শিক্ষার প্রথম দিন হতেই তাদেরকে নিজেদের ধর্ম্ম ও সমাজের প্রথা শিখাতে হবে। তা না হলে ইউরোপীয় সভ্যতার ছাঁচে ঢালা ভাবের সঙ্গে সংঘর্ষণে বাহ্য চাক্‌চিক্য বিশিষ্ট নূতনের জয় হবেই। তবুও বহু লোক আছেন যাঁরা ছেলেদিগকে বিজাতীয় ভাবে তৈয়ারী ক'রে ছেলেরা কেন ঠিক নিজের মনের মত খাঁটী স্বদেশী হল না ভেবে মনস্তাপ করেন। এরূপ অদূরদর্শী আর কেউ যেন না হন। সংযমের সহিত চিরজীবন কাটাতে হবে উপদেশ দিয়ে যাঁরা

ক'র্লে সংযম পালন হয় তার উপায় বিধান না ক'রে কেহ যেন ক্ষান্ত না হন্।

তারপর আর এক কথা—আজ কালকার দিনে ছেলেরাই বুড়োদের অনেক সময়ে শিখাবার উপযুক্ত। ইহাতে গুরুজনদের অপমান বা নিন্দার বিষয় কিছুই নাই। এ কথাটাত ঠিকই, বাপ যেমন ছেলের চেয়ে ৩০ বৎসর একদিকে বড়, ছেলেও তেমনি আর একদিক্ হ'তে বাপের চেয়ে সেই ৩০ বৎসরই বড়। দুজনের মনের ভাব কখনই এক হ'তে পারে না। অভিভাবক বা গুরুজনেরা সন্তানের মঙ্গল ও সুখবিধানের জন্য দিনরাত খাটছেন বটে—কিন্তু কিসে যে তার সুখ, কিসে দুঃখ, কেন সে কাঁদে, কেন হাসে একথা বুঝার শক্তি ও সুবিধা অনেক সময়ই তাঁহাদের থাকে না। এটা স্বাভাবিক নিয়ম—এ বিষয়ে দুঃখ ক'র্লে চলবে না। তাতে আবার আজ কালকার দিনে এক নূতন সমস্যা উপস্থিত। বাপমারা একভাবে শান্তির সহিত নির্ভাবনায় পারিবারিক ও সামাজিক জীবন চালিয়ে আসছিলেন, বিশেষ এক উপায়ে দান বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন কর্ছিলেন। কিন্তু এখন আর ঠিক সেই শান্তি সেই সুবিধার দিন নাই। আজ কালকার হাব ভাব -আদর্শ, চিন্তা কাজ কর্বার উপায় একেবারে স্বতন্ত্র। এ সময়ে বৃদ্ধদের পরামর্শ একবারেই খাটেনা। তাঁরা এ অবস্থা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গমই কর্তে পারেন কিনা সন্দেহ।

আধুনিক সমস্যা

এজন্য সর্ব্বদা সকল বিষয়েই তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক,বুঝাপড়া অবশ্যম্ভাবী ও নিতান্ত দরকার। নবীন ও প্রবীণদের মনের ভাব যখন এত তফাৎ—আর পৃথিবীর চারিদিক্কার অবস্থার যখন এত আকাশ পাতাল পার্থক্য—তখন সকল বিষয়ে যে বাক্‌বিতণ্ডা ঘরে ঘরে চল্‌বেই তার

নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্ব

আশ্চর্য্য কি? তাই যে বাড়ীতে আজকাল কোন আন্দোলন নাই —বুঝ্‌তে হবে সে বাড়ীতে প্রাণ নাই। অথবা অন্য কোথাও কেবল একবিষয়ে তর্ক চলে অন্য বিষয়ে তর্ক চলে না, সেখানে বুঝ্‌তে হবে—হয় নবীনে প্রবীণে এক মত হ'য়ে কার্য্যনির্ব্বাহপ্রণালী এক ক'রে ফেলেছেন, অথবা কোন রকমে গোঁজামিল দিবার চেষ্টা হচ্ছে। কথাটা এই সকল বিষয়েই সকল গৃহে আজকাল তর্ক বাঞ্ছনীয়। কেবল একবিষয়ে নয়—জীবনের প্রত্যেক কাজে—প্রতিদিনকার প্রত্যেক উঠাবসায়—এক নূতন ভাব আছে। কেবল বড় বড় কাজে নয়—চলাফিরাতেও বিশেষত্ব থাক্‌বেই। এজন্য গুরুজনেরা ক্ষুণ্ণ হবেন না। সেজন্য দুঃখ নাই এটা স্বাভাবিক।

ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য বোধ

প্রত্যেকের কাছে আমার সবিনয় অনুরোধ—তাঁরা মনুর বচনানুসারে মাসিক আয়ের দশমাংস বিদ্যালয়ের জন্য দান ক'র্‌তে যদি নিতান্তই অসমর্থ হন—(অভাব কমালে অসমর্থ হবার কোন কারণই দেখা যায় না)—তবে অন্ততঃ তিরিশ ভাগের একভাগ—অর্থাৎ একদিনের আয় প্রতি মাসে দান ক'রে সকলের কৃতজ্ঞতার ভাজন হউন। অবশ্য কেবল বিদ্যালয়ের জন্যত সমস্ত দান করা যায় না—অতিথিসৎকার আছে—দুর্ভিক্ষ ফণ্ড আছে—কন্যাদায় আছে—অন্য অনেকানেক চাঁদা আছে। কিন্তু ইচ্ছা কর্‌লেই এসব দান ক'রেও অবাধে প্রতি মাসে অন্ততঃ একদিনের আয় দেওয়া যেতে পারে। যদি ইহাই হয়—মাসের প্রতিদিন ভাল ক'রে পেট ভরার উপায় নাই; তাহ'লেও নাহয় আর একদিন বেশী কষ্ট কর্‌তে হবে। "শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়।" আমি একথা এখানকার সকলকে বল্‌ছি, আমলা পেয়াদা, উকীল ডাক্তার, কেরাণী দোকানদার, মহাজন—সকলের কাছেই আমার এই ভিক্ষা। তারপর অম্লান বদনে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে সমগ্র সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও

প্রকৃত স্বার্থসিদ্ধির জন্য দু একবছরের সাময়িক স্বার্থ ভুলে নিজের নিজের সন্তানগণকে আমাদের এ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করুন। অন্য কারও পরামর্শ নেবার দরকার নাই, নিজের হিতাহিত জ্ঞান ও কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে এ কার্য্যে ব্রতী হউন। "দেখা যাক্ কতদূর কি হয়. কয়েক মাস দেখা যাক—তার পর যা হয় করা যাবে"—এরূপ ভাবা ঠিক নয়। সকলেই ত এরূপ ভাব্‌তে পারে, তবে কাজ করে কে? আর ছেলে না হ'লে কি কেবল বাড়ীঘর টেবিল চেয়ারে স্কুল হয়?

এই বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব পূর্ব্বেই বলেছি প্রত্যেকের উপর নির্ভর ক'র্‌ছে! যে যে পরিমাণে শক্তি দিবে সেই টুকু শক্তিতেই ইহা চল্‌বার হয় চল্‌বে, না হয় মরে যাবে। "আমার ছেলে নাই, বা সকলের পড়াশুনা শেষ হয়েছে, লেখা পড়ার কথা না ভাব্‌লেও আমার চল্‌বে" এরূপ ভাবা নিতান্ত স্বার্থপরতা। দশের মঙ্গলের জন্যই নিজের যথাসাধ্য চেষ্টা ক'র্‌তে হবে।

আমি নিজে বাঙ্গালার এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ করি না। আমি জানি আমিই ইহাকে দেশের একটী সুবৃহৎ কারখানায় পরিণত কর্‌তে পারব। একথা সকলের সাম্‌নে বল্‌তে পারছি কেবল এই সাহসে, যে, আমি নিজের শক্তি যতটুকু আছে ততটুকু নিষ্কামভাবে ইহার লালন পালনের জন্য প্রয়োগ ক'র্‌ব। আর ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাক্‌লে দুর্ব্বলের বলেও অনেক কাজ হয়। "যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল তোমারি কার্য্য সাধিবে"—এভাব মনে সততই আছে ব'লে—কি পারি, কি না পারি চিন্তা কর্‌বার অবসর হয় না।

ছাত্রগণের কর্ত্তব্য

তার পর—ছাত্রদের প্রতি আমার কথা। আজ তোমরা জুতা জামা ছেড়ে দারিদ্র্যের প্রতিজ্ঞা ও কঠোরতার কঠিন শাসনে আপনাদিগকে

সম্মানিত মনে ক'রছ। কেন জান? ঐ দেখ—মাতৃমূর্ত্তি। আমাদের মা আজকাল আর কেবল সুস্মিতা, ভুবনমনোমোহিনী জনকজননী জননী নন। জগদম্বার এখন চণ্ডীমূর্ত্তি। একহাতে ইসারায় ইঙ্গিতে স্পার্টা রমণীর মত কর্ম্মক্ষেত্রে মাতিয়ে দিচ্ছেন; আবার আর একহাতে পরক্ষণেই বক্ষে টেনে নিচ্ছেন। সেই ভীষণমূর্ত্তি মাই আমাদের এই দীনহীন বেশ পরিয়েছেন। এখন আমাদিগকে বিভীষিকাতেই সৌন্দর্য্য লাবণ্য দেখ্‌তে শিখ্‌তে হবে। সুষমা কেবল চন্দ্রকিরণে বা ফুলেই নাই, পর্ব্বতে কাননেও আছে। আমাদিগকে সেই উগ্র মূর্ত্তির প্রভা দেখাবার জন্যই মা স্বয়ং ললাটনেত্র আরক্ত ক'রে সস্নেহ নয়নে সন্তানগণকে নিরীক্ষণ ক'রছেন। ভয়ের কোন কারণ নাই, মাই উত্তেজক, আবার মাই শান্তিদায়িনী। যিনি কেবল নদীর নিস্তব্ধতায়, বায়ুর প্রশান্ত গমনে—সমাজের শান্তিতে, মনের সুস্থতায় ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি ক'রেছেন তিনি ভগবানের ঐশ্বর্য্যের বিষয় কিছুই জানেন না। যিনি বিটপী-লতায় শশী-তারকায় বিরাজ ক'রছেন তিনিই আবার ঝড় তুফানে, অনলে ভূধরেও বিরাজমান। যে শক্তিতে গড়া হয় ভাঙ্গাও হয় সেই শক্তিতে, সৃষ্টিকর্ত্তাও ভগবান্ আবার প্রলয়ের কর্ত্তাও তিনি—

কষ্টসহিষ্ণুতা ও কঠোর জীবন অবলম্বন

"ব্রহ্মত্বে সৃজ্যতে লোকান্ বিষ্ণুত্বে পালয়ত্যপি।
রুদ্রত্বে সংহরত্যেব তিস্রোঽবস্থাঃ স্বয়ম্ভুবঃ॥"

তাঁহার যদি এই তিন রূপই হ'ল, তবে রুদ্রমূর্ত্তিতে আর ভয় কিসের? তাই আর তোমাদের নগ্ন শরীর ও নগ্নপদ আমার কাছে দুঃখের কথা না ব'লে সুখেরই কথা ব'লে দিচ্ছে। তোমাদের এবেশ দীনতা বা হীনতার পরিচায়ক নয়। সুখসম্পদ্‌ভোগী বিলাসী নীচাশয়ই তোমাদিগকে ও কথা বল্‌বে। কিন্তু ভাবুক যে, প্রেমিক যে, সে কখনও ওরূপ ভাব্‌তে সমর্থ নয়। তোমাদের এই ত্যাগের মলিন বেশ ত তোমাদের মনকে,

অন্তরাত্মাকে মলিন করতে পারেনি। এখনও "অধরে সারাটী বেলা হাসি করে ছেলেখেলা"। এরই নাম বিষাদের সৌন্দর্য্য, কষ্টের মাধুরী। "Love is loveliest when embalmed in tears." যে প্রেমিক সে দেখ্‌ছে তোমাদের সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়ে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হচ্ছে। তোমাদের মুখমণ্ডলের প্রভা এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ক'রেছে। দেখ্‌তে পাচ্ছে তোমাদের চারিদিকে ভগবানের দিব্য লাবণ্যের আভা বেষ্টন ক'রে আছে। ইহাই তোমাদের বর্ম্ম ও লৌহ-কবচ। রোগতাপ সকলের নিবারণ ইহা হ'তেই হ'বে। দেশের দূষিত বায়ুতে তোমাদের কোন অনিষ্ট হবে না। কীট পতঙ্গ সর্পাদি তোমাদের অমঙ্গল ক'র্‌তে পার্‌বে না। তোমাদের এই দুর্ভেদ্য কবচই তোমাদের এক মাত্র ত্রাতা। এই সামর্থ্যে বলী হ'য়ে জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বহির্গত হ'তে হবে। সেখানে অনেক প্রবল শত্রু—দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অকাল মৃত্যু, সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা, পরনির্ভরতা, আত্মগ্লানি, অর্থপৈশাচিকতা। উহাদের সহিত যে তুমুল সংগ্রাম তোমাদিগকেই করতে হবে। তখন তোমাদের পিতা মাতা অভিভাবক কেউ থাক্‌বেন না। তখন নিজেই—এ সব ভার গ্রহণ করতে হবে। সেই ভবিষ্যৎ জীবনসংগ্রামের জন্যই এখন হ'তে তোমরা প্রস্তুত হ'চ্ছ।

তাই তোমাদিগকে অনেক সহ্য করতে হবে। অনেক ক্লেশ স্বীকার করতে হবে। সকল বিষয়েই সংযমী হ'তে হবে। গৃহে ব'সে যখন বাপ মার সঙ্গে কথা বল্‌ছ—দেশ সম্বন্ধে অথবা নিজের সম্বন্ধেই হ'ক—দেখো তর্কের মধ্যে যেন ঝগ্‌ড়ার ভাব না থাকে। তাহ'লে নিজেই হার্‌বে। তোমাদের জয়লাভ ত নিশ্চয়ই হ'বে,—কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকের জয়লাভের উপযুক্ত হওয়া দরকার। স্বভাবের পরিচয় দাও। সকলকে দেখাও—একদিন নয়—দুদিন নয়—দশবার নয়—প্রতি

স্বীয় চরিত্র-বলই জয় লাভের একমাত্র উপায়

মুহূর্ত্তে, প্রতি কাজে, প্রতি কথাবার্ত্তায়—যে উৎকট বৈরাগ্যের প্রকৃত ভাব তোমার মধ্যে প্রবেশ ক'রেছে। যাতে তোমার কথায় লোকে বিশ্বাস করতে পারে সর্ব্বদা সেই চরিত্র দেখাও! দিন রাত বাক্‌বিতণ্ডায় ভয় পেয়ো না, চক্ষুলজ্জা যেন না থাকে—তাহ'লে আর স্বভাব তৈরী হ'ল কৈ? অন্যে কি বল্‌বে ভেবে কাজ ক'র্‌লে কি আর নৈতিক উন্নতি হয়? এই ত্যাগের পথে আস্‌বার জন্য তুমি যে ব্যাকুল হ'য়েছ—তার প্রমাণ কি? তুমি দিনে সেজন্য অশ্রুজল ফেল কতবার? এখনকার এই যে মামুলি বাঁধা পথ তা যে তোমার উন্নতির কণ্টক তা বুঝাতে তুমি নিজে কি ক'র্‌ছ?

তাই বলছি নিজে যদি ঠিক হও অপরকে ঠিক ক'রে নিতে পার্‌বেই। উদ্দেশ্য তোমাদের মহৎ। সাধন কর্‌বার শক্তি আছে প্রমাণ কর্‌তে পার্‌লেই সকলকে তোমার মতে আন্‌তে পার্‌বে। একথা ঠিক বুঝো যে কেবল মনুষ্যত্বের, সচ্চরিত্রের, সংযমশীলতার প্রমাণ দিয়েই সকলের মন ভিজাতে পার্‌বে, নতুবা নয়।

আর জেনো চিরজীবন সংযমই হিন্দু সমাজের আদর্শ। ত্যাগ, ইন্দ্রিয়-দমন, শৌচ, সংযম যে কেবল পঠদ্দশায় তা নয়। আমাদের সমাজের নেতারা মনুষ্যজীবনের প্রত্যেক ধাপেই ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম ক'রে দিয়েছেন। বিবাহ কর্‌লে যে নিয়ম কানুনের দড়ী ছিঁড়ে ফেলতে পারা যায় তা নয়। বিবাহিত জীবনেও অনেক নিয়ম পালন করতে হয়—আরও কঠোর। মানুষ ঠিক কোন্ পথ দিয়া অগ্রসর হ'লে জন্ম জন্মান্তরে চরমে মুক্তিলাভ করতে পারে—আর জন্মবন্ধনে বাঁধা না পড়ে আমাদের সমাজ তাহার চেষ্টা করেছেন। আমাদের শাস্ত্রকার-গণ মানুষের মনের ও শরীরের গতি অনুসারে বৃত্তি সকলের বিকাশানু-যায়ী তার কি কখন শ্রেয় ও প্রেয় হয় এই বিষয় অত্যন্ত বিচক্ষণ-

হিন্দু সমাজের বিশেষত্ব—জীবনের প্রত্যেক স্তরেই ন্যূনাধিক সংযমের ব্যবস্থা

তার সহিত বুঝে মনুষ্য জীবনের চারি আশ্রম সৃষ্টি ক'রেছেন। প্রত্যেকটীর উদ্দেশ্যই মোক্ষ ও নির্ব্বাণ এবং প্রত্যেকেই অপরটীর সঙ্গে অতি সুসাধ্য ও স্বাভাবিক ভাবে সংলগ্ন। কিন্তু মুক্তি কেবল কঠোরতার ভিতর দিয়ে সম্ভব নয়; মানুষের মধ্যে যখন কোমল ভাব, প্রেম, রস, ভক্তি, দয়া, সখ্য আছে, তখন তাহাদিগকে একেবারে ফেলে দিলে চলে না। আমাদের সমাজও এসব গুলিকে মেনে এবং অপরাপর বৃত্তি নিচয়েরও কি উপায়ে সম্যক্ বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি হয় সমস্ত বুঝে—নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি, ত্যাগ ও ভোগ, সন্ন্যাস ও সংসার—এই দুইএর সমন্বয় ক'রেছেন। আমাদের চার আশ্রমেই এই দুএর সমন্বয়,—কিন্তু অবস্থাভেদে সমন্বয় এক এক রকমের।

কবি রঘুবংশীয় রাজাদের এককালীন গুণবর্ণনা ক'র্‌তে গিয়ে লিখেছেন—

"শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥"

জীবনের চরম সময়ে যোগ সাধন ক'রে যে তনুত্যাগ করা তা সম্ভব, কেবল তখনই হ'তে পারে—যখন বাল্যকালে ইন্দ্রিয়ের অপরিণত অবস্থাতেই তাকে সংযত কর্‌বার জন্য গুরুগৃহে বাসের চেষ্টা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার নিয়মাধীনতা শিক্ষা হয়; যদি যৌবনে, যখন ভোগলালসার প্রথম উদ্রেক হয় তখন মনুষ্যকে সংসারের ও সমাজের কঠোর কর্ত্তব্যের কথা বুঝিয়ে দিয়ে প্রবৃত্তিকে শান্ত ও নিবৃত্ত কর্‌বার চেষ্টা হয়; আর যদি বৃদ্ধ বয়সে, যখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হ'য়ে পড়েছে, মনের জোর আর তত বেশী নাই, যৌবনের উদ্যম হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে,

কালিদাসের আদর্শ রাজ-পরিবার

তখন মুনি ঋষিদের মত স্বল্পভাষী পরিমিতাহারী ও নির্জনবাসী হবার ব্যবস্থা করা যায়। তাই আমাদের সমাজে গোড়া থেকেই এত আট-ঘাট বেঁধে চলা। রসের ভিতরেও কঠোরতা চাই, এভাব বার বার কেবল উপদেশে নয়—প্রত্যেক কাজেই দৃষ্ট হয়। আর, বাস্তবিক, সংযম না থাকৃলে রসের আস্বাদনও তত ভাল হয় না। কবি বলেছেন "প্রকৃত প্রেম বুঝে—সতীই, স্বৈরিণী নয়।"

এই কষ্টস্বীকার, নিয়মাধীনতা আমাদের সর্ব্বাগ্রে শিখ্‌তে হবে। বিয়ে কর্‌লেই পচে যায় না। তখনও ব্রহ্মচর্য্যপালন ক'র্‌লেই হ'ল। শাস্ত্রে গৃহস্থের, সংসারীর, টাকা রোজগারের অনেক প্রশংসা পাওয়া যায়। কিন্তু তাই ব'লে যেন এক চোখো হয়ে মহাভারতকে বা মনুসংহিতাকে আমাদের মত সংসারী ভোগীদের উকীল ক'রে না ফেলি! গৃহস্থের ঘর ভোগের আড্ডা বটে—কিন্তু তার নিজের কপালে উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ। যে যেখানে আছে—অতিথি, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক, পশু, পক্ষী,—সকলকে দান ক'রে অবশিষ্ট যা থাকৃবে গৃহস্থের অধিকার কেবল সেটুকুতে। বাস্তবিক, হিন্দু শাস্ত্রকারেরা যেরূপ বলেছেন তাতে বুঝা যায়—কেবল বানপ্রস্থাবলম্বী ভিক্ষু, অতিথি, ব্রাহ্মণ এবং অপর জীবের উপকারের জন্যই সংসার এবং পরিবার। অর্থ-সঞ্চয় কর্‌তে বলেছেন—ধনসম্পদ বৃদ্ধি কর্‌বার অনেক আয়োজন ক'র্‌তে বলেছেন - কিন্তু কি জন্য? কেবল দানের জন্য—"যত সুখ দানে"। হিন্দুধর্ম্মে রাজা "অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভির্নির্ম্মিত" হ'য়েও—সকল দেবাংশসম্ভূত হ'য়েও—তাঁকে প্রধান কর্ত্তব্য পালন ক'র্‌তে হয়—ব্রাহ্মণের অধীনতা স্বীকার ক'রে এবং যজ্ঞ দানাদি অনুষ্ঠান ক'রে। ভোগ ও ত্যাগের অদ্ভুত সমন্বয়।

হিন্দুমতে সংসার-তত্ত্ব

তাই এমনভাবে আমাদের মন প্রাণ গ'ড়ে তুল্‌তে হবে—যে মর্‌বার সময় এত সব বাড়ী ঘর টাকা পয়সা ফেলে যেতে হ'ল বলে কষ্ট না হয়।

যখন তখন মর্‌বার জন্য প্রস্তুত থাকতে হ'বে। অবশ্য যেখানে সেখানে গিয়ে গোঁয়াড়ের মত বা Don Quixote এর মত একটা গোলমাল বাধিয়ে দেওয়া দরকার—তা নয়। কথাটা এই যে—যে কাজই করিনা কেন, তার সুসাধনের জন্য শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা কর্‌বই। ইহাতে নির্য্যাতিত হ'তে হয় ভয় করি না—অম্লান বদনে সে দণ্ড সহ্য ক'রতে হবে। তবুও নিজের মুক্তির পথে চল্‌তে গিয়ে—বড় বিপদ্ দেখে পশ্চাৎপদ যেন না হ'তে হয়। ইহারই নাম প্রাণপণ—প্রকৃত জীবনোৎসর্গ।

এখন হ'তে তোমরা দেশের সকলের পরীক্ষার বস্তু হ'লে। দেখো সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত চ'লো। কেউ যেন কোন খুঁত ধর্‌তে না পারে। তোমাদের আদর্শজীবন গ'ড়ে সামাজিক ভাল মন্দের নূতন standard, নূতন মাপকাঠি প্রস্তুত ক'র্‌তে হবে। আজ কাল্‌কার লোকেদের মতামতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। আমরা এই লোকরুচিকে পরিবর্ত্তিত ক'রে নূতন এক public opinion বা লোকমত সৃষ্টি ক'র্‌তে চাই। কিন্তু আমাদের সাবধান হ'য়ে চল্‌তে হবে। আমাদের যেন কোন ত্রুটি না হয়। বিদ্যালয় স্থাপন কর্‌বার প্রথম উপকরণ ব'লে অহঙ্কার যেন না জন্মে। অভিভাবক ও বৃদ্ধদের বুঝাতেছ, তর্কে পরাস্ত ক'র্‌ছ ব'লে ভক্তির হ্রাস বা অশ্রদ্ধা যেন না হয়। ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ ক'র্‌তে হবে—উচ্চ স্বভাবের প্রকৃতি হচ্ছে নম্রতা। বয়সে বৃদ্ধ বা অন্য কোন ভাবে পূজনীয় ব্যক্তিদের নিন্দা বা অপমানসূচক বাক্যব্যবহার একেবারে বর্জ্জন ক'র্‌তে হবে। রামায়ণে পড়েছিলাম—রামচন্দ্র সকল বিষয় নিজে জেনেশুনেও পাছে গুরুদের মর্য্যাদার হানি হয় সেজন্য বালসুলভ ঔৎসুক্যের সহিত তাঁদের কে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'র্‌তেন এবং সকল উপদেশ অবনত মস্তকে পালন কর্‌তেন ;

ছাত্রগণের প্রকৃত দায়িত্ব ও পরীক্ষা

জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির এরূপ যোগ আমাদের আবশ্যক। ছেলের মুখে

অনেক বুড়োর কথা ব'লে ফেল্‌তে হবে বটে—কিন্তু তাতে 'বুড়োমি' যেন প্রকাশ না পায়। তারপর নিজেদের মধ্যে সকল বিষয়ে মিলেমিশে নানাবিধ লোকহিতকর কাজ ক'র্‌তে আরম্ভ কর,—নেতাদের কথা শিরোধার্য্য ক'রে চল্‌বে। সাম্যের অর্থ যাতে যার অধিকার ঠিক সেটুকুর প্রাপ্তি। সকলের সঙ্গে সমান হ'তে গিয়ে ৯ বছরের আর ১৯ বছরের ছেলের কোন বিষয়ে একই অধিকার কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। প্রকৃত সাম্যের ব্যবস্থায় অনেক অসাম্যের স্থান থাক্‌তে পারে। উঁচু নীচু ছোট বড় ধাপ গুলিকে মেনে না চল্‌লে যথার্থ সমতা হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া সম্বন্ধে অধিকতর যত্ন ক'র্‌তে হবে। নিজেদের বিদ্যালয়ে পড়্‌ছ ব'লে যা ইচ্ছা তা কর্‌লে চল্‌বে না। সর্ব্বদা তত্ত্বাবধায়কদের কর্ত্তৃত্বাধীনে কাজ কর্‌তে হবে। যথেষ্ট কষ্টস্বীকার করছ ব'লে যথেচ্ছাচারী হ'লে চল্‌বে না। দেখো যেন শিক্ষকের অভাব হ'লেও তোমাদের নিজের শিক্ষার অভাব না হয়। দেশের অন্যান্য অনেক কাজ কর্‌তে হচ্ছে ব'লে—চাঁদা আদায়, সভাসমিতি করা, মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ, লোককে শেখান, পরোপকার, সমাজ-সেবা—ইত্যাদি অনেক রকমের ভাল কাজে মনোনিবেশ কর্‌ছ ব'লে—বই পড়া ও বিদ্যাভ্যাসকে একেবারে তুচ্ছ মনে করোনা। সমস্ত পৃথিবীর লোক তোমাদের চলা ফিরা আগ্রহের সহিত দেখ্‌ছে। আগেই বলেছি—আমাদের এ ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ে সমস্ত মনুষ্যজাতির কার্য্য সাধিত হচ্ছে। তাই সমগ্র নরসমাজ তোমাদের বিচারক ও পরীক্ষক। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌লে—কেবল বাপ মা নয়—সকলেই সন্তুষ্ট হবেন।

Economic Basis

মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি

আজ এ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও নামকরণ হ'য়ে গেল। মালদায় এ অনুষ্ঠান যে টিকবেই তার অনেক কারণ আছে। এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে

কোন সন্দেহেরই প্রয়োজন নাই। এর বিশেষত্ব কোথায়? প্রথমতঃ মালদহবাসীদের কথা—এঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার তত বেশী ধারেন না। এঁদের প্রায় সকলেই স্বাধীন জীবিকা দ্বারা জীবনধারণ ক'রে থাকেন। আদর্শ,

মালদহবাসীদের প্রকৃতি

সভ্যতা, কায়দা কানুন—সবই এখানে খাঁটী স্বদেশী বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। এখানে বিদেশী সভ্যতার আলোক এখনও তত বেশী প্রবেশ ক'র্‌তে পারেনি। বরং এখানকার এ বিষয়ে একটু অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে একটু সংঘর্ষণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যাক, সে দোষের জন্য বিশেষ কিছু যায় আসে না। সকল বিষয়ে যখন এত স্বদেশী ভাব—চাকরীর জন্য যখন কেহই লালায়িত নন—তখন ইহাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি যে পাবই সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। মালদার যা বিশেষ কারুকার্য্য, এখানকার শিল্পীরা যা ভাল ক'র্‌তে পারে—এদেশের তাঁতি জোলারা, পোলুওয়ালারা যে ব্যবসা বিশেষ পছন্দ করে—আমাদের বিদ্যালয়ে তারই ভাল রকম শিক্ষা দেওয়া হবে। আমাদের ছেলেরা যাতে সংসারের সকল কাজে এবং গৃহস্থালীর সকল দিকে নজর দিতে পারে তারই বিশেষ চেষ্টা থাক্‌বে। এজন্য প্রত্যেক মহাজন, দোকানদার, ব্যবসায়ী যে নিজের ছেলেদের আমাদের এ স্কুলে দিবেন এবিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি। তা ছাড়া অন্যান্য স্বাধীন ব্যবসা ও যা এখানে নাই তাও শেখান হবে। অন্য কোন জেলার স্কুল না টিকিতেও পারে, কিন্তু কেবল মালদহবাসীদের দ্বারাই যে আমাদের সফলতা হবে, তার বেশ আশা করা যায়।

তারপর—এখানকার বিদ্যালয়ের প্রাণ কারা? ইহাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্য কারা উঠে পড়ে লেগেছেন? এই জেলার মধ্যে যাঁরা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি

শিক্ষা-প্রচারক সৃষ্টি

মাননীয় পদ অধিকার ক'রেছেন—তাঁরাই অন্য সকল স্বার্থ ত্যাগ ক'রে,

সকল পার্থিব আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে—এ বিদ্যালয়ের জন্য যে যে বিষয়ে প্রস্তুত হওয়া দরকার সে সব বিষয়ে প্রস্তুত হ'চ্ছেন। ইঁহারা একদিকে বিদ্যায় ও জ্ঞানে অত্যুচ্চ—তাতে আরার স্বভাবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। নিজেদের সম্মান কর্‌তে না শিখ্‌লে আত্মশক্তি হয় না—তাই একথা বলা। ভবিষ্যতে যাতে সমাজকে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন, তার জন্য এখন নিজেরা শিক্ষা কর্‌ছেন। এঁরাই যখন এখানকার উদ্যোগী, তখন আবার ভাবনা কি ? অন্য কোন জেলায় এরূপ শিক্ষা-প্রচারক তৈয়ারী হচ্ছেন না। এত আশার কারণ যেখানে সেখানে আবার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ ?

আয়

মালদার স্কুলের স্থায়িত্বের আশার অন্যতম কারণ ইহার আয়ের তালিকা। সকল প্রকার লোক হ'তে এখানে টাকা তোলা হ'চ্ছে। বিশেষ এই, ছেলেরা জুতা জামা ত্যাগ ক'রে তার দামটা এক সঙ্গেই হক্ বা মাসে মাসেই হক্—আমাদের জাতীয়-শিক্ষা-ধনভাণ্ডারে জমা কর্‌বে। তাছাড়া সকল শ্রেণীর সকল লোক হ'তেই কিছু কিছু মাসিক আদায়ের চেষ্টা হচ্ছে। এরূপে একটা স্বেচ্ছাপ্রদত্ত 'শিক্ষা-কর' বসান হয়েছে।

আশা ও প্রার্থনা

আর আমার এখন বল্‌বার কিছু নাই। আজ যে যজ্ঞে হবি প্রদান করা হল, আশা এ অগ্নি আর নির্ব্বাপিত হবে না। এখন এই সুখের দিনে—জাতীয় জীবন গঠনের আরম্ভকালে—সকলে অনৈক্য ভুলে প্রত্যেকে নিজের শক্তির প্রতি দৃষ্টি রেখে জাতীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হবেন ভরসা দিন। সকলে পাড়ায় পাড়ায় ঘোষণা ক'রে বেড়াও—ছেলেরা যে যেখানে আছ, দলে দলে এই দেবমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা বলো গিয়ে। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। তাই সঙ্কল্প কর্‌বার কালেই প্রথমাবস্থাতেই ইহার অপ্রকটিত মহত্ত্ব উপলব্ধি করুন। সমবেত শক্তির

দ্বারা কি হ'তে পারে ভাব্‌বার আগে ভাবুন—নিজশক্তির দ্বারা কি হ'তে পারে।

এক্ষণে এই সদ্যোজাত শিশুকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বিদায় হই।

"অঙ্গাদঙ্গাৎসম্ভবসি হৃদয়াদভিজায়সে।

আত্মা বৈ পুত্রনামাসি জীব ত্বং শরদাং শতম্‌॥"

গুরুজনেরাও ইহার মঙ্গল কামনায় আশীর্ব্বাদ করুন—"হে মালদহের জাতীয় বিদ্যালয়, তুমি আমার অন্তরের অন্তরতম স্থান হ'তে উদ্ভূত হ'য়েছ—তোমার সত্তায় আমার নিজেরই পুনর্জন্ম অনুভব কর্‌ছি, আমিই তোমার রূপ ধরে দ্বিতীয়বার জাত হ'লাম। তুমি শতবৎসর বেঁচে থাক।"

তারপর—মনের সকল বাসনা ছেড়ে—হৃদয়কে আকাঙ্ক্ষার ঝটিকা হ'তে উচ্চে স্থাপন ক'রে নিষ্কামভাবে, আন্তরিক ভক্তির সহিত—আমাদের ভারতীয় মহাজাতির সাধনীভূত এই মহান্‌ শিশুকে সকলে মিলে প্রণাম করি।

এ কথা যেন মনে থাকে—আশীর্ব্বাদ কর্‌বার, মঙ্গলকামনা কর্‌বার অধিকার অনেকেরই আছে। কিন্তু শিশুকে লালন পালন কর্‌বার ভার কেবল পিতা মাতারই। দর্শকেরা না হয় শিশুর নামকরণের দিন একমোহর দিয়েই দেখে গেল। কিন্তু ঐ শিশু মোহর খেয়ে বাঁচে না—বাঁচে প্রতিদিনের মাতৃস্তন্যে। আমাদেরও এই শিশুর জন্য তিল তিল ক'রে যথাসাধ্য প্রত্যেকের রক্তপাত ক'র্‌তে হবে।

হে বনজাত তরুলতা—হে কাননের বিহঙ্গকুল, তোমরা আমাদের এই নবপ্রসূত শিশুকে বাঁচিয়ে রেখো। মনুষ্যসমাজ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হ'লেও তোমাদের করুণা ও প্রীতির ধারা যেন সদাই বয়। তোমরা এদেশের সমস্তই পর্য্যবেক্ষণ ক'রেছ—তোমরা সকল দৃশ্যেরই সাক্ষী। তোমরাও বহুকাল পরনির্ভরতা-সঙ্কুচিত শুষ্কপ্রাণ নরসমাজের দ্বারা অভ্যর্থিত হও

নাই। এই শিশুর জীবনে তোমাদের যথেষ্ট স্বার্থ। আবার তোমাদের কুঞ্জবন জাতীয় জীবনের প্রভাতে পাখীর গানে মুখরিত হ'য়ে উঠবে এবং আম কাঁঠালের বনে আবার মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। জলাশয়, দেবালয় ও মুনি ঋষিদের আশ্রমে দেশ আবার ভ'রে যাবে। ফলে ফুলে ভরা হয়ে ধরণী তোমাদের সঙ্গে আবার সেই মধুর আলাপ কর্‌বেন।

হে দেব চন্দ্র সূর্য্য—হে তারকারাজি, তোমরা আমাদের এই শিশুর অজ্ঞান তিমির দূর ক'রে বিজ্ঞানালোকে ও ধর্ম্মের জ্যোতিতে চারিদিক্ উদ্ভাসিত কর। মোহান্ধকার যেন এই শিশুর হৃদয় আচ্ছন্ন কর্‌তে না পারে, এবং বাহ্যাড়ম্বরে ওর চিত্ত সংমোহন যেন না হয়।

হে মঙ্গলগ্রহ, তুমি ইহার ধনসম্পদের ব্যবস্থা ক'রে দিও। ইহার ধনভাণ্ডার যেন সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে—ব্যবসা বাণিজ্যে যেন যথেষ্ট খ্যাতি লাভ কর্‌তে পারে।

হে অন্যান্য গ্রহগণ, তোমরা যে যেখানে আছ সেখান হ'তে তোমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল দান কর। ইহার বিদ্যা, জ্ঞান, যশঃসৌরভে সকল দিক্ পূর্ণ হ'ক। ইহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা—আত্মত্যাগের শক্তি হ'ক।

হে পবনদেব—তুমি তোমার মলয়জ-শীতল সুরভি মন্দ গন্ধবহ দ্বারা ইহাকে উৎপ্রাণিত ও সঞ্জীবিত ক'রে রেখো। বিদেশের দূষিত বায়ু এসে যেন ইহাকে রোগে শোকে বিপর্য্যস্ত ক'র্‌তে না পারে।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তোমরা ইহার শরীরের প্রতি দৃষ্টি রেখো। ইহার ব্যায়ামশিক্ষার ভার তোমাদেরই হাতে।

হে দিক্‌পালগণ—তোমরা ইহার সকল শত্রু দূর ক'রে দেও। বাল্যকালে অপরিণত বয়সে যেন ইহার উপর কঠিন ভার না পড়ে। ইহার শিক্ষার অবস্থায় তোমরা প্রহরীর কাজ কর।

হে দিগঙ্গনাগণ, তোমরা পুষ্পবৃষ্টি কর—দুন্দুভি বাজাও, স্বর্গরাজ্যে

ইহার বার্ত্তা লয়ে যাও। স্বর্গবাসীকে প্রস্তুত হ'তে বল—তাঁদের শীগ্‌গিরই মর্ত্ত্যে উপনিবেশ স্থাপন কর্‌বার জন্য আস্‌তে হবে। এই আমাদের শিশুই উঁহাদের নেতা হবেন।

হে ভারতের প্রকৃতিদেবী, তুমি তোমার বৈচিত্র ও মহিমার মধ্যে রেখে, তোমার অঙ্কস্থ ক'রে ইহাকে শিক্ষা দাও। গিরি, প্রস্রবণ, ভূধর, কন্দর, নদী, উপবন, আকর, সাগর—কোথায় কোন শক্তি কোন্ ঐশ্বর্য্য লুক্কায়িত আছে ইহাকে বিশ্বাস ক'রে দেখিয়ে দাও। প্রত্যেকটির সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে দাও। কাজের সময়ে যেন ও সকলের সাহায্য পেতে পারে। ইহাকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস ক'রো, বুঝ্‌তে পার্‌ছনা তোমার দুঃখদৈন্য ঘুচিয়ে তোমার প্রকৃত স্থানে, জগতের গুরুস্থানে বসাবার জন্যই ইহার আবির্ভাব ?

হিন্দু ও মুসলমান

—০ঃ✽ঃ০—

বৈরাগ্যে বিরোধ অসম্ভব

হিন্দু-মুসলমানে বিরোধের ভয়ে ভগ্নোৎসাহ হওয়া উচিত নয়। বাস্তবিক হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব নাই। প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম নিয়ে কোন ভু-সমাজে গোলযোগ বাধ্‌তেই পারে না। ত্যাগই প্রকৃত ধর্ম্ম। যে সমাজেই ত্যাগী ব্যক্তি দেখি না কেন, তাঁকে হিন্দু বল্‌ব কি মুসলমান বল্‌ব ঠিক বুঝ্‌তে পারি না ;—তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারা যায় যে, তিনি ধার্ম্মিক। তাঁর হৃদয়ে মলিনতা দূরীভূত হ'য়ে মহাসত্যের দিব্য আলোক বিরাজমান। তবে দেশ কাল ভেদে আচার ব্যবহারের পার্থক্য জন্মে বটে। কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিক এই বাহ্য পার্থক্যের ভিতরই যথার্থ হৃদয়ের ভাব বুঝে নিয়ে সকলের সঙ্গে এক হ'য়ে থাক্‌তে পারেন।

ধর্ম্ম বিরোধের কারণ হইতে পারে না

ত্যাগে, অনাসক্তিতে, বৈরাগ্যে কখনও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় না। ভোগে আসক্তিতেই যত কলহ। বাহ্য বস্তুর প্রতি টান্ হ'লেই 'কতটুকু আমার, কতটুকু তোমার' এ প্রশ্ন আসে। স্বার্থ ব'লে এক জিনিষ এসে উপস্থিত হয়। তার অর্জ্জন ও রক্ষণে যত জ্বালা, যত কষ্ট, যত বিরোধ। তাই যখন হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের মিল নাই, একথা শুনি, তখন যেন না বুঝি, 'ধর্ম্ম সম্বন্ধে এদের মারামারি কাটাকাটি, সেই ধর্ম্মভেদের মীমাংসা না হ'য়ে গেলে

যত বিরোধ ভোগে

দুয়ে মিলে মিশে কোন কার্য্যই ক'র্‌তে পার্‌বে না। দুদিনের জন্য হয়ত মিললেও মিলতে পারে, কিন্তু শীঘ্রই আবার কলহাগ্নি জ্বলে উঠ্‌বে।'

যদি বিরোধের কথাতেই ভয় পেতে হয়, তবে হিন্দুদের মধ্যেই ত কত বিরোধ দেখা যায়? বাড়ী ঘর, টাকা পয়সা, বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ভায়ে ভায়ে কত লাঠালাঠি! সেরূপ হিন্দু মুসলমানেও লোভের বস্তু, ভোগের বিষয় নিয়েই দলাদলি। আর বাজে লোকেরা সেই সব পার্থিব সুবিধার দ্বারাই ইহাদের মনোমালিন্য ঘটাতে চেষ্টা ক'রে থাকে। এক টুকুরা রুটি ফেলে দিলে যেমন কুকুরগুলো তার লাভের জন্য নিজেদের ভিতরে কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি করে, সে রকম যে সকল বিষয়ে কয়েকটা লাভের আশা আছে সেই সকল বিষয়ে হিন্দুতে হিন্দুতে, হিন্দুতে মুসলমানে, মুসলমানে মুসলমানে, ঈর্ষাদ্বেষ কলহের প্রবৃত্তি জন্মে ও বেড়ে যায়। আজ যদি এরূপ শুনা যায় যে ২৫০।৩০০ টাকার একটা চাকরি, সামান্য শিক্ষিত যে কোন লোক আবেদন ক'র্‌বে, তাকেই দেওয়া হবে, তবে একথা নিশ্চয় বল্‌তে পারি, যে আমরা তাকে উপেক্ষা ক'রে, মাথা ঠিক রেখে ধীর ভাবে নিজের কর্ম্মে মনোনিবেশ কর্‌তে পারি না। আমার বিশ্বাস, প্রত্যেকে—হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, বিহারী, মৈথিলী, মাড়োয়ারী—নিজের বা নিজের ছেলের জন্য এখনই দরখাস্ত ক'র্‌বেন ও যাতে নিজেদেরই ভাগ্যে জোটে, সে ইচ্ছায় পীরের সিন্নি অথবা ঠাকুরের লুট্‌ মান্‌বেন।

স্বার্থ সিদ্ধির অভিলাষই সর্ব্বত্র বিরোধ সৃষ্টি করে

বৈরাগ্য সৃষ্টির উপায়

তাই ধর্ম্মের বৈষম্যে ভয় করার কোনই কারণ নাই। দুদলই স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত—কেহই স্বার্থত্যাগের জন্য নয়। তবে হিন্দু

আধুনিক জগতের শিক্ষা, সভ্যতা, চালচলন সমস্ত ভাল ক'রে দেখে শুনে বুঝেছে যে,—ওর মধ্যে স্থায়ী জিনিষ বেশী কিছু নাই। অনেক জিনিষই ফাঁপা—"দিল্লীকা লাড্ডু।" হিন্দুর এ ভাবে পৌঁছাতে অনেক দিন লেগেছে, অনেক ডেপুটিগিরি, কেরাণীগিরি, জজিয়তী, ওকালতীর পর,—তবে এখন কিছু কিছু বুঝ্‌তে পেরেছে যে, স্বাধীনভাবে টাকা রোজগার করতে না পার্‌লে অন্নের গ্রাস তত সুস্বাদু হয় না। আর পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাক্‌লে মাঝে মাঝে চল্‌লেও অনেক সময়ে ভুগ্‌তে হয়। সে জন্য যাতে নিজে ব্যবসা ক'রে খেতে পারে, হিন্দু তার চেষ্টায় মনো-নিবেশ করেছে।

বর্ত্তমানকালে হিন্দুর স্বার্থ

মুসলমানকেও তাই ক'র্‌তে হবে। তা'কেও সেই রসের আস্বাদ দিতে হবে। ভোগ বাসনা তৃপ্ত না হলে ভোগের মর্ম্ম বুঝ্‌বে না এবং ত্যাগের স্পৃহা জন্মিবে না। এখনও পাশ্চাত্য শিক্ষা মুসলমানসমাজে বেশী প্রবিষ্ট হয় নাই। আধুনিক সভ্যতায় যতটুকু সত্য আছে, তা এখনো ওরা বুঝে নাই। মুসলমানেরা সুখ্যাতি, মান সম্ভ্রম এখনও প্রচুর পরিমাণে পায় নাই। লাভের এত তফাৎ ব'লে এর কাছে আস্‌তে এরা এত ব্যস্ত।

ভোগ-ব্যাপারে মুসলমান এখনও পশ্চাৎপদ

ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। হিন্দুর একদিনেই ভোগপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় নাই। অনেকবার অনেক রকম কুফল সহ্য ক'রেও হিন্দুরা 'প্রেয়'কেই 'শ্রেয়' জ্ঞান ক'র্‌ত, অবশেষে অনেক ধাক্কা খাওয়ার পর উহার প্রতি বীতস্পৃহ হচ্ছে। সেইরূপ মুসলমানদেরও ভোগের ইন্দ্রিয়গুলি চরিতার্থ না হ'লে নিবৃত্তির দিকে প্রবৃত্তি জন্মিতেই পারে না। তাই ওরা যে এখন এত আগ্রহের সহিত বিদ্যালয়ে প্রবেশ ক'র্‌ছে, ওদের

ভোগবাসনা তৃপ্ত হ'বার পর মুসলমানগণের ত্যাগাকাঙ্ক্ষা জাগরিত হ'বে

মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য সুবন্দোবস্ত হচ্ছে, ঘরে ঘরে চাক্‌রি বিতরণের চেষ্টা হচ্ছে, সমস্তই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর।

ভোগপরায়ণ, বিষয়লিপ্ত ব্যক্তিকে মুক্তির পথে আন্‌তে হলে, তাহার সদ্‌গুরু প্রথম অবস্থায় ঐ ভোগের বাধা প্রদান করেন না। তিনি তার স্বাভাবিক প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ না ক'রে বরং ভোগাকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণ কর্‌বার জন্য ইহার সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতিই দেখান। এই অবস্থাতেই তাঁকে যতটুকু সম্ভব, ত্যাগের উপদেশ, নিবৃত্তির পথে চলবার উপদেশ দিতে এবং সেই পথে ধীরে ধীরে নিয়ে চলতে হয়। মুসলমানদের সম্বন্ধেও হিন্দুদের সেইরূপই ক'র্‌তে হ'বে। ওদের এই অবস্থায় দুঃখিত না হ'য়ে, বরং তারই মধ্যে ত্যাগের আদর্শ, যতদূর সম্ভব দেখিয়ে তাদের প্রকৃত উন্নতি ও মুক্তির সহায় হওয়া উচিত।

পরে যখন ওরা উচ্চশিক্ষার আলোকে দেখ্‌তে পাবে যে, যে মুসলমানসমাজ একদিন এশিয়ার এক প্রান্ত হ'তে ইউরোপের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হ'য়ে পৃথিবীকে জ্ঞানালোক দান ক'রেছিল, সেই সমাজের প্রতি কৃতজ্ঞ না হ'য়ে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ তাদের কীর্ত্তি হ্রাস ও লোপ ক'র্‌তেই বদ্ধপরিকর; যখন ইতিহাস ও রাজনীতির উপদেশ,—ওদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিবে যে, আধুনিক জাতিরা মুসলমান সমাজ বা সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক নয়,—বরং তাদের মহিমার ইতিহাস বিকৃত করতেই অভিলাষী; আর যখন বুঝ্‌বে যে, মুসলমানদের গৌরব ও মাথার মণি তুরস্কের সুলতানকে ইউরোপ অতি ঘৃণার চক্ষেই দেখে থাকে, সভ্য ইউরোপের মধ্যে তুরস্ক এক চন্দ্রকলঙ্ক, ইউরোপের মানচিত্রে তুরস্কের ছবি এক কালিমারেখা;—তখন আর বঙ্গজননীর যমজ সন্তান হিন্দুমুসলমান দুদিনকার স্বার্থ নিয়ে মজে না থেকে, পরস্পর পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব আনয়নের সহায়তা কর্‌বে। তখন তারা "খেলা ধুলা সকল

মুসলমান সমাজে প্রকৃত উচ্চ শিক্ষার ভবিষ্যৎ ফল

"ফেলে মায়ের কোলে ছুটে এসে" – নিজেদের প্রকৃতিগত উৎকর্ষের সম্পূর্ণ বিকাশ কর্‌বার জন্য ভারতীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌বে। এ বিপুল বিশ্বে মুসলমানদের সাহিত্য, কারুকার্য্য, বিজ্ঞান ও সভ্যতা কোন্ লক্ষ্য নিয়ে কি উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হ'য়েছে, পৃথিবীতে ইহার অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে কি না, তাহা বুঝ্‌বার জন্য ব্যাকুল হ'বে। মুসলমানসমাজ নরসমাজের কোন্ কাজ কর্‌বার জন্য আবির্ভূত হয়েছে, এই বিংশ শতাব্দীতেই শ্রম-বিভাগনীতির নিয়মানুসারে সমগ্র মনুষ্য সমাজের জন্য কোন্ অভাব মোচন ক'র্‌তে হবে, কোন উদ্দেশ্য সাধন ক'র্‌তে হবে কি না, তা বুঝ্‌তে যত্নবান্ হবে।

তাই এখন আমাদের আশার কারণই হয়েছে, এ সময়ে ওদের বন্ধু হওয়াই দরকার। দোষ কর্‌লেও তাই সহ্য ক'র্‌তে হবে। স্বভাব যদি বাস্তবিকই নিম্নগামী হয়, তবে তার গতিরোধ ক'র্‌তে যাওয়া বিফল প্রয়াস। ইহাতে কুফলেরই সম্ভাবনা। আর এই অধোগতির সময়ই অধিক যত্ন, অধিক আদর প্রয়োজন। তাই মুসলমানদের একেবারে ছেড়ে না দিয়ে নিজেরা স্থিরভাবে ওদের ধ'রে ধ'রে রাস্তা দেখিয়ে চল্‌তে হবে। ইহাইত মনুষ্যত্ব।

হিন্দু মুসলমানের অগ্রগামী বন্ধু ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

ঐক্য-বন্ধনের প্রণালী

আর এখনকার দিনে বেশী দিন এ কষ্ট সহ্য ক'র্‌তে হবে না। মুসলমানেরা শীগ্‌গির দেখ্‌তে পাবে, স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানদেরই ষোল আনা লাভ। তাঁতী জোলা ইত্যাদি মুসলমানদের মধ্যেই বেশী। আর স্বাধীন ব্যবসা বা জীবিকা অর্জ্জনের উপায়ে যে কত সুখ পাওয়া যায়, তাও দু'একটা দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পেলেই চোখ ফুটবে। হিন্দুদের দৃষ্টান্তে, সর্ব্বদা তাদের কাজকর্ম্ম দেখে

দৃষ্টান্তের প্রভাব

বুঝ্‌বে—স্বাধীন চিন্তায়, স্বদেশী কাপড় চোপড় ব্যবহারে, স্বদেশী বিদ্যালয়ে প্রবেশ ক'র্‌লে কোন বিষয়েই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। দেশে এত রকমের স্বাধীন চিন্তা ও স্বায়ত্ত কর্ম্মের অসংখ্য কেন্দ্র ও অনুষ্ঠান দেখ্‌লে, স্বাবলম্বনের লিপ্সা মুসলমানদের মধ্যে জন্মিতে বেশী দেরী হবে না। হিন্দুদের এ ভাবে আস্‌তে যতদিন লেগেছে, ওদের ততদিন লাগ্‌বে না। বর্ত্তমান অবস্থায় ৩০ বৎসরের কাজ ১০ বৎসরে হ'য়ে যাবে।

সাহিত্যালোচনায় ঐক্যবর্দ্ধন

হিন্দুদের প্রধান কর্ত্তব্য, মুসলমানদের সঙ্গে মিলে মিশে চলা, ওদের প্রতি সহানুভূতি দেখান। সেজন্য পরস্পর পরস্পরকে যত ভাল রকম চেনা যায়, তার চেষ্টা করা উচিত। অচেনা লোকদের মধ্যে অনেক বৈষম্যই উপস্থিত হয়। মুসলমানকে হিন্দু যে একেবারে চেনেই না, তা নয়। প্রত্যেক সমাজই অপরের অন্তরের কথা জানে। অনেক দিন হ'তে একত্র বাস করায়—দু'য়ের মধ্যে হৃদয়ের যোগ হ'য়ে গেছে। সে সদ্ভাব যাবার নয়। তবে এই একশ বছরে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের প্ররোচনায় ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে 'আলোকপ্রাপ্ত' লোকদের মধ্যে কিছু মনোমালিন্য ঘটেছে। তা নিবারণ কববার জন্য হিন্দুর এখন মুসলমান সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত। মুসলমানকেও হিন্দুর আচারব্যবহার, সাহিত্য, শাস্ত্র পড়ান উচিত। এ উপায়ে দু সমাজের স্বাভাবিক সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত করা হ'বে।

মহম্মদের ধর্ম্ম-শিক্ষায় এক-রাষ্ট্রীয়তা

আর, একতা-শিক্ষা মুসলমানকে দিতে হবে না। এক-রাষ্ট্রীয়তা সম্বন্ধে মুসলমানদের মত নিপুণ জাতি খুব কমই আছে। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ কেবল ধর্ম্মবীর নন, কর্ম্মেই তাঁহাব অধিকার বেশী। জগতে অনেক মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে। অনেকে স্বসমাজের মধ্যে গৃহবিবাদ ঘুচিয়ে দিয়ে প্রত্যেক লোকের একমন একপ্রাণ করে দিয়েছেন।

কিন্তু আরব্য মরুভূমির উষ্ট্রপালকের ন্যায় ঐক্যস্রষ্টা অতি অল্পই আবির্ভূত হ'য়েছেন। ইঁহার মন্ত্রবলে দুই মহাদেশের অসংখ্য লোক ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভুলে মুসলমান সাম্রাজ্যের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা ও বিস্তারের জন্য পৃথিবীতে যে অদ্ভুত কাজ দেখিয়েছেন, রাষ্ট্রীয় জগতে সেরূপ অলৌকিক ব্যাপার আর কোথাও দেখা যায় নাই।

অন্যান্য ধর্ম্মবীর

যীশুখ্রীষ্ট আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে জগৎকে বিমোহিত ক'রেছিলেন। তাঁর ব্রহ্মতেজে মনুষ্যসমাজের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মহিমার ভাব উদিত হ'য়েছিল। জগতে ওরূপ ঔদার্য্যের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। বুদ্ধদেব সংযম ও কঠোরতার প্রতিমূর্ত্তি। নিয়মপালনে যে চরিত্র গঠন হয়, সংসারে অনেক অভিলাষ দমন ক'র্‌তে হয়, তাঁর জীবনের এই উপদেশ। চৈতন্য ভক্তি ও প্রেমের রসে সকলকে মাতিয়েছিলেন। ধর্ম্মবীজ বপনের জন্য প্রেমবারি সেচন ক'রে তিনি সকলের হৃদয়ক্ষেত্র উর্ব্বর ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যেরা সব ভক্ত, প্রেমিক, বৈরাগী।

কিন্তু মহম্মদের বিশেষত্ব এই যে, তিনি কর্ম্মী, ধুরন্ধর, ঐক্য-প্রতিষ্ঠাতা। তাই মহম্মদের উপাসককে জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার কোন প্রয়োজন নাই।

হিন্দু-মুসলমানে মিলন ও ঐক্য অবশ্যম্ভাবী

তাঁদের সঙ্গে হিন্দুর স্বাভাবিক হৃদ্যতা পাশ্চাত্যপ্রভাবে কিছু বিকৃত ও মলিন হ'য়ে আছে। তাঁহাদের প্রকৃতির সেই নৈসর্গিক অবস্থা যে উপায়ে শীগ্‌গির শীগ্‌গির ফিরে আস্‌তে পারে, কেবল সে উপায় অবলম্বন ক'র্‌তে হবে। একবার প্রকৃতিস্থ হ'লে, ওঁদের কি কাজ ওঁরা নিজেরাই বুঝে, অসংখ্য বাধা বিপত্তির ভিতরেই স্বদেশপোতকে চালাতে সমর্থ হবেন।

নিম্নশ্রেণীর অধিকার

যথন আমরা স্বদেশবাসীদের কাছে আবেদন কর্‌ব বা মনের ইচ্ছা প্রকাশ কর্‌ব, তথন কেবল উকিল ডাক্তারকেই যেন দেশের লোক মনে না করি। বাস্তবিক দেশের লোক কারা? কাদের উপর দেশের ভরসা? কারা আমাদের শক্তির আধার?

এ প্রশ্নের উত্তর এত দিন আমাদের দেশে ভাল ক'রে দেওয়া হয় নি। এত দিন পর্য্যন্ত মনে হ'ত যে, যে কয় জনা মুষ্টিমেয় লোক ইংরাজি শিখে কাছারিতে চাকরি বা ওকালতি করে, তারাই প্রকৃত শিক্ষিত সভ্য, দেশের লোক তারাই। তারা যা করে তাই ঠিক। আর যে লক্ষ লক্ষ নর নারী রাস্তা দিয়ে চলা ফেরা করে, তারা নিম্নজাতি,—জনসাধারণ, তাদের যা করাবে, তাই তারা কর্‌বে। দেশের উন্নতি অবনতিতে তাদের কিছু যায় আসে না। ইংরাজিওয়ালারাই সমাজের নৈসর্গিক নায়ক,—কেবল হুকুম মেনে চলাই আর সকলের কর্ত্তব্য।

শিক্ষিত সমাজ

এত দিন যে কাজ কর্ম্ম হ'ত, যত আন্দোলন হ'ত, সকলগুলিই এই ইংরাজি শিক্ষিত দলে আবদ্ধ থাক্‌ত। দুই দলে কোন সহানুভূতিই ছিল না।

কিন্তু আজ কাল বোধ হয় আর কেহ ওরূপ ইতর ভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত তফাৎ কর্‌তে ইচ্ছুক নন্। এখন হয়ত সকলেই বল্‌বেন যে, যে কয়জন লোক ইংরাজি বলে, সভা সমিতি ক'রে, বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়, বা চাকুরি ক'রে খায়, তারা দেশের প্রকৃত শক্তি নয়। দেশের আসল শক্তির স্থান—অপর সকল অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত বা ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ লক্ষ লক্ষ সাধারণ

অশিক্ষিত জনসাধারণ ও নিম্নশ্রেণী

লোকেরা। দেশবাসী ব'ল্লে আমি এই সব লোকই বুঝি, যাদের হাটে বাজারে পাই, রাস্তায় যাদের সঙ্গে দেখা হয়, যারা দোকান করে, ব্যবসা করে, ঘরে ব'সে থাকে, তারাই প্রকৃত পক্ষে দেশের লোক। এদের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। এদের সামর্থ্যেই দেশ বলীয়ান্।

'দেশকে শেখাতে হবে, লোকশিক্ষা দিতে হবে, স্বাদেশিকতা বর্দ্ধন ক'র্‌তে হবে, ঐক্য সাধন ক'র্‌তে হবে, দেশের লোকের সাহায্য নেওয়া হক', যখন এ রকম কথা বলা হয়, তখন আমি বুঝি, যে মুদি পসারি, তেলি গোয়ালা, তাঁতী দর্জী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি যত প্রকার লোক আছে, কেবল উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, সরকারি চাকর বা লেখক নয়—সকলকে এক মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে একই কাজে ব্রতী ক'র্‌তে হবে। বড় একটা কাজ ক'র্‌তে হলে যে ধনের প্রয়োজন তা কেবল দুজন একজন বড়লোকের দানে সংগৃহীত হ'লে প্রকৃত পক্ষে জাতীয় কাজ হ'ল না। সমস্ত জাতির পক্ষে মঙ্গলকর কাজ কেবল সেটাই, যাতে ইতর দরিদ্র, ধনী, জমিদার সকলে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে তার সাহায্য কর্‌বার জন্য যত্ন করে। সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিলে মিশে, কি উপায়ে কাজ ক'র্‌তে পারা যায়, এখন হ'তে কেবল সেই চেষ্টাই করা আবশ্যক। তবেই সমস্ত দেশের ঐক্য সাধন হবে। তা না হলে যত দিন স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার ভাব থাক্‌বে, বিলাসিতার চাল থাক্‌বে, ততদিন কোন কাজকেই জাতীয় পদবাচ্য ক'র্‌তে পারা যাবে না। প্রকৃত ভাবে জাতির কাজ ক'র্‌তে হ'লে শিক্ষিত অশিক্ষিত, উকিল দোকানদারকে একই কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ যোগ্যতা ও অধিকারানুসারে কর্ত্তব্য পালন কর্‌তে হবে।

উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে আন্তরিক সহানুভূতিতেই দেশের সামর্থ্য

সকল কাজেই জনসাধারণের মত গ্রহণ ক'রে তাদেরকে নেতৃবর্গের নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করা আবশ্যক। ইংরাজিজানা বা শিক্ষিত

লোক সমাজে কয় জন? কেবল তাদের দ্বারাই কি দেশের উন্নতি হবে? অনেকে মনে করেন এঁরাই ত চরিত্রসম্বন্ধে অধিক অবনত, এঁদের কর্ত্তব্যপরায়ণতার অভাব যথেষ্ট, কষ্টের মধ্যে মনস্থির রাখ্‌তে অনেক সময়ে এঁরা অসমর্থ আর বর্ত্তমান স্বার্থের লোভে সমস্ত সমাজের ভবিষ্যৎ আশা নির্ম্মূল করতে কুণ্ঠিত নন। এঁদের মধ্যেই অনেক লোক অপরাধী হ'য়ে দাঁড়াবেন, সম্ভাবনা আছে। কিন্তু নিম্নশ্রেণী ও জনসাধারণের চরিত্রে অনেক গুণ আছে। তাদের শরীর বেশ শক্ত, তাদের পরনির্ভরতার ভাব নাই, তাদের মধ্যেই স্বদেশের সনাতন আদর্শ সম্পূর্ণ বিদ্যমান, এরাই দেশের প্রতিষ্ঠালাভের প্রধান অবলম্বন।

জনসাধারণের মনুষ্যত্ব

———

সমাজে পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রভাব

———o———

অনৈক্য নিবারণের উপায়

আমাদের দেশের এত মতভেদ, ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ. দেখে বসে থাকবার প্রয়োজন নাই। একতার বাধা বিঘ্ন অনেক বটে, কিন্তু তা নিবারণ করবার উপায়ও অনেক। দুশত বৎসর পূর্ব্বে ইহা অতি কঠিন ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান জগতে বিজ্ঞানের বলে এ সব অতি তুচ্ছ বিঘ্ন। আগে যা অসম্ভব ছিল. এখন তা সুসাধ্য ও সহজ।

ঐক্যের বিঘ্ন

আমরা তবুও নূতন অবস্থায় পুরাতন নিয়ম ও বুলি চালাতে চেষ্টা করি। এতদিন চট্টগ্রাম ও করাচির লোক একই ভাবে একই বিষয় ভাববার ও বুঝবার সুযোগ পায়নি ব'লে, একদল অপর দলের সহিত সুপরিচিত হ'তে পার্‌ত না ব'লে, এখনও মনে করি যে সমবেত কর্ম্ম ও চিন্তার জন্য ভাব ও কর্ম্মের যে আদান প্রদান দরকার, তা এ দেশে কখনই সম্ভবপর নয়। বাস্তবিক পক্ষে অপর দেশে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ যে উপায়ে সমাহিত হ'য়ে জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হ'য়েছে, ইউরোপে ও আমেরিকায় অসংখ্য মতভেদ থাকা সত্ত্বেও লোকেরা যে উপায়ে যে কৌশলে একই দেশের, একই সমাজের লোক ব'লে পরিচিত হ'তে পারে, আমাদের এদেশেও এখন তাই সম্ভব।

বর্ত্তমান যুগের বিভিন্ন সুযোগ

বিদ্যা, বুদ্ধি, ও বিজ্ঞান কখনই কোন লোকের বা সমাজের একচেটিয়া থাক্‌তে পারে না। বিজ্ঞান কোন দিনই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হ'য়ে পড়্‌বে না। জ্ঞানের গতি অতি প্রবল, উহাকে কোন মতেই কোন জাতির

মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখা যায় না। উহা চল্‌বেই, সর্ব্বত্র প্রসারিত হবেই, তবে দুদিন আগে আর পরে, এই যা। সমস্ত পৃথিবীতে বিজ্ঞান এখন ছড়িয়ে পড়েছে, আমাদের দেশে এখন এই বিজ্ঞানালোচনার দরকার। জড়জগতের ও চিজ্জগতের সমস্ত নিয়মগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদের লোকের জানা প্রয়োজন। তা হলে বাহ্যজগতের ও মনোজগতের যে যে বাধা বিঘ্ন আছে তার প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবিত হবে।

এই বিজ্ঞানালোচনাই ঐক্য ও স্বায়ত্তশাসন এনে দিবে এবং ইহাদিগকে স্থায়ী কর্‌বার ব্যবস্থা কর্‌বে। যে রাষ্ট্রশাসনপ্রণালীতে প্রত্যেক প্রজার অধিকার স্থাপিত হয়, যাতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের, হিন্দু মুসলমান, সকলের সম্পূর্ণ বিকাশের সুবিধা ক'রে দেয়, তা কেবল রেলগাড়ী ও খবরের কাগজ দ্বারাই সুসাধিত হ'তে পারে। দেশ ও কালরূপী যে দুই মহারাক্ষস সর্ব্বদা মানুষের কাজকে বাধা দেয়, তারা কেবল বিজ্ঞানের দ্বারাই খর্ব্ব হ'তে পারে।

পদার্থ-বিজ্ঞানের রাষ্ট্রীয় প্রভাব

বিজ্ঞান-সম্মত শাসনপ্রণালী

বিজ্ঞান যেমন স্বায়ত্তশাসনেরই পৃষ্ঠপোষক ও প্রবর্ত্তক, প্রজাতন্ত্রও তেমনি জ্ঞানী বিদ্বৎসমাজেরই উপযুক্ত—বিদ্যা ও বুদ্ধিবলেই গঠিত, অত্যুচ্চ বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে সৃষ্ট এবং বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র বিকাশের সহায়ক। প্রত্যেক নর নারীর যে কেবল কর্ত্তব্যই আছে, তারা কেবল খাজানা দিতে বাধ্য, হুকুম মেনে চল্‌বে, আইনানুসারে কাজ কর্‌বে, তা নয়। তাদের প্রত্যেকেরই অধিকারও আছে, সকল রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে, দেশের সমস্ত ব্যাপারেই তাদের মতামত গ্রহণ করাও

বিজ্ঞান ও প্রজাতন্ত্র-শাসন পরস্পর-সাপেক্ষ

অবশ্য কর্ত্তব্য। কেবল রাজস্ব দেওয়াই প্রজার কর্ত্তব্য নয়, সেই ট্যাক্স কি বিষয়ে কি পরিমাণে ব্যয়িত হবে, তাও তার বুঝবার ও জান্‌বার এবং সে সম্বন্ধে ভালমন্দ বলবার অধিকার আছে। ইহাই স্বায়ত্তশাসন, ইহাতেই প্রত্যেকের মনুষ্যত্ব বিকাশ হয়। এ জন্যই প্রজাতন্ত্র ভিন্ন আর কোন রাজ্যশাসনতন্ত্রই সত্য নয়, মানবের লক্ষ্য ও আদর্শ স্থানীয় হ'তে পারে না। বিজ্ঞান ছাড়া যেমন এই শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হ'তেই পারে না, তেমনি প্রজাতন্ত্র ছাড়া এ জগতে বিজ্ঞানসম্মত শাসন আর কিছুই নয়।

তাই আমাদের বর্ত্তমান তামসা নিশার রাজ্য হ'তে উজ্জ্বল জ্যোতি-বিশিষ্ট দিবালোকে গমন কর্‌বার জন্য, এই মহা ''অসৎ'' হতে "সৎ"এ যাবার জন্য আমাদের জেলায় জেলায়, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, বিজ্ঞানচর্চ্চার গণ্ডী বিস্তৃত ক'র্‌তে হ'বে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন—'বিজ্ঞানালয়ই প্রজা-তন্ত্রের মন্দির'। তাই দেশের সর্ব্বত্র বিজ্ঞানালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

বিজ্ঞান-শিক্ষার আবশ্যকতা

———

আমাদের কর্ত্তব্য

——:*:——

জীবনের নূতন লক্ষ্য

দেশে অনেক লোক উকিল ও জজ হয়েছেন। এখন চাই আমরা—রাষ্ট্রনীতি-বিশারদ ও সমাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত; ওকালতী বুদ্ধিতে কত টুকুই বা হ'তে পারে? রাষ্ট্রশাসনকর্ত্তারা যে আইন প্রস্তুত ক'রে থাকেন, কেবল তারই প্রয়োগ করতে উকিলেরা চুলচেরা বুদ্ধি খাটিয়ে দিন যাপন করেন। তাহাতে ইহাঁদের চালাকি, ফিকিরী, বাক্যপাণ্ডিত্য ও অপরকে বাগে ফেলবার বুদ্ধিরই বৃদ্ধি পায়। ইহাতে আবিষ্কার করার শক্তি বা নূতন অবস্থায় পড়লে কিরূপ ব্যবস্থা করা দরকার, তার চেষ্টা কোনও দিনই হয় না। জজিয়তী বুদ্ধিতেও তাই, কেবল এই তফাৎ, যে উকিলেরা বাঁধা আইনের প্রয়োগ করতে গিয়ে কেবল এক পক্ষের যত যা বলবার আছে, তারই হিসাব করেন। আর, বিচারকেরা পক্ষপাতী ও অধীর হ'তে পারেন না। কিন্তু কেবল ফাঁকী দেবার চুলচেরা বুদ্ধি বা ধীর ও নিরপেক্ষ স্বভাব দ্বারা বড় একটা জাতি বা দেশের কাজ চলতে পারে না।

রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও সমাজ-নীতির অনুশীলন

তার জন্য এমন লোকের দরকার, যাঁরা এত বড় একটা সমাজের সমস্ত অতীত পর্য্যবেক্ষণ এবং বর্ত্তমান অবস্থার সম্যক্ আলোচনা ক'রে সুদূর ভবিষ্যতের জন্য কোন্ পথে চলতে হবে, তার আবিষ্কার ক'রতে পারেন। অসংখ্য মতভেদ, জাতিভেদ, অবস্থাভেদ, ধর্ম্মভেদের মধ্যে কি উপায়ে সমন্বয় ও ঐক্য সাধন হ'তে পারে, যাতে কোনও ব্যক্তি বা সমাজবিশেষের অসুবিধা না হয়, অথচ অধিকার ও উপযোগিতানুসারে

প্রত্যেকের চিন্তা ও কার্য্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে দেওয়া যায়, সেরূপ ব্যবস্থা ক'র্‌তে পারেন, এমন প্রশস্তহৃদয়, স্থিরবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন লোকের প্রয়োজন। আইন মেনে চল্‌তে পারে বা কেবল আইন প্রয়োগ ক'র্‌তে পারে, এমন লোকের প্রয়োজন বেশী নাই। আমরা চাই এমন লোক, যাঁরা আইন প্রস্তুত ক'র্‌তে পারেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসন-প্রণালী আবিষ্কার ক'র্‌তে পারেন।

এদেশে এতদিন কেবল কেরাণী উকিল ডাক্তারই তৈরী করা হ'য়েছে। আমাদের সমাজে উচ্চ শ্রেণীর বুদ্ধিসম্পন্ন, কোন কাজে দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত, মানুষ প্রস্তুত কর্‌বার সুবিধা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাদ-রায়চাঁদ-বৃত্তিধারী পণ্ডিতগণ বা বিচারক ও ব্যারিষ্টারেরা সে ভাবে আবিষ্ক্রিয়া ও উদ্ভাবনী শক্তি অনুশীলন কর্‌বার ক্ষেত্র পান না। তাঁদের নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ দ্বারা স্বাধীন ভাবে কোন বিষয় বা ব্যাপারের অনুসন্ধান করতে হয় না। তাঁরা সেজন্য চিন্তিতও নন্। সুতরাং সমাজের বিবিধ সমস্যা বিষয়ে তাঁদের কাছে বেশী আশা করা যায় না।

দেশের কাজের মধ্যে, নানা গোলমালের মধ্যে, গৃহবিবাদ মত-ভেদের মধ্যে থেকে যাঁরা জীবন গঠন কর্‌তে সুযোগ পান, কেবল তাঁদেরই দ্বারা সে কার্য্য সুসাধিত হ'তে পারে।

নূতন কর্ম্ম-কেন্দ্র গঠন

পরের জন্য খাট্‌তে খাট্‌তেই জাতির কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়। আমাদের এখন সে রকম প্রতিষ্ঠান অনেক গঠন করা দরকার, যাতে লোকে দেশের নায়ক ও সমাজের নেতা হবার জন্য প্রস্তুত হ'তে পারে। মামুলি ব্যবস্থায় কেবল রাষ্ট্রকার্য্যে কেরাণীগিরি কর্‌বার জন্য একপ্রকার লোক গড়্‌বার চেষ্টা হয়েছে। সমাজের গুরুভার গ্রহণের জন্য লোক প্রস্তুত কর্‌বার কোন কারখানা নাই। সেজন্য নূতন রকমের বন্দোবস্ত ক'রে নিতে হবে।

স্বদেশ সেবকের সাধনা ও কর্ম্মক্ষেত্র

আদর্শ কর্ম্মী ব্যাপকভাবে সমস্ত কাজ দেখে অতি দূর ভবিষ্যতে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে কাজে হাত দিবেন। পথের মধ্যে অনেক বাধা বিপত্তি হ'তে পারে, অনেক নৈরাশ্যের কারণ উপস্থিত হ'তে পারে, অনেক ঝড় তুফান উঠ্‌তে পারে। এ সব প্রথম হ'তে বুঝে তার জন্য যথেষ্ট আয়োজন ক'রেই যাত্রা করা দরকার। হঠাৎ বিপন্ন বোধ কর্‌লে চল্‌বে না, কারণ "মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাব রঙ্গে" – সে আশা খুব কম।

নির্ভীকতা ও একাগ্রতা

তাঁকে সমাজের কোথায় কোন্ শক্তি আছে, যত জায়গায় যত সুযোগ ও সুবিধা আছে, সব খুঁজে বের ক'রে সকলের ব্যবহার কর্‌তে হবে। এজন্য উচ্চ নীচ সকলের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে যার দ্বারা যে উপায়ে যতটুকু সম্ভব, কাজ করিয়ে নিতে হবে। তাঁকে অনেক মানুষ ও অনেক জিনিষ নিয়ে কারবার ক'র্‌তে হবে। তাই কার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার দরকার বুঝে চলা শিখ্‌তে হবে, এবং অশিক্ষিত অৰ্দ্ধশিক্ষিত বা অমার্জ্জিতবুদ্ধি সকল লোককে দায়িত্বের কার্য্য একটু একটু কর্‌তে দিয়ে ভবিষ্যতে তাদেরকে স্বাধীনভাবে বড় বড় কাজ কর্‌বার জন্য উপযুক্ত ক'রে তুল্‌তে হবে। এরূপ কাজের লোক ছোট খাট অনেক তৈরী করা চাই।

সর্ব্ববিধ সুযোগ ব্যবহার

এখন এ সকল কাজ ক'র্‌তে যত সহিষ্ণুতা ও কৌশল দরকার, সমস্ত অবলম্বন ক'রে, সমস্ত লোকের সহানুভূতি ও সাহায্য আকর্ষণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে হবে। এ সব কাজ নিজেদেরই ক'রে নিতে হবে। কোন জিনিষই "বাড়া ভাত" নয়।

ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য-বোধ

নিজেদের চেষ্টাতেই সকল লোককে এ কাজে ব্রতী কর্‌তে হবে। আর অন্যে সাহায্য কর্‌ছে কি না কর্‌ছে, 'এ পথে আমি একা, একা কতটুকু কাজই বা করা যেতে পারে' আদর্শ কর্ম্মীদের তা ভাবা উচিত নয়।

সাধারণ লোকে মাংসপিণ্ডটাকেই পুষ্ট কর্‌তে পেলে আর কিছু চায় না; তারা নিন্দামলিন প্রাণের জন্য দুঃখিত নয়। তারা "যশো-ধনানাং হি যশো গরীয়ঃ" একথার অর্থ বুঝে না। তাই স্বার্থসিদ্ধির আশা দিয়েই সকলের মন ভিজাতে হবে। আর এজন্য অনেক অপমান নিন্দা সহ্য ক'র্‌তে হলেও হতে পারে। "আমাকেই উদ্ধার কর্‌ছেন" এই ব'লে সকল লাঞ্ছনাই শিরোধার্য্য ক'রে নিতে হবে।

স্বার্থসিদ্ধির আশা প্রদান

আর, সকল কাজে সমাজের প্রত্যেক লোকের নিকট অর্থসাহায্য নিতে হবে। মাসিক চাঁদা ক'রে টাকা তোলাই বাঞ্ছনীয়। এই উপায়ে নিজেদের লোককে নিজেদের 'কর' দিতে শেখা হবে। বড় বড় এণ্ডাউমেণ্ট বা জমিদারী পেলে কাজ খানিকটা এগিয়ে যায় বটে, কিন্তু তাতে জাতীয় শক্তির বৃদ্ধি হয় না। হঠাৎ দুটা একটা লোক দান ক'রে স্বার্থত্যাগ দ্বারা উঁচিয়ে গেলে সমস্ত দেশের উপকার হয় না। সমগ্র সমাজের লোককে যথাসাধ্য ত্যাগশিক্ষা করাতে হবে। ইহাতে যেটুকু ফললাভ হয়, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কাঙ্গাল গরীব, মুটে মজুর সকলের ধনেই দেশের ধন, সকলের শক্তির একীকরেণ দেশের সামর্থ্য।

সকল শ্রেণীর লোক হইতে অর্থ সংগ্রহ

তাই চাঁদা সামান্য হ'লেও, অতি পরিবর্ত্তনশীল হলেও, তাতেই যা কর্‌তে পারা যায়, তাই কর্‌তে হবে। কারণ এ চাঁদায় লোকের প্রাণ আছে, সমস্ত দেশের নিষ্ঠা ও ভক্তি আছে। এ উপায়ে যদি প্রত্যেক লোককে আমাদের এই স্বেচ্ছাপ্রদত্ত করের নিয়মে ভুক্ত ক'রে, অন্ততঃ একদিনের আয় দান করাতে পারা যায়, তা হলে কেবল জাতীয় বিদ্যালয়

কেন, যত যা দরকার, সবই 'স্বদেশী'র আয়ত্ত করা যায়। আর জাতীয় ধনভাণ্ডারে যে ধন অর্পিত হবে, তাতে প্রত্যেক দেশবাসীর অধিকার থাক্‌বে, কোন্ বিষয়ে কত খরচ হবে, তা নিজেরাই ঠিক ক'রে দিতে পার্‌বে।

নেতৃত্ব

—ঃ*ঃ—

আধুনিক দেশ-নায়ক

আজকাল যাঁরা নেতা ও নায়ক ব'লে পরিচিত বা নেতৃত্ব পদের আকাঙ্ক্ষী, তাঁরা বাস্তবিকই কোন সমাজ বা সম্প্রদায়ের নেতা হবার উপযুক্ত নন। এখনকার নেতৃত্বের প্রধান দাবী বক্তৃতা কর্‌বার ক্ষমতা। যাঁরা অন্যান্য বিষয়ে দেশের মধ্যে গণ্য মান্য, যারা অন্যান্য কারণে বেশ সুপরিচিত, যাঁদের দুপয়সা আছে, তাঁদের যদি গলা থাকে, তাঁরা তার ব্যবহার ক'রে প্রতিদিনকার সাধারণ একঘেয়ে জীবনের মধ্যে একটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেন মাত্র। এঁদের স্বদেশব্রতে বড় বেশী যায় আসে না। অর্থের অভাব নাই, অতএব এই "স্বদেশী"র দিনে নাম কর্‌বার একটা সুবিধা ছাড়া যায় কেন? এরূপ মনের ভাব অধিকাংশ না হ'ক, অনেক নেতাদেরই বল্লে অত্যুক্তি হয় না।

নেতাদের মধ্যে দশবিশ জন খাঁটি থাক্‌লেও থাক্‌তে পারেন; কিন্তু প্রায়ই মেকী। তাঁদের কাছে বেশী আশা করা যায় না। যাঁরা চিরজীবন ঐশ্বর্য্যের সেবায় দিন কাটিয়েছেন, অথবা ধনসম্পদের আশায় প্রাণে বেঁচে আছেন, তাঁরা যে 'স্বদেশী' কর্‌লে বেশ ভাল দেখায় কেবল এই বুঝে দেশহিতৈষী হবেন, তার আশ্চর্য্য কি? স্বার্থত্যাগ কাকে বলে, বাল্যকাল অবধি অনেকেরই এ শিক্ষা ভাগ্যে জুটে নাই। এ সব লোকের দেশহিতৈষণায় যে কপটতা থাক্‌বে, তা'ত নিশ্চয়ই। এঁদের পক্ষে মন খুলে কথা বলা সম্ভবপর নয়। যখন যে সমাজে থাকেন, তখন তাঁরা সেরূপ কথা বলেন। সুখভোগের যত যা আছে, সমস্তই করা হবে, অথচ স্বার্থত্যাগের শিক্ষক হ'য়ে লোকের কাছে নাম নেওয়াটা চাই।

নেতৃত্বের শিক্ষা—স্বার্থত্যাগ

প্রকৃত নেতা অন্য উপকরণে গঠিত হন। বাল্যকাল হ'তেই তাঁর হৃদয়ে নরসমাজের উচ্চ আদর্শ আধিপত্য স্থাপন করে। তাঁর জীবন আরম্ভ হয়—স্বার্থত্যাগ ক'রে। স্বার্থত্যাগ করতে হলে চিত্তের যত উৎকর্ষের প্রয়োজন, তাঁর শিক্ষা, কাজ কর্ম্ম, চাল চলন, সকল বিষয়েই তার উপাদান লক্ষিত হয়। একটী মহানুভব নরপতির বর্ণনা ক'রতে গিয়ে কবি বলেছেন—

"তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিনা।
তথাহি সর্ব্বে তস্যাসন্ পরার্থৈকফলা গুণাঃ॥"

যিনি সমাজের যথার্থ নেতা, তিনি দেশের আপামর সকল শ্রেণীর সকল লোকের সঙ্গে কর্ম্ম ও ভাবের আদান প্রদানে বর্দ্ধিত হ'য়ে প্রত্যেকের হৃদয়ের রাজা হয়ে বসেন। তিনি কখনও আমাদের আজ কালকার নেতাদের ন্যায় মুখ বিকৃত ক'রে—সাধারণ লোকদের "Mass" ব'লে উল্লেখ ক'রতে পারেন না।

দেশ-নায়কের চরিত্র

নেতার প্রধান লক্ষণ, সমগ্র দেশবাসীর আশা ভরসা, সুখ দুঃখ, সকল বিষয়েরই সহিত পরিচিত থাকা। তিনিই সমগ্র দেশের, সমস্ত সমাজের প্রতিভূস্বরূপ। তাঁর হৃদয়ে সেই সমাজের প্রত্যেক নরনারীর আর্থিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা বিরাজমান। তাঁকে দেখ্‌লেই সমস্ত সমাজের আদর্শ বুঝা যায়।

নেতার সঙ্গে জনসাধারণের নিকট সম্বন্ধ

এই রূপে সমগ্র দেশের প্রতিনিধি হওয়া যায় কেবল তখনই,

যখন ইতর নিকৃষ্ট, উচ্চ নীচ, ছোট বড়, বিদ্বান্ মূর্খ ভেদ না ক'রে—সকলের সঙ্গে সমান ভাবে, সুখ দুঃখের সময়, উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে রাজদ্বারে সহায় হ'য়ে, কোন্ সম্প্রদায়ের কি আশা ও আদর্শ, বুঝ্‌বার জন্য চেষ্টা করা হয়। আজকালকার কর্ত্তাদের মত সুরম্য অট্টালিকায় বাস ক'রে দারিদ্র্য-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদের অবস্থা বুঝ্‌বার জন্য একবারও দুর্ভিক্ষের স্থানে উপস্থিত না হ'য়ে কোন লোক প্রকৃত জন-নায়ক হ'তে পারেন না। কেবল সভা সমিতি বা দুর্ভিক্ষ-ফণ্ড স্থাপন দ্বারা মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে অথবা এমন কি, "বিশেষ দরকার আছে" ব'লে সভা হ'তে চলে গেলে, দেশবাসীর হৃদয়সিংহাসনে বস্‌বার অধিকার জন্মে না।

এরূপ্ নেতাদের স্বভাব ও কাজকর্ম্ম দেখে দেশের লোকের আদর্শ বা চিন্তা কিছুই বুঝা যায় না। এঁদের বাড়ী ঘর সাধারণ দরিদ্রের পর্ণ-কুটীর হ'তে বহু দূরে। এঁদের আমোদ প্রমোদ, আড্ডা পার্টিতে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। নানা উপায়ে দেশের সমাজ হ'তে ইঁহারা নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন। দেশের জনসমুদ্রের মধ্যে এই মহাত্মারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় আল্‌গা ভাবে ভেসে বেড়ান। এঁদের সঙ্গে সমাজের সংযোগ স্থান কোথায়? মনোভাবের আদানপ্রদানের সুযোগ হয় কখন? এঁদের যে কি মতামত,—ইহার কখন কি পরিবর্ত্তন হয়, তা দেশের লোকেরা বুঝ্‌তে পারে না। আর সাধারণ লোকেরাও যে দেশ, সমাজ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু ভাব্‌তে পারে, এই সব নেতারা তা বিশ্বাসই ক'র্‌তে পারেন না। গুরু আর শিষ্যে যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকে, যার জন্য কয়েক জন লোক এক জনকে মেনে চলতে পারে, সে ভাবটিই নাই।

কিন্তু প্রকৃত নেতা তাঁর দলের মধ্যেই পরিপুষ্ট ব'লে তাঁর শিষ্যেরাও জানেন তাঁর কি শক্তি, এবং তিনি নিজেও শিষ্যদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির উপর বিশ্বাস ক'রে কি কাজ তাঁদের মনে লাগ্‌বে, বুঝ্‌তে পারেন। প্রত্যেকে

প্রত্যেককে সম্মান ক’র্‌তে পারে। এই সম্বন্ধে অনেক অসাধ্য সাধন হয়, —কারণ, ইহাতে হৃদয়ের টান আছে, মনের মিল আছে।

প্রকৃত নেতা যে কেবল দেশের সমস্ত শক্তির আধার, সকল প্রকার চিন্তা ও কার্য্য যে এই কেন্দ্র হ’তে বহির্গত হ’য়ে সমাজ-কলেবরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়, আর প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিজ নিজ কর্ম্মে নিয়োজিত ক’রে দেয়, কেবল তাহাই নয়। দেশের নেতা সমাজের দীক্ষাগুরুস্থানীয়,—তাঁর শক্তি সকলের একত্রীভূত শক্তির চেয়ে বেশী। তিনি একদিকে যেমন সমস্ত দেশের প্রতিনিধি, অপর দিকে সমস্ত দেশের আদর্শ, সমগ্র সমাজকে নূতন সাধনায় প্রবৃত্ত কর্‌বার অগ্রণী, নূতন পথে চালিত কর্‌বার ধুরন্ধর।

নেতা জাতীয় সকল কর্ম্মেরই প্রবর্ত্তক

তাঁকে দেখেই দেশের লোকের শিক্ষা হয়। তাঁর উপদেশই তাদের মন্ত্র। তিনি তাদের মর্ত্ত্যস্থিত দেবতা। অনন্ত প্রেমময় ও জ্ঞানময় ভগবানের অংশ তাঁর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ব’লে তাঁর ঐশীশক্তির প্রভাবে তিনি সকলকে অভিভূত করেন। সকলকে অনন্তের দিকে টেনে নিতে তাঁর প্রয়াস। তাই নিজে স্বার্থত্যাগ, পরোপকার ও প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তিনি মূর্ত্তিমান্ ত্যাগ-ধর্ম্মরূপে সংসারে বিরাজ করেন, এবং তাঁর জ্যোতিতে সকলকে আকৃষ্ট ক’রে ত্যাগী, পরোপকারী ও প্রেমিক ক’রে দিয়ে তাদের নরজন্ম সার্থক করেন। তাই তাঁর এত শিষ্য, এত ভক্ত। এরূপ পর-দুঃখে দুঃখী ও পরহিতে রত নেতা অতি বিরল,—সকল সময়ে সকল সমাজে আবির্ভূত হন না। তবে সময়ের উপযুক্ত ছোট খাট নেতা দু চারজন সব সময়েই থাকেন।

আমাদের জাতীয় চরিত্র প্রকৃত নেতার অনুকূল নহে

আমাদের এখন যে সেরূপ মহাপ্রাণ নেতা নাই, তার জন্য খেদ ক'র্‌লে আর কাজ এগুবে না। আমরা যেমন শিষ্য, গুরু আমাদের তেমনি। আমরা সকলে কি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে জলাঞ্জলি দিবার জন্য প্রস্তুত হ'তে পেরেছি? আমাদের এখনও সে উৎকট বৈরাগ্যের ভাব আসে নি। তাই আমাদের মেকী নেতারাও ও সব কথা মুখে আনেন না, অথবা স্বার্থত্যাগের কথা যখন বলেন, তাঁদের মুখে কিরূপ বিকৃত শুনায় যে, মনে হয়, তাঁরা ওটা একটা 'কথার কথা' মাত্র বল্‌ছেন। আমরা যদি দেশের ও ধর্ম্মের জন্য বাস্তবিকই সাময়িক ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছি বা প্রস্তুত হব, এইরূপ ইচ্ছায় চরিত্র গঠন ক'র্‌তে আরম্ভ করি, তবে কে জানে, আমাদের সামান্য সামান্য গ্রামেই হয় ত উপযুক্ত নেতার আবির্ভাব হ'তে পারে!

আমাদের নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপাধি-প্রাপ্ত ব্যক্তি হবেন না, এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। তিনি এই যশটাকে লোভনীয় বস্তু মনে না ক'রে একটা বর্জ্জনীয় জিনিষই মনে ক'র্‌বেন। তিনি অতি নগণ্য স্থানের অতি সামান্য কুটীরেই হয় ত প্রতিপালিত; কিন্তু সমগ্র সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রই তাঁহার শিক্ষালয় হ'বে। তিনি দেশের গাছ-পালার সঙ্গে বেড়ে উঠবেন—নদ-নদীর সঙ্গে এঁকিয়া বেঁকিয়া চলতে থাকবেন, কুলীমজুর তাঁতী জোলা অশিক্ষিত নির্ধনদিগের মধ্যে কাজ-কর্ম্ম করে মানুষ হবেন। দেশের মাটি তাঁহাকে সরস সরল সজীব করে তুলবে। সমাজের অভাব দুঃখ-দারিদ্র্যই তাঁহার একমাত্র শিক্ষা-দাতা থাকবে। যে সম্প্রদায় বা যে সমাজেই থাকুন, ত্যাগের চরম সীমায় তিনি অবস্থিত। যদি ধনীর গৃহেই পালিত হন, তাঁর কাজ আরম্ভ হবে, ধনের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে। বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্ব রাজভাবে

নয়, ফকীর ভাবে। চৈতন্যের মাহাত্ম্য সাংসারিক ভাবে নয়, সন্ন্যাস আশ্রমে।

নেতার জন্য প্রকৃত প্রতীক্ষা

আমাদের স্বদেশসেবকেরা বর্ত্তমান নেতাদের দোষ দেখে যেন ভগ্নোৎসাহ না হন। প্রকৃত নেতার অভাব মনে ক'রে দুঃখিতহৃদয়ে দেশের সেবা হতে বিরত হবেন না। প্রকৃত জন-নায়ককে যথার্থরূপে হৃদয়ের সহিত সম্মান কর্‌বার উপযুক্ত হতে চেষ্টা করুন। তাই নিজেরা এখন হ'তে স্বার্থত্যাগী হ'তে শিখুন। কারণ নিজের স্বার্থত্যাগই নেতার প্রকৃত অর্চ্চনা। তিনি এসে যখন অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব নূতন কাজের জন্য আহ্বান ক'র্‌বেন, তখন যেন পশ্চাৎপদ হ'তে না হয়।

আধুনিক বঙ্গসমাজ ও মালদহ্

সমস্যা

জন্মাবধিই শু'নে আস্‌ছি—"মালদা অতি অনুন্নত জেলা; এখানকার কথাবার্ত্তা, সমাজের প্রথা, আমোদ প্রমোদ, উৎসব মেলা—সব জিনিষই কিছু অসভ্য রকমের। এখানকার লোকেরা ভদ্রতা জানে না।" সকল বিষয়েই গ্রাম্য ভাব আছে, সবই যেন "সেকেলে"। যতই বয়স বাড়্‌তে লাগ্‌লো আমরাও সেই সুরই ধর্‌লাম। 'এ জেলার লোকেরা মূর্খ অসভ্য, সকল বিষয়ে নিশ্চেষ্ট মৃতপ্রায়'—আমরাও এভাব নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ ক'র্‌ছিলাম।

কিন্তু যখন একটু লেখা পড়ার সঙ্গে জ্ঞানের বৃদ্ধি হ'ল—চারিদিকে নজর ফেল্‌তে শিখ্‌লাম—বিদ্যালয়-পাঠ্য ইতিহাস-পুস্তকের ভিতরেই যতটুকু দেশের ও সমাজের খবর পাওয়া যায় সেটুকু পেলাম, আর নিজে-রও ভাব্‌বার শক্তি হ'ল, জগতের ঘটনাবলীকে স্বাধীনভাবে বুঝ্‌তে চোখ খুল্‌লাম, তখন মনে একটা খট্‌কা উপস্থিত হ'ল,—'আচ্ছা, যে দেশে গৌড়ীয় যুগে রাষ্ট্রীয়, শিল্পসম্বন্ধীয়, বাণিজ্য ও ধর্ম্মবিষয়ক এত উন্নতি হয়েছিল,—যার চিহ্ন এখনও সকল কাজের মধ্যে—মালদহের "বাঁহিচ" হ'তে আরম্ভ ক'রে "গম্ভীরা" পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই লক্ষিত হয়,—যেদেশে এখনও বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রেম ও হরিভক্তির মাত্রা কিছু মাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয়নি—যেখানে কারুকার্য্যের নমুনা, যিনি গম্ভীরার সাজসজ্জা দেখেছেন তিনিই বুঝ্‌তে পারেন, সে জায়গাটাকে আর তার সমাজকে পশ্চাৎপদ বলা হয় কেন? এরা পেছিয়ে আছে কোন্ বিষয়ে? সকল বিষয়েই যখন নিজেদের ভাব সম্পূর্ণ বজায় রাখ্‌তে পেরেছে—তখন

এদেশের স্বাধীনতাই ত বেশী। যে 'স্বদেশী সমাজ' প্রতিষ্ঠার জন্য আজ কাল আমরা বড় ব্যস্ত—তার উপকরণ এ জেলাতে প্রচুর পরিমাণেই রয়েছে। তবে কেন এ জেলার লোককে অসভ্য বা গ্রাম্য বলা হয়?

চিত্ত-সম্মোহন

এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। যতদিন আমরা বিদেশীয় সভ্যতার মাপকাঠিতে মেপে আমাদের দেশকে সভ্য, সুসভ্য, অর্দ্ধসভ্য, অসভ্য বা বর্ব্বর বল্‌তাম—যতদিন ভারতসমাজে ইউরোপীয় সমাজের আদর্শ চলিত না করলে সন্তুষ্ট থাক্‌তে পারিনি, যতদিন হ্যাট কোট বুট পরে বিদেশী ভাষায় কথা না বল্‌লে নিজকে একেবারে অপদার্থ বা বোকা মনে করতাম এবং মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ হ'ত, যতদিন পাশ্চাত্য খেতাবে ও পদবীতে অলঙ্কৃত হওয়াই জীবনের মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় ছিল—যতদিন বিদেশ-পূজাই একমাত্র ধর্ম্ম ছিল, এবং বিদেশীয় বাবুয়ানাই সেই পূজার অনুষ্ঠান ছিল—ততদিন যে জায়গায় সমাজ খাঁটি স্বদেশী ভাবে নিজের ভাল মন্দ করে, যাতে খাওয়াদাওয়া, চলাফেরা, কথাবার্ত্তা, সামাজিক কার্য্যকলাপ, বিবাহ শ্রাদ্ধ দান, উৎসব মেলা, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতিতে বিজাতীয় নূতন কিছু প্রবেশ করেনি, যেদেশে লোকেরা চাকরী বা ওকালতী হাজার অর্থ রোজগারের উপায় হলেও দাসত্ব এবং পরাধীনতাই মনে করে—সে দেশের লোককে যে পশ্চাৎপদ বল্‌ব তাতে আর সন্দেহ কি? পাশ্চাত্য সম্মোহন-মন্ত্রই আমাদের এই আত্মবিস্মৃতির মূলে। আমরা এতদিন নিজের গৌরবের স্থানকেই অপমান করতে শিখে এসেছি।

আজকাল আমাদের মন ঘরমুখো হয়েছে। এখন মুরুব্বিয়ানা ক'রে এ জেলাকে কোন বিষয়ে নীচ বলা যায় না। বরং আমাদের সমগ্র

দেশের উন্নতির পক্ষে এই আমাদের মালদহ জেলাই অনেকের চেয়ে অগ্রগামী। মালদহের প্রত্যেক ঘরে ঘরে একথা জানান হউক যে, বিদেশীয় ভাবে আর আমরা কোন জিনিষের দাম নির্দ্ধারণ করি না। যে মালদহ এতদিন অনেক বিষয়ে পশ্চাৎপদ ছিল, সেই মালদহই স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সকলের আদরের বস্তু হ'য়ে পড়েছে। সমাজের নেতারা মালদহের মত স্থানকেই আত্মশক্তির আধার মনে ক'র্‌তে শিখ্‌ছেন। সকল জেলাকেই মালদহের মত স্বাধীন-জীবিকাপ্রিয় তৈয়ারী করা আবশ্যক। মালদহ এখন আর পেছিয়ে নেই। মালদহই অনেকের নেতা ও শিক্ষক—জাতীয়-জীবনপ্রতিষ্ঠার প্রধান অবলম্বন।

আত্মশক্তির অনুশীলন

একথা আমাদের সকলকে খুব ভাল ক'রে মনে রাখ্‌তে হবে। মালদহের বিশেষত্ব কোথায়, কি কি সুবিধা এখানে আছে, এখানে কত প্রকারের কত শক্তি আছে, কোন্ গুলিকে কি উপায়ে ব্যবহার কর্‌লে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল পেতে পারি, এখানকার হিন্দু মুসলমানেরা কোন্ নৈপুণ্য, কারুকার্য্য, মানসিক চিন্তায় বিশেষ পারদর্শী, তাঁরা কোন্ কোন্ বিষয়ে স্বাধীনভাবে "মস্তিষ্কচালনা ক'রে থাকেন—সকল বিষয়ই অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত খুঁজে বের করা আমাদের নেতাদের প্রধান কর্ত্তব্য। জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকদেরও সেই বিষয়ে চিন্তা করা এক প্রধান শিক্ষার বিষয়। এই সম্বন্ধে সকলেরই সমবেত চেষ্টা দরকার। মালদহ জেলায় যত গ্রাম আছে, প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক বিচক্ষণ ব্যক্তিরই আত্মশক্তি উপলব্ধি ক'রে, কিসে তা'র সদ্ব্যবহার হয় তার চেষ্টা ক'র্‌তে হবে।

নূতন কর্ত্তব্য

যে শক্তির যথোচিত সঞ্চালন ও সমাদরের অভাবে এ জেলা একে-

বারে দুর্ব্বল ব'লে বোধ হচ্ছিল—স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগে তাকে জাগা'লে অনেক কাজ হবে। রূপসনাতনের রাজনৈতিক পারদর্শিতা ও ধর্ম্মভাব এখনও তিরোহিত হয় নাই। জীবগোস্বামীর শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য এখনও হয়তো অতি সামান্য গ্রামের সামান্য কুটীরে যত্নাভাবে মলিন হ'য়ে আছে। ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস এবং জয়দেবের রচনাকৌশল, বাক্যবিন্যাস, ভাবুকতা এখনও গম্ভীরার গীতকর্ত্তাদের মধ্যে অনেক সময়ে লক্ষিত হয়। বিষহরির গানেও চিন্তাশক্তির এবং ধর্ম্মপ্রাণতার আভাস অনেক আছে। সাহাপুরের কবি হরিমোহন "ওহে হর, এই ভবেতে তাঁতবুনা কাজ খুব ভালই জান"-শীর্ষক গানে রামপ্রসাদের ন্যায় সাধকভাব, ভক্তি এবং চিন্তা-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এই সকল প্রকার চিন্তাশক্তিকে একত্র কর্‌বার জন্য সকল গম্ভীরাওয়ালাদের মধ্যে একতার ভাব আন্‌তে হবে। তাঁদের বুঝাতে হবে যে, গম্ভীরায় কেবল এক এক পাড়ায় তিন দিন আমোদ প্রমোদ হয় তা নয়, এখানে একটা বাঙ্গালী জাতির কাজ হয়। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য, বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি, বাঙ্গালার সভ্যতা, বাঙ্গালীর আদর্শ প্রস্তুত কর্‌বার একটা প্রধান উপায় মালদহের গম্ভীরা।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে মালদহের দান

আমাদের জাতীয় চরিত্র

অদূরদর্শিতা ও অসহিষ্ণুতা

আমরা হাতে হাতে কাজের ফল না পেলে অস্থির হ'য়ে পড়ি। বীজ বপন কর্‌বার পরক্ষণ হ'তেই অঙ্কুরের আশায় ব'সে থাকি। কোন একটা কাজ আরম্ভ ক'রে, তাকে সুচারুরূপে সম্পন্ন ক'র্‌তে গেলে যত শক্তি, সময় ও লোকের প্রয়োজন, তার সমুচিত আয়োজন না ক'রেই "হ'ল না, হ'লনা," 'The movement is a huge failure' ব'লে সকল আশা ভরসা একেবারে ছেড়ে দিই।

এ রকম ছেলেমানুষী আমাদের প্রায় সকল কাজেই দেখা যায়।

(১) শিক্ষার ব্যবস্থায়

ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রেই তার ঘাড়ে বোঝা বোঝা বই চাপিয়ে দেওয়া হয়, পাছে একটু দেরী হ'লে বিদ্যাদিগ্‌গজ হবার আশা কিছু ক্ষীণ হয়ে যায়।

আমাদের গ্রন্থকারেরাও তাড়াতাড়ি তাঁদের অবার্থলেথনী প্রসূত রচনাগুলি লেখা শেষ হওয়ামাত্রই ছাপিয়ে ফেলেন ও বিদ্বৎসমাজের প্রশংসার আশায় দিন যাপন করেন। কিছু দিন লেখাগুলি ঘরে ফেলে রাখ্‌লে অথবা নিজের মনের ভাবটাকে একটু পাক্‌তে দিলেই হয়ত নিজের অসম্পূর্ণতা নিজেই বুঝ্‌তে পেরে প্রতীকার কর্‌তে পারেন। কিন্তু সে টুকু বিলম্ব সহ্য হয়না। ভয়, পাছে আর কেহ এ কয় দিনের মধ্যে তাঁকে তাঁর মৌলিকতার যশ হ'তে বঞ্চিত ক'রে ফেলেন!

ব্যবসাতেও তাই। একটা কারবার খুলেই অহরহ কেবল লাভের

(২) ব্যবসায়ে

খাতা নাড়া চাড়া করা হয়। কোন্ কোন্ জিনিসের কাট্‌তি বেশী, কি উপায়ে নূতন একটা জিনিসের

চলন বাড়ান যায়, লোককে যথেষ্ট জানান হয়েছে কিনা, কোন্ ফিকিরে বিজ্ঞাপন দিলে লোকের মন আকৃষ্ট করা যায়, এ সব ভাল রকম বুঝে কাজ কর্ত্তে গেলে যত সময়ের দরকার, তত অপেক্ষা করার শক্তি ও সহিষ্ণুতা থাকেনা। 'এ ব্যবসায় লাভ নাই মশায়—আর একটা কিছু ধর্‌তে হবে' অনেক মহাজনের মুখেই এই কথা।

এমন কি, শরীরের যদি অসুখ হয়, তখনও একবার কবিরাজি, আর একবার ডাক্তারি— বা এক সঙ্গেই বিভিন্ন মতের চিকিৎসা আরম্ভ করা হয়। আশু প্রতীকারের জন্য চিত্ত চঞ্চল হ'য়ে পড়ে। কোন উপায়ে জোড়া তালি দিয়ে শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা ক'রে থাকি। ব্যারামের মূল কি, গলদটা কোথায়, কোন্ ঔষধ প্রয়োগ ক'র্‌লে কেবল সাময়িক উপকার না হ'য়ে ভবিষ্যতের জন্যও ভাব্‌তে হবেনা এসব কথা ভেবে কাজ কর্‌তে গেলে বেশী সময় যায়। তাই "এখনকার মত ত ঠিক থাক, তার পর দেখা যাবে"—এই ব'লে শরীরটাকে চির কালের মত ব্যাধিমন্দির ক'রে তোলা হয়।

(৩) চিকিৎসায়

সবুরে যে মেওয়া ফলে, এ কথা মনেই থাকেনা। এখন যে সুবিধাটা পেয়েছি, তা আর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। ভবিষ্যতে কি হবে তা দেখবার প্রবৃত্তিই হয়না। বর্ত্তমান লাভের মোহে অন্ধ হ'য়ে থাকি। লেখা পড়া শেষ ক'রে স্কুল হ'তে বেরিয়েই হাতে যে চাক্‌রীটা পাই, অমনি তা নিয়ে ফেলি। এই উপায়ে যে কত লোকের ও কত পরিবারের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা নষ্ট হ'য়ে গেছে, তার অন্ত নাই। স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন কর্‌বার উপায় আছে কিনা, অথবা নিজের যতটুকু শক্তি আছে তার প্রয়োগ করেই নূতন এক পথ আবিষ্কার কর্‌তে পারা যায় কিনা,—এসব না ভেবে কাজ করাতে আমাদের দেশ যে একে

(৪) অন্ন-সংস্থান ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহে

বারে দুটা চার্‌টা বাঁধা পথের গোলাম হয়ে পড়েছে ও সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হয়েছে, সে কথা সকলেই আজ কাল মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্‌ছেন।

আমাদের নিজের বর্ত্তমান সুবিধা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চাকরী আর ওকালতীর জন্য লালায়িত হই। কিন্তু ইহাতে যে স্বপরিবারের সঙ্গে পাড়ার ও দেশের অন্যান্য লোকেদের ভবিষ্যৎ আশা একেবারে নির্ম্মূল হ'য়ে যায়, সে কথা কজন ভাবে? দু মুঠো ভাতের জন্য সমস্ত দেশবাসাকে যে পরের উপর নির্ভর ক'রে থাক্‌তে হচ্ছে, তা কেবল এই অদূরদর্শীদের কার্য্যের ফলে। সকল লোকইত বড় বড় চাকরী বা ওকালতীর উপযুক্ত নয়। তাই যে দু চারজনা উপযুক্ত আছেন, তাঁদের কর্ত্তব্য যাতে সকলেরই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের প্রকৃত উপকার হয় তার চেষ্টা করা। কিন্তু তাঁরাই এত লোভান্ধ, যে, কেবল চোখের সামনে যেটা পাওয়া যাচ্ছে, তাই পাবার জন্য মারামারি কাটাকাটি ক'রে থাকেন।

ফলতঃ যে সকল কাজ সময়সাপেক্ষ, যাতে বেশী দিন লেগে থাক্‌তে হয়, তা আমরা ক'রে উঠতে পারি না। কেবল যাতে কিছুদিনের জন্য ঠেকা দিয়ে রাখা যায়, তারই চেষ্টা ক'রে থাকি। ফললাভ কিছু কম হ'লেই হতাশ হয়ে পড়ি।

স্বাবলম্বন প্রবৃত্তির অভাব এবং পরনির্ভরতা

এ রকম অধীর বলেই আমরা সর্ব্বদা কেবল পরের সাহায্য চাই। নিজের শক্তির অভাব বা নিজের কিছু নাই ব'লে যে আমাদের পর-নির্ভরতা, তা নয়। আমাদের কি আছে না আছে, আমাদের সামর্থ্য কতটুকু, কোন্ কোন্ বিষয়ে আমরা উপযুক্ত, তা না দেখেই আমরা পরের কাছে নিজেকে বিকাইয়া দিই। এ একটা মস্ত নৈতিক দোষ,

স্বভাবের অসম্পূর্ণতা! আমরা নিজেকেই নিজে চিনি না। চিন্‌বার উপযুক্ত চেষ্টাও করি না।

নিজের শক্তির পরিচয় যে না পেয়েছে, যে নিজের উপর বিশ্বাস কর্‌তে পারে না, সে ত কষ্ট বিপদ অতিরঞ্জিত কর্‌বেই। সে সামান্য বাধা বিপত্তিতেই চিত্তের ধীরতা হারায়। যার সাহস নাই, যে কাপুরুষ, সে রাস্তায় হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে বাঘের ভয় করে—শুক্‌না ড্যাঙায়ই আছাড় খায়। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—"he meets a lion in the way". নিজে মনে মনে অনেক অসুবিধা তৈয়ার ক'রে স্বকপোল-কল্পিত এক কঠিন সমস্যায় প'ড়ে আছে।

"আত্মানং বিদ্ধি" এ নিয়মটা কেবল আধ্যাত্মিক জগতের নয়, প্রতিদিনকার সামান্য কাজেও খাটে। যে কোন কাজের পূর্ব্বাপর সকল অবস্থা ভেবে কর্ত্তব্য নিদ্ধারণ কর্‌তে পারে না সে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে চেষ্টা না ক'রে কেবল পরের কাঁধে চ'ড়ে বড় হ'তে চায়। আমরাও তাই দূরভবিষ্যতে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌তে পারি না ব'লে মাঝে মাঝে এমন কাজ ক'রে ফেলি, যার জন্য পরে অনুতাপ ক'র্‌তে হয় ও যার প্রতীকারের চেষ্টায় সমস্ত ভবিষ্যৎ ব্যয় ক'র্‌তে হয়। তাই আমাদের জীবনের কাজের মধ্যে অসংখ্য বিরোধ। এক সময় ও এক বিষয়ের কাজ ও মতের সহিত অন্য সময়ের কাজ ও মতের এত পার্থক্য ও গোল-মাল। দুই কাজই যে একই লোকের, তা বুঝে উঠা কঠিন। অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে কাজ ক'র্‌তে গেলে অত শীগ্‌গির, যখন তখন পরের সাহায্য নিতে বা এখনকার মত একটা খুঁটো দিয়ে খাড়া ক'রে রাখ্‌তে ইচ্ছা হয় না।

আমাদের দেশের প্রায় লোকেই ব'লে থাকেন যে বড়লোক জমীদার ও রাজাদের সাহায্য না পেলে কোন কাজই আমাদের সফল হ'তে পারে না। ধনীদের কাছে বড় বড় "এণ্ডাউমেণ্ট" পেলে কাজে হাত দেওয়া

উচিত ;—আর না পেলে যে লোকেরা হতাশ হ'য়ে প'ড়ছে, তা ঐ নিজেদের উপর অবিশ্বাসের ফল। "গরিবদের মাসিক চাঁদায় আর কি হ'তে পারে, চাঁদা অস্থায়ী—এর উপর নির্ভর করা যায় না," এরূপ প্রায় সকল জেলার সকলের মুখেই শুনা যায়। আর মনে এরূপ দুর্ব্বলতার ভাব আছে ব'লেই যেখানে সেখানে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

যত জায়গায় জাতীয় বিদ্যালয় হ'য়েছে, সকলগুলিই কলিকাতার পরিষদের যে ক'লাখ টাকার জমিদারী আছে, কেবল তারি দিকে তাকিয়ে রয়েছে। প্রত্যেক জেলার জন সাধারণের শক্তি যথেষ্ট সঞ্চালন না ক'রেই, ঐ গচ্ছিত ধনটার উপর দাবী কর্‌বার চেষ্টা সকলেরই। নিজেরা আত্মনির্ভর হব, নিজের জেলাকে স্বাধীন ক'র্‌ব, পর-মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকব না এটা অনেকেই ভাবেন না। আর কি উপায়ে পারা যায় তার সমুচিত চেষ্টা করাও হয় না। দুচার দশজন উকীল ও মোক্তারের কাছে টাকা তুলেই কল্‌কাতায় অর্থের জন্য আবেদন!

ব্যাপকভাবে আলোচনাশক্তির অভাব

এই প্রকার আমাদের অনেক দোষ। কোন একটা বিষয়কে ব্যাপক-ভাবে বুঝ্‌তে পারি না। এক কাজের সঙ্গে অপর এক কাজের কি সম্বন্ধ, একটা কর্‌তে গেলে অপরটার বাধা হবে কি সাহায্য হবে, এ কাজটা না হ'লে ওকাজটা সফল হ'তে পারে কি না, বিষয়ের এরূপ ক্রমান্বয় ও পারম্পর্য্য বুঝে কাজ ক'র্‌তে পারি না।

(১) গ্রাম ও নগরের সম্বন্ধ বিষয়ে মত

তাই অনেকে বলেন, আগে গ্রাম্য জীবনের উন্নতি কর। গ্রামেই ভারতবাসীর প্রাণ! গ্রামগুলো সকল বিষয়ে অবনত হয়ে গেছে ব'লে দেশের দুর্দ্দশা। আগে গ্রামের উৎকর্ষ সাধন না ক'র্‌লে কিছুই হবে না, আর সব বৃথা।

কেহ কেহ বলেন, 'সমাজের সংস্কার আগে না ক'র্‌লে রাজনৈতিক আন্দোলনে কোন ফলই আশাকরা যায় না। সমাজ এখন উচ্ছৃঙ্খল, কেহ কাহাকে মান্‌তে চায় না। যার যা ইচ্ছা তাই করে। অসংখ্য ব্যভিচার ও অত্যাচার চল্‌ছে। ধর্ম্ম ও সমাজের কাজে কেবল অর্থের আড়ম্বর। স্বভাবের ও কুলের আভিজাত্য ছেড়ে মানুষ ধনের আভিজাত্যকেই সম্মান যতদিন কর্‌বে, ততদিন আমাদের কোন বিষয়েই উন্নতি হবে না। আজকাল বিবাহ আর ধর্ম্মের বন্ধন নয়, একটা দোকান-দারী জিনিষ হয়ে পড়েছে, এতে একটা বেচা কেনার ভাব এসেছে। যে দেশের লোকেরা বিয়েতে টাকা নেওয়া বন্ধ ক'র্‌তে পারে না, তারা আবার রাষ্ট্রীয় আর আর্থিক স্বাধীনতা চায়!"

(২) জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সামাজিক আন্দোলনের সম্বন্ধ বিষয়ে মত

অনেকের মত, "ভাতের যোগাড় না ক'রে দিতে পার্‌লে স্বদেশী টিক্‌ল না। দুর্ভিক্ষ নিবারণ আগে কর, তাহ'লে সবই সোজা হ'য়ে পড়বে। আগে অন্নের ব্যবস্থা কর, তারপর দেশ-হিতৈষিতা।"

(৩) জাতীয় উন্নতির সঙ্গে বৈষয়িক আন্দোলনের সম্বন্ধবিষয়ে মত

কেহ কেহ বলেন, "স্বদেশী আন্দোলনটা কেবল কাপড় চোপড়, নুন্ চিনিতেই থাক। দেশের শিল্প ও ব্যবসায় উৎসাহিত কর, তা হলেই ত সব হ'ল, অন্য কোন বিষয়ে চেষ্টা করা অন্যায়।"

"তাই কেবল দেশে যাতে কাপড় চোপড় প্রস্তুত হয়—আর যাতে দুবেলা লোক খেয়ে বাঁচ্‌তে পারে, এরূপ কৃষিশিল্প ইত্যাদি অন্ন-সংস্থানের উপায় ক'রে দিলেই দেশের যথেষ্ট উপকার করা হ'ল। এর বেশী আর কিছু সম্ভবপর নয়, চেষ্টা করার দরকারও নাই।"

"আমাদের হুজুগ দুদশ দিনের জন্য। কিছুকাল সময় নষ্ট ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াই। তারপর সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যায় ও পরে পস্তাতে হয়। কাহারই কোন কাজে লেগে

(৪) আত্ম-গ্লানি

থাক্‌বার ভাব নাই। 'উঠে পড়ে লেগে কাজটা করে ফেল্‌বই' একথা কেহই ভাবে না। কিছুদিন আগে এ দেশে অসংখ্য ফাণ্ড হয়েছিল, এখন একটারও অস্তিত্ব নাই, সব কটা ফেল মেরেছে।"

কেহ কেহ বলেন, "অভাব না বাড়ালে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হবে না। লোকেরা যত গরীব ভাবে থাক্‌তে যাবে ততই দেশের ক্ষতি। অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ততই আমরা হার্‌ব। সেজন্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় সম্বন্ধে ধারণা উঁচু করা দরকার। এখন দারিদ্র্যের প্রতিজ্ঞা নেওয়া দেশের পক্ষে অনিষ্টকর।"

(৫) অভাব বৃদ্ধির প্রবৃত্তি

অনেকের মত—স্বদেশসেবা কেবল বড়লোকদেরই পোষায়, গরীবদের নয়। সাধারণ লোকেরা অর্থাভাবে জর্জ্জরিত, তারা দেশের কাজ ক'র্‌বে, এটা আশা করা উচিত নয়। আর যারা একবার বিয়ে ক'রে ফেলেছে, তাদের স্বদেশের জন্য খাটা হতেই পারে না। তাদের উপর কত দায়িত্ব! পরিবার পালন ক'রে দেশের কাজ খুব কম লোকেই ক'র্‌তে পারে, অতএব বিয়ে ক'র্‌লে দেশহিতৈষী আর হওয়া যায় না। কেবল অবিবাহিত যারা, তারাই স্বার্থত্যাগ কর্‌তে উপযুক্ত, তারাই যা করে করুক। আর বিয়ে কর্‌লে পর, যাতে বড় চাকরী হয় বা অন্য কোন উপায়ে ধনাগমের সুবিধা করা যায়, তার চেষ্টা করা উচিত। তার পর দানধর্ম্ম করা, অতিথিশালা, ধর্ম্মশালা, আত্মীয়স্বজনপালন, দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন, এ সব ত কেহ বারণ করছে না। এ সব কর্‌লেই হ'ল। এটা কি দেশের কাজ নয়? বরং চাকরী বা ওকালতি ছেড়ে গরীব হয়ে থেকে দেশের যে উপকার করা যায়, তার চেয়ে বেশী উপকারই করা যেতে পারে।"

(৬) দেশসেবায় সংসারী ও নির্দ্ধনদিগের অ-কর্ত্তব্য

অনেকে আমাদের নেতাদের গাল দিয়ে বলেন যে যাঁরা

আমাদের নেতা, তাঁরা নিজেদের স্বার্থ একটুও ছাড়্‌তে পারেন না। সকলেই নিজের স্বার্থ বজায় রেখে পরোপদেশে পাণ্ডিত্য ফলান। এত জাতীয় বিদ্যালয় হয়েছে, কিন্তু জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সব সভ্যদের ছেলেরা পড়ে সরকারি স্কুল কলেজে। নিজেরা আদালতে বড় বড় পদের সুবিধা পেলে ছাড়্‌বেন না, অথচ দেশবাসীকে হুকুম কর্‌ছেন, স্বার্থত্যাগ কর, ও সব বিদ্যালয়ে কিছু শিক্ষা হয় না, আমরা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী নূতন শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি—এখানে এস। একটু যদি কষ্ট স্বীকার ক'র্‌তে হয়, মনকে এই বলে শান্ত করো—The blood of the martyrs is the seed of the church"

(৭) নেতৃবর্গের দোষ প্রদর্শন

"তাঁরা গবর্ণ্মেণ্টের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে পরে দেশভক্ত হয়ে পড়েছেন। যখন দেখলেন যে বড় চাক্‌রি পেলেন না অথবা ব্যারিষ্টারি বা ওকালতি ক'রে দুপয়সা জুটল না, তখন স্বদেশী প্রচার আরম্ভ ক'র্‌লেন। অভিমান ক'রে বা পরের উপর চটে দেশসেবার মধ্যে যথেষ্ট কপটতা আছে।"

যারা কিছু অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত তারা বুঝে যে "কতকগুলি ইংরাজি-জানা লোক নিজেদের স্বার্থলাভের জন্য একটা গোলযোগ বাধিয়ে দেশশুদ্ধ ডুবাবার মতলবে আছে। যারা চাকরী বা ওকালতি ক'রে খায়, তারা, তাদের সে পথে কিছু বাধা হয়েছে দেখে, "সরকারি স্কুলে পড়ো না, মোকদ্দমা ঘরে মিটিয়ে লও"—ব'লে দেশের মস্ত উপকারী হয়ে পড়েছে।

কেহ কেহ পরামর্শ দিয়ে থাকেন, আগে নিজে বড় লোক হ'য়ে নেও, টাকা পয়সা রোজগার ক'রে নামজাদা লোক হও। লোকে মানুক, 'influence' হ'ক, তার পরে দেশ সম্বন্ধে সমাজ সম্বন্ধে যা বল্‌বে, অবনত মস্তকে লোকে তাই শুন্‌বে নিঃস্ব ফকীর হ'লে তার কথায় কেহ কাণ দেয় না।

(৮) কীর্ত্তিলাভের পর দেশসেবায় আগ্রহ

অনেকে আমাদের নানারকম ধর্ম্ম, সম্প্রদায় ও ভাষা দেখে, এঁদের ঐক্য কোনমতে সাধিত হ'তে পারে না বুঝে নিস্তেজ হ'য়ে বসে থাকেন এবং অন্য লোককেও বাধা দেন। এত দলাদলি,—হিন্দু মুসলমানের বিরোধ। হিন্দুর মধ্যেই এত গোলমাল। উড়িয়ারা ও মৈথিলীরা ভাবেন, বাঙ্গালীদের আর তাঁদের একই উদ্দেশ্য নয়। অতএব এঁদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করায় নিজেদের ক্ষতি। আশামীরা এবং বিহারীরাও বাঙ্গালীদের সঙ্গে মিল্‌তে চান্ না। বলেন, "সকলের স্বার্থ এক নয়। এত গৃহবিবাদের মধ্যে আর কি আশা করা যায়?"

(৯) অনৈক্যে ভয়

যাঁরা কিছু ধার্ম্মিক, তাঁরা বলেন—"পুরাণে আমাদের এ দুর্দ্দশার কথা বলা আছে! আমাদের সমাজে, ধর্ম্মে ও পারিবারিক জীবনে কলিযুগে যে এত অবনতি হবে, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক ভবিষ্যৎবাণী আছে। এ সব নিবারণ করা মানুষের সাধ্য নয়। পুরুষকারে কিছুই হবে না। ভগবানের ইচ্ছা হ'লে আপনা হ'তেই সব দুঃখ দূর হ'য়ে যাবে!"

(১০) জাতীয় অবনতি শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট

কয়েকটি মতের আলোচনা

এরূপ নানারকমের নানা কথা আমাদের লোকেরা বলে থাকেন। কেহ নিজের স্বার্থ ছাড়্‌তে অক্ষম বা অনিচ্ছুক, তাই অপরকে কোন এক আপত্তি উত্থাপন ক'রে বিদায় করেন! অনেকে কেবল একদিক্ বুঝে দুএকটা আংশিক সত্য কথা বলেন বটে, কিন্তু একগুঁয়ে হয়ে অপরের অন্যবিধ কাজের বাধা জন্মাতেও পশ্চাৎপদ হন না। কেহ কেহ "এদেশের কোন দিন কিছু ছিল না, এ দেশের গৌরব কর্‌বার কিছুই নাই, সবই পরের কাছে শিখ্‌তে হবে"—বুঝে 'স্বদেশী' প্রত্যেক কার্য্য ও চিন্তাকে খ্যাপামী মনে করেন।

দেশের ভবিষ্যৎ ধনসম্পদের বৃদ্ধির জন্যই যে বর্ত্তমানে অভাব কমান অত্যন্ত আবশ্যক, তা অনেকে বুঝ্‌তে পারেন না। অভাব কমালে যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, ভোগ্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক যত কম হ'তে থাকে, ততই আত্মার উৎকর্ষ সাধনের পথ যে পরিষ্কার হয়ে আসে,—এ কথা অনেকে বুঝ্‌লেও বুঝ্‌তে পারেন; কিন্তু এই অভাব কমালেই দেশের আর্থিক অবস্থারও যে উন্নতি হ'তে পারে, এটাও বুঝা আবশ্যক।

সমাজের শ্রীবৃদ্ধিসাধন কর্‌তে হ'লে মূলধনের প্রয়োজন। তাহা কেবল সঞ্চিত ধন হ'তেই সংগৃহীত হয়। সে জন্য প্রত্যেকেই সঞ্চয়শীল হয়ে নানাবিধ কাজে সেই ধন খাটাতে পার্‌লেই দেশের বৈষয়িক উন্নতির সহায়তা করা হবে। আর দেশকে যদি শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধে আত্মনির্ভর করা উদ্দেশ্য থাকে, তাহ'লে আজকাল কিছু দিন অন্ততঃ আমাদের যত কম জিনিষের দরকার হয়, ততই ভাল।

অভাব-দমনের উপকারিতা

স্বদেশী আন্দোলনে সফলতা লাভ কর্‌বার এক উপায় দেশের অভাব দেশেই মোচন করা, আর এক উপায় অভাব কিছু কমান। সকল অভাব মোচন করবার উপযুক্ত মূলধন চাই। তাই যাতে দেশীয় মূলধনের ভাণ্ডার বৃদ্ধি হয়, তার চেষ্টা করা দরকার। এ কয়দিনে স্বদেশী আন্দোলনের যে সফলতা হয়েছে, তার দ্বারা এই বুঝা যায়, আগে যে ধনের অপব্যয় হচ্ছিল, বা যা কেবল সঞ্চিত হয়েছিল, তারই যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে। মোটের উপর দেশের ব্যবসায়-প্রযুক্ত ধনভাণ্ডার বর্দ্ধিত হয়েছে।

তাই এখনকার প্রধান কর্ত্তব্য সকল লোকেরই যতদূর সম্ভব, অতি সামান্য ধনও সঞ্চিত ক'রে রাখা, এবং ধন সঞ্চয়ের সুবিধা ক'রে দেওয়া। দেশে জীবন বীমা, যৌথ কারবার, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বিবিধ ব্যবসায়-কেন্দ্রের দরকার হয়ে পড়েছে। তাতে গ্রামের কৃষক ও সহরের মজুর এবং যাদের অল্প রোজগার তারা—যথাসম্ভব জমা রেখে নিশ্চিন্তভাবে কাল কাটাতে

পারে। গরীবদের একত্রীকৃত টাকাতে দেশের অনেক বড় বড় কাজ চালান যায়।

যাঁরা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে চা'ন, তাঁদের ধর্ম্ম কেবল মুখেই, আর ধর্ম্মের সারমর্ম্ম তাঁরা খুব কমই বুঝেন। যদি দেশের এ দুর্গতি কোন দিন যায়ই, তাত হঠাৎ একদিনে ভেল্কিবাজিতে হ'বে না। প্রাকৃতিক নিয়মে, এই সকল লোকের ভিতর দিয়েই হবে। যে মহাপুরুষ এসে নূতন অবস্থা সৃষ্টি কর্‌বেন, তিনি ত আর গাছ পাথরকে উপদেশ দেবেন না! তাই নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাক্‌লে উন্নতির কাল ক্রমশই পেছিয়ে যাবে।

পুরুষকার অশাস্ত্রীয় নহে

জাতীয় চরিত্রের বিবিধ অসম্পূর্ণতার কারণ

আমাদের এত দুর্ব্বলতার, দোষের অনেক কারণ আছে। যারা কাজ কোন দিনই করেনি, তারা একটা কাজ কর্‌তে কতদিন খাটতে হয়, কত পরিশ্রম কর্‌তে হয়, কতবার বিফলমনোরথ হ'তে হয়, সে বিষয় জানে না। সমগ্র দেশের উন্নতি কল্পে যে আন্দোলন বা যে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে, তাতে প্রথমেই সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে মন প্রাণ সমর্পণ করা অসম্ভব। প্রথমাবস্থায় অনেকে আন্তরিকতার সহিত কাজ আরম্ভ করে না। দুজন চারজন ক'রে ক্রমশঃ লোকে স্বার্থত্যাগ কর্‌তে শেখে। একদিনে উতলা হ'লে চলে না।

কর্ম্মে অনভ্যাস

আর আমরা যে এত অসম্ভব আশ্চর্য্য রকমের কথা বলি, তার কারণ আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা কি কি কারণে এ রূপ ধারণ ক'রেছে, তা ভাল ক'রে না বুঝা। দেড়শ বৎসরে আমাদের দেশের ধর্ম্মে, সমাজে, শিল্পে, সাহিত্যে, পারিবারিক জীবনে যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তার

(২) ইতিহাস-বিজ্ঞানে অনধিকার

আদি কারণ যে ইউরোপীয় সভ্যতা, তা আমরা গভীরভাবে তত ভাল রকম বুঝি না।

যে কারণে আমরা স্বদেশের শিল্প কারুকার্য্য বর্জ্জন ক'রে বিদেশীয় পণ্যে মনোনিবেশ ক'রেছি, সেই কারণেই আমাদের সাহিত্যের প্রতি পর্য্যায়ে বিদেশীয় ভাব প্রবেশ ক'রেছে। আমরা কেবল ল্যাঙ্কাশীয়ারের তাঁতীদের দাস নই, অক্‌স্‌ফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি স্থানের সাহিত্যসেবী এবং লেখকেরাও লেখা পড়ার নিয়মকানুন, বিদ্যাদানের প্রণালী ইত্যাদি সকল বিষয়েই আমাদের প্রভু। সেই কারণেই আমাদের ধর্ম্মের উপর আস্থা ও ভক্তি কমে গিয়ে আমাদের চিত্তে একটু বিষয়ে আসক্তি ও সংশয়বাদের ভাব ঢুকেছে। আবার সেই জন্তেই বিলাসিতা, সুখপ্রিয়তা, ভোগাকাঙ্ক্ষা। গ্রামের শান্তিকুটীর পরিত্যাগ ক'রে গার্হস্থ্যের সুন্দর নিয়মগুলি যে ক্রমশঃ শিথিল করে ফেল্‌ছি, তাও এই নূতন অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল। ছেলে একটা পাশ বেশী কর্‌ছে, আর অমনি বিয়ের বাজারে যে দর বাড়ল, তা যখন 'পাশের' মর্য্যাদা ছিল না তখন কখনই সম্ভবপর নয়। শিক্ষা দীক্ষা, কাজ কর্ম্ম, সকল বিষয়েই সেই এক পাশ্চাত্য প্রভাব।

ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের অন্তরতম স্থানকে অধিকার ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রেছে। আমরা সকল বিষয়েই ইউরোপকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করে এসেছি। তার ফলেই আমাদের দেশে এক নবযুগ আনয়ন করেছে। তাতে আজকাল আমাদের এক নবজীবনের সূচনা দেখা যাচ্ছে বটে

(৩) ইউরোপের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধবিষয়ে অসম্পূর্ণ ধারণা

কিন্তু পরানুকরণের প্রথম অবস্থায় ইউরোপের বাহ্য চাকচিক্যেই মজে ছিলাম। ইহার মূলমন্ত্র কোথায় খুঁজে বের কর্‌তে পারা যায় নি। তাই আমাদের সঙ্গে এই সভ্যতার সংঘর্ষণে একটা বিপর্য্যয় ঘটেছে। ওদের ভাল জিনিসগুলো আমরা নিজস্ব করতে পারি নি—অথচ

আমাদের সনাতন জাতীয় সম্পদ্‌গুলি উড়িয়ে দিবার ব্যবস্থা ক'রে দেউলে হয়ে পড়েছি। আজকালকার অবস্থাটা ভালই হ'ক আর মন্দই হ'ক, একটা মস্ত পরিবর্ত্তন যে ঘটেছে, আর এ পরিবর্ত্তন সকল বিষয়কেই আক্রমণ ক'রেছে, এটা বুঝে কাজে নাব্‌তে হবে। কিন্তু এই সর্ব্বতোমুখী প্রভাবের কথা আমরা ভাল ক'রে বুঝি না বলে, নানা রকমের পরস্পরবিরোধী কথা ব'লে থাকি।

(৪) স্বাধীনচিন্তা ও স্বায়ত্তকর্ম্মের অভাব

সকল দোষের প্রধান কারণ আত্মবোধ ও স্বাধীন চিন্তার অভাব। আমরা এতদিন যে ইউরোপকে ভাল ক'রে বুঝিনি এবং ইউরোপের সকল জিনিষই অতি উপাদেয় ব'লে গ্রহণ কর্‌বার অভিপ্রায়ে নিজেদের মহা অতীতকে, রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারকে ভুল্‌তে চেষ্টা করেছি, তার কারণ আমরা ইউরোপকে স্বাধীন ভাবে আমাদের নিজের মত ক'রে বুঝবার অবসর পাইনি। অন্যে যে ভাবে বুঝিয়েছে সেই ভাবেই বুঝেছি। গোলামের মত, ভিখারীর মত, মূর্খের মত আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার আগাগোড়া অনুকরণ করেছি।

পাশ্চাত্য শাসনে আমাদের যদি ক্ষতি ক'রে থাকে, তবে কেবল এই ভাবে যে, ইহা আমাদের প্রকৃতির উপযোগী ক'রে ইউরোপীয় সভ্যতার সুফল ও সদনুষ্ঠান গুলি গ্রহণ ক'র্‌তে অবসর দেয়নি। যদি পদার্থবিজ্ঞান, স্বায়ত্তশাসন, রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ, রাজনৈতিক আন্দোলন ইত্যাদি পাশ্চাত্য জীবনের যতটুকু আমরা সহজে হজম ক'রতে পারি ততটুকু নিতে সুযোগ পেতাম তাহলে সামাজিক ও আর্থিক বিপর্য্যয় এত শোচনীয় ভাবে আমাদিগকে আক্রমণ কর্‌ত না। পাশ্চাত্য সভ্যতার এক প্রাচ্য সংস্করণ দ্বারা যদি আমরা ইউরোপীয় সকল বস্তুকেই ভারতীয় জলে শোধন ক'রে নিজেদের প্রয়োজন মত ব্যবহার ক'র্‌তে পার্‌তাম তা হ'লে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে তিরস্কার করা দরকার হ'ত না। কিন্তু ইউরোপীয়

সভ্যতাকে ভারতীয় প্রথায় অনুরঞ্জিত কর্‌তে পার্‌চিনা ব'লে, আমাদের সমাজকে বিংশশতাব্দীর জটিল অবস্থার উপযুক্ত ক'রে দাঁড় করাতে পারা যাচ্ছে না ব'লেই পরানুকরণের প্রবৃত্তিকে এত গাল দিতে হচ্ছে এবং স্বাধীনচিন্তা ও স্বায়ত্ত কর্ম্মের এত দরকার হ'য়ে পড়েছে।

এই আত্ম-নির্ভরতার অভাবেই অনেক নৈতিক অধোগতি হয়েছে, জীবনের উচ্চ আদর্শ হারাতে হয়েছে। মানুষের পক্ষে কত উচ্চ কাজ করা সম্ভব সে বিষয়ে আমরা অতি নীচ ধারণাই কর্‌তে শিখ্‌ছি। নিজের সুখ দুঃখ ভুলে সকল প্রকার স্বার্থত্যাগ ক'রে মানুষ যে দশের জন্য খাট্‌তে পারে, নামের আশা না ক'রেও জীবন উৎসর্গ করা যায়, খবরের কাগজে নাম না দিয়েও যে লোকে প্রচুর অর্থ ব্যয় ক'র্‌তে পারে, নামজাদা লোকের সার্টিফিকেট পাবার সম্ভাবনা না থাক্‌লেও ছেলেদের যে প্রকৃত শিক্ষা লাভ হ'তে পারে, একটা মামুলি পরীক্ষায় পাশ না ক'রেও যে মানুষ হওয়া যায়—এরূপ ভাববার শক্তিই সমাজ হ'তে ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যাচ্চে। সামান্য একটু যদি স্বার্থত্যাগ করি, অমনি তাকে বাড়িয়ে "অনেক করেছি, সবই কি একজন কর্‌বে?"—এরূপ ভেবে, 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ' হ'য়ে বসে থাকি। মহানুভবতা ও ঔদার্য্য আমাদের নিকট অপরিচিত হয়ে পড়েছে। নূতন নূতন অনিশ্চিত পথে চল্‌তে আমাদের সাহস থাকে না। ইহাই প্রকৃত কাপুরুষতা।

ভাবুকতা

—০*০—

মনুষ্যত্বের পরিচয়

মানুষ নিরাশ হয় কেন? সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ করে কেন? কোন কাজে সময় কিছু বেশী লাগে, অথবা অনেক লোকের সাহায্য দরকার, বা যথেষ্ট টাকার প্রয়োজন হ'তে পারে বটে, কিন্তু তা' বলে কাজটা ত একেবারে অসাধ্য নয়। কোন জিনিষ গ'ড়ে তুল্‌তে হ'লে অনেক দিন লেগে থাকে। কথায় বলে, Rome was not built in a day একটা বাড়ী ভেঙ্গে ফেল্‌তে যত সময় ও কলকারখানার প্রয়োজন, তাকে তৈরী করতে তার চেয়ে শতগুণ বেশী নৈপুণ্য, লোক ও সময় আবশ্যক। এ সব ত দিনরাত চোখের সাম্‌নেই দেখ্‌ছি।

সকল উন্নতিই সময়-সাপেক্ষ

তবে আর নিরুৎসাহ কেন? কষ্টসাধ্য ব'লেই ত পরোপকার, মানবসেবা একটা পুণ্যের কাজ। যদি কোন গোলমাল না থাক্‌ত, তবে আর স্বদেশের হিতসাধন একটা পুণ্যকর্ম্ম হতে পারত না। পথ সোজা হ'লে স্বর্গে যেতে খুব কমই কষ্ট হ'ত। কিন্তু স্বর্গের পথ অতি লম্বা, দুরূহ ও কণ্টকময়। এত যাতনা ভোগ করতে পার্‌লে তবে স্বর্গরাজ্যের মন্দিরচূড়া দৃষ্টিগোচর হবে। কষ্ট যদি করতেই না হ'ত, সকলেই যদি একেবারে স্বার্থত্যাগী হ'য়ে জাতীয় কার্য্যে অর্থ ও সময় ব্যয় ক'রত, তবে ত জাতীয় জীবন অতি সস্তা হ'য়ে পড়্‌ত। তার জন্য লোকে এত লালায়িত হ'ত না।

আর এসব বাধা বিপত্তি আছে ব'লে, এ সকলকে পরাভূত ক'র্‌তে হয় ব'লেই মানুষের মনুষ্যত্ব। মানুষের শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়, সে কত বিপদ সহ্য ও [illegible] ভোগ ক'রে তারই মধ্যে কাজ ক'রতে পারে, [illegible] কেবল তা দেখে।

কষ্ট মানুষের পরীক্ষা

যে যত বাহিরের অবস্থাকে নিজের করতলগত ক'র্তে পারে, চরিত্র দ্বারা বহিঃশত্রুকে যে যত পদানত ক'র্তে পারে, যে মানসিক ও নৈতিক বল দ্বারা প্রতিকূল অবস্থাকে নিজের অনুকূল ক'রে নিতে পারে, নিরাশার বেষ্টনীকে পদদলিত ক'রে তার উপর বিজয়পতাকা উড্ডীন ক'র্তে পারে, সে তত মানুষপদের অধিকারী। আর তা না হ'লে পশুর সমান অবস্থার দাস হওয়া যায়, তাতে নরজন্ম বৃথা।

তাই ভয় বিপদ দেখে চুপ্ ক'রে থাক্‌লে চলে না। বল্‌তে গেলে মানুষের সকল কাজেই কষ্ট। অন্নের গ্রাস মুখে তুল্‌তেও ত কষ্ট।

কষ্টই মহত্ত্বের জীবন স্বরূপ

কিন্তু কৈ? সে ভয়ে ভীত হ'য়ে, নিরুৎসাহ হ'য়ে ত বসে থাকিনা। আর মানুষোচিত যত বড় বড় কাজ আছে, সবই বিষাদে পরিপূর্ণ। যাতে যত বিষাদ তাই তত মহৎ। সুখময় নীড়ে বসে থাক্‌লে মনুষ্যজীবনের উচ্চতম আদর্শ লাভ কর্‌তে পারা যায় না।

মানুষ ভালবাসে, কিন্তু তার অর্থ কি? কেবল আঁখিভরা জল। ভগবানের আরাধনা আর পরোপকারের অর্থ—সংযম ও কঠোরতা। লোকে বড় হয় কেবল ছোট হ'য়ে। স্বাধীনতার অর্থ—নিয়ম ও ধর্ম্মের অধীনতা। লোককে সুশিক্ষা দিতে হ'লে শেষ পর্য্যন্ত ক্রুশেও প্রাণ দিতে হয়।' জীবনের কোন এক উচ্চ আদর্শকে সুসাধন ক'র্তে হ'লে, দৃঢ়ভাবে কোন লক্ষ্যের প্রতি আসক্ত হ'তে হলে, তাতে তন্ময় হয়ে থাক্‌তে হয়। তন্ময়তার অর্থ তাতে প্রাণ সমর্পণ করা।

তবে আর সংশয় দুর্ব্বলতা চিত্ত অধিকার করে কেন? বিশ্বের কোন মঙ্গলকর্ম্মই বাহ্য দৃষ্টিতে মধুর নয়। "আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর, নির্ম্মম আমি আজি" সকল মহাপুরুষেরই এই বচন। সমস্ত জগৎকে আপনার ক'রে [illegible]র "সময়" যখন "নিকট" হ'য়ে আসে, তখন "কিসেরি বা সুখ [illegible]দিনের প্রাণ?"—ব'লে কোন না কোন জায়গায়

বাঁধন ছিঁড়্তেই হয়। প্রকৃতিরঞ্জনের জন্য রাজা রামচন্দ্রের সীতা-বর্জ্জনও তাঁর কাছে এইরূপ কঠোরই বোধ হ'য়েছিল।

মানব-জীবনের সনাতন বিষাদ

জীবনের সকল কাজেই এইরূপ একটা বিষাদের ভাগ রয়েছে। কেবল দেশসেবায় বা সামাজিক জীবনে এই বিষাদাত্মক নাটক অভিনীত হয়, তা নয়। সামান্য গার্হস্থ্যে,পারিবারিক জীবনেও বিষাদপূর্ণ অনেক ঘটনা ঘটে থাকে। আর মানুষের ব্যক্তিগত জীবন স্বয়ংই একটা মস্ত বেদনামূলক নাট্যকাব্য। মানুষের আদর্শ উঁচু, চায় সে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে এক হ'য়ে অনন্ত লীলাময় ভগবানের মহিমা তন্ন তন্ন ক'রে বুঝ্তে। অসীম জ্ঞান, অসীম কর্ম্ম ছাড়া মানুষের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হয় না। কিন্তু এদিকে তার অসংখ্য অসম্পূর্ণতা। স্বর্গরাজ্যের অধিবাসিগণের সঙ্গে সমকক্ষ হ'তে একান্ত বাসনা, কিন্তু নিজের সঙ্গেই অনেক নীচ প্রবৃত্তি, অনেক পাশবিক ইন্দ্রিয়। তাই প্রতিপদেই দুঃখ জ্বালা। সেইজন্যই, যা কখন সম্পূর্ণ ভাবে তৃপ্ত হবার নয়, মানবপ্রকৃতির সেই অসীম বাসনা-রাশির দিকে লক্ষ্য ক'রে কবি বলেছেন,—"Our sweetest songs are those that tell of saddest thought." বিষাদ, দুঃখ, নৈরাশ্যের বিষয়ই মানুষের এত "sweet". এত ভাল লাগে, কারণ এতে তার স্বভাবের কথা আছে, তার নৈসর্গিক উচ্চপ্রাণতার পরিচয় আছে।

আর মানুষ হ'তে হ'লে এই নৈরাশ্যের মধ্যেই আশার স্থান খুঁজে নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে মঙ্গল কর্ম্মের উদ্দেশ্যে চল্তে হবে। আপাতমধুর জিনিষ প্রকৃত মঙ্গলময় নয়। তাই কষ্টকে আলিঙ্গন ক'রে, দারিদ্র্যকে মস্তকে ধারণ করে, নৈরাশ্যের ভীতিকেই একমাত্র সহায় ক'রে জীবনের কঠোর কর্ত্তব্যময় কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে হবে।

আলোচনা-প্রণালী

—০◯০—

মানব-বিষয়ক বিজ্ঞান

কোন বিষয়ে বিশেষরূপে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে নানা দিক হইতে তাহার আলোচনা করিতে হয়। বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন দিকের আলো-

আলোচনা-প্রণালী ও বিজ্ঞান

চনার দ্বারা বিশেষ বিশেষ সত্যের উপলব্ধি করা যায়। সেই সত্যগুলির মধ্যে পরস্পর ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলেই আলোচ্য বিষয়ে সম্যক জ্ঞান জন্মে - অর্থাৎ সেই সম্বন্ধে বিজ্ঞান প্রস্তুত হয়।

বিশেষতঃ, যে বিষয় জটিলতা-পূর্ণ, যে বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে, এবং যাহা অন্যান্য বিষয়ের সহিত

জটিল বিষয়

শৃঙ্খলীকৃত, সেই বিষয়ের সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিভিন্নরূপ আলোচনা প্রণালীর বিশেষ প্রয়োজন। এক প্রণালীতে যে তথ্য অবগত হওয়া যায় অন্য প্রণালীতে ঠিক সেই তথ্য অবগত হওয়া যায় না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর খণ্ড-সত্যসমূহের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ সত্য আবিষ্কারের জন্য যত প্রকার সম্ভব আলোচনা-প্রণালী অবলম্বন করা বিধেয়।

ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বিষয়সম্পত্তি, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি যে সকল বস্তু মানব লইয়া গঠিত, যাহাতে মানবের চিত্ত-প্রবৃত্তি এবং অন্তঃকরণের

মানবীয় বিষয় সমূহের আলোচনায় ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর আবশ্যকতা

গূঢ় শক্তি সকল কার্য্য করিয়া থাকে, যে সকল বিষয়ের উন্নতি অবনতি, পরিবর্ত্তন অথবা ক্রমবিকাশ মানবের জীবন্ত বৃত্তি নিচয়ের কার্য্যের উপর নির্ভর করে, সেই সকল বিষয়ই অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা বিশেষভাবে দুরূহ এবং

সমস্যাপূর্ণ। এজন্য নির্জ্জীব পদার্থ অথবা নিম্নস্তরের প্রাণী সমূহ অথবা অচেতন কলকারখানা প্রভৃতি বিষয়ের সত্য আবিষ্কার করিতে বৈজ্ঞানিকের যেরূপ প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশাল মানবান্তঃকরণের নিগূঢ় ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করিবার জন্য ঠিক সেই প্রণালী অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং স্বতন্ত্র উপায়ে সম্পূর্ণ নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ সত্য উদ্ধার করিতে চেষ্টা করা উচিত। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সত্যের একীকরণে মানবীয় বিষয়সমূহে জ্ঞান সম্পূর্ণতা ও প্রণালীবদ্ধতার দিকে অগ্রসর হইয়া "বিজ্ঞান" পদবাচ্য হয়।

ঐতিহাসিক আলোচনা-প্রণালী

মানবীয় বিষয়সমূহের প্রধান বৈচিত্র্য এই যে, এই সমুদয় অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল—সর্ব্বদা একভাবে দাঁড়াইয়া থাকে না। মানব-প্রকৃতি গতিশীল, তাহার বৃত্তিসকল ক্রমেই বৈচিত্র্য লাভ করে। এজন্য মানবের এবং মানবীয় অনুষ্ঠান-সমূহের স্থিরতা নাই; প্রতিক্ষণেই ইহাদের এক একটি পুরাতনের স্থানে নূতনের প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই উপায়ে প্রত্যেক বিষয়েরই এক একটী "ইতিহাস" রচিত হইতে থাকে। আবার এই পরি-বর্ত্তনশীলতার জন্য ইতিহাসেরও কখনই পুনরাবৃত্তি হয় না। মানবের দর্শন, মানবের আদর্শ, মানবের সাহিত্য, মানবের সমাজ নিরন্তর ভারকেন্দ্র পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নূতন স্থান অধিকার করে। সুতরাং জীবন্ত ও ধারাবাহিকরূপে চলন্ত এবং ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য সম্পন্ন ও বিভিন্নতাবিশিষ্ট মানব সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাহার কোন এক অবস্থার আলোচনা করিলে উদ্দেশ্য সফল হয় না; কারণ ইহাতে তাহার কেবলমাত্র বিশেষ এক ভারকেন্দ্রে অবস্থিত কার্য্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। বহমানা স্রোতস্বতীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার

মানব-প্রকৃতি পরি-বর্ত্তনশীল

তীরে কোন এক স্থানে দণ্ডায়মান হইলে চলে না; তাহার সহিত কূলে কূলে চলিতে হইবে, তাহার গতি অনুসারে স্বকীয় গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। সেইরূপ অনন্তের দিকে ধাবমান, ক্রমশঃ অভিব্যক্তি-প্রাপ্ত এবং বিবর্ত্তনশীল মানবজীবনের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে কেবলমাত্র কোন এক অধ্যায় বা স্তরের প্রকৃতি নিরীক্ষণ না করিয়া ইহার বিভিন্ন অধ্যায়ের ও রূপান্তরসমূহের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণগুলির সহিত পরিচিত হইতে হইবে।

এজন্য ঐতিহাসিক আলোচনা-প্রণালীর প্রয়োজন

এ জন্য ঐতিহাসিক প্রণালীই মানবীয় বিজ্ঞানসমূহের প্রধান আলোচনা-প্রণালী। মানব কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থায় কিরূপ ভাবে চিন্তা ও কর্ম্ম করিয়াছে, এই আলোচনাই মানবীয় বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষের প্রতিষ্ঠান-বৈচিত্র্য, ভাষা-বৈচিত্র্য, আদর্শ-বৈচিত্র্য, রাষ্ট্র-বৈচিত্র্য ও সমাজ-বৈচিত্র্যের উপলব্ধি হয় না, সেই জ্ঞান নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক। সেই জ্ঞানের দ্বারা মানব সম্বন্ধে কোন উপদেশ প্রদান করা অসম্ভব।

ধন-বিজ্ঞানে

এইজন্য মানুষের বিষয়সম্পত্তিভোগ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রধানতঃ এই ভোগ-প্রবৃত্তির ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা আবশ্যক। বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন স্থানে মানব নিজের সহিত বিশ্বের সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থির করিয়াছে। তাহার ফলে ইহ জগতের ভোগবাসনা এক এক অবস্থায় এক এক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের অবতারণা করিয়াছে। সুতরাং কেবলমাত্র এক অবস্থার বিশ্লেষণ দ্বারা মানবের বৈষয়িক পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না।

ধর্ম্মে

ধর্ম্মভাব সম্বন্ধেও এই কথা। কেবল এক সমাজের বা এক অবস্থার বিশ্লেষণ দ্বারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে শেষ সত্যের উপলব্ধি হয় না।

সাহিত্য কাহাকে বলে, সাহিত্যের উৎকর্ষ কোন্ কোন্ উপাদানের উপর নির্ভর করে, সাহিত্যের সহিত সমাজ চরিত্রের কি সম্বন্ধ, সাহিত্যের কোন লক্ষ্য ও আদর্শ আছে কি না, এতৎ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও সাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের বিবরণ সংগ্রহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সাহিত্যে

দার্শনিক আলোচনা প্রণালী

কিন্তু সজীব মানব এইরূপ গতিশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হইলেও তাহার মধ্যে কতকগুলি সামান্য ধর্ম্ম আছে। এই সাধারণ ধর্ম্মসমূহ সকল অবস্থায় ও সকল স্থানেই লক্ষিত হয়। ইহারা স্থিতিশীল এবং সর্ব্বত্র সমান ভাবে বর্ত্তমান। সুতরাং মানবপ্রকৃতি একদিকে গতিশীল ও বৈচিত্র্য-পূর্ণ, অপর দিকে স্থির ও "সামান্য-ধর্ম্ম-'বিশিষ্ট।

মানব প্রকৃতি স্থিতি-শীল ও বটে

এজন্য সম্পূর্ণ মানব-বিজ্ঞান দুই প্রকার আলোচনার উপর প্রতি-ষ্ঠিত—(১) ইতিহাসের দ্বারা পরিবর্ত্তন ও বিভিন্নতা সমূহের বিবরণ সংগ্রহ, (২) দর্শনের দ্বারা ঐক্য ও স্থিতির বিশ্লেষণ।

একদিকে যেমন কেবলমাত্র এক অবস্থার আলোচনা করিলে মানবের পারম্পর্য্য ও ধারানুবাহিকতা হৃদয়ঙ্গম হয় না, তেমনি অপর-দিকে বিশেষ এক ভারকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত, স্থিরভাবে দণ্ডায়মান, বিশেষ এক অবস্থার আলোচনা না করিলে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না। মানব ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ গঠন করিয়াছে বটে, কিন্তু মানব-চরিত্রের মধ্যে এমন কতকগুলি শক্তি আছে যাহার দ্বারা তাহাকে সামাজিক জীব করিয়া তুলিয়াছে। মানবের কোন এক অবস্থার বিশ্লেষণ করিলেই ম[illegible]বের সহিত মানবের প্রয়োজন আছে কিনা, নিঃসহায়রূপে মানব[illegible] স্বকীয় সকল প্রকার

এজন্য দার্শনিক বিশ্লে-ষণ-প্রণালীর প্রয়োজন

অভাব মোচন করিতে পারে কিনা, এই সকল বিষয়ের তথ্য সম্যক্ আলোচিত হয়। এজন্য সমাজ-প্রকৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস-সংগ্রহ আবশ্যক হয় না। সেইরূপ কোন এক অবস্থার আলোচনা করিলেই মানবের সাহিত্যের প্রয়োজন আছে কি না, সাহিত্যের উৎপত্তি কেন হইল, সাহিত্যে কোন্ কোন্ বৃত্তির বিকাশ হয়, এবং সাধারণতঃ সাহিত্যের সহিত মানবচরিত্রের কি সম্বন্ধ এতৎ সম্বন্ধেও উপযুক্ত সত্যের উদ্ধার হয়। সেইরূপ মানুষমাত্রের মধ্যে যে ধর্ম্মভাব ও ভোগপ্রবৃত্তি আছে তাহার বিশ্লেষণ করিলেই ধর্ম্ম ও ধনসম্পত্তি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান জন্মিতে পারে। মানব কেন দেবদেবীর উপাসনা করে, কেন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, শাস্ত্রালোচনা করে, কি কারণে কোন না কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এবং কি জন্য বিভিন্ন প্রকার শিল্পের আয়োজন করে, তাহার বৈষয়িক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রয়োজন কি, এবং ইহাদের উৎপত্তি হয় কেন, এই সকল বিষয়ের জন্য ইতিহাস অনুসন্ধান না করিয়া কোন এক ব্যক্তি বা সমাজের অন্তঃকরণ অনুসন্ধান করিলেই চলে।

এই প্রণালীর প্র. াগ

সমাজ-তত্ত্বে, ধন-বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে ও সাহিত্যে

যে সকল বিদ্যাকে আমরা 'বিজ্ঞান' বলিয়া থাকি তাহাদের দুইটি দিক্ আছে। একদিকে তাহারা নানাবিধ উপায়ে কোন বিষয়ের আধুনিক অথবা প্রাচীন তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করিয়া ক্রমশঃ তৎসম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বারা সত্য আবিষ্কার করে। অপর দিকে কেবল মাত্র জ্ঞানলাভ ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া সেই জ্ঞান ও তত্ত্বকে ব্যবহার করিয়া মানুষের বিবিধ অভাবমোচনের সহায়তা করে। বিজ্ঞানের এক অংশ জ্ঞানকাণ্ড, অপর অংশ কর্ম্মকাণ্ড। উভয়ের মিলনে বিজ্ঞানের সমাপ্তি। একদিকে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সম্মুখে স্থাপন না করিয়া, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রণালীর

বিজ্ঞানের দুই ভাগ

দ্বারা নিরপেক্ষভাবে ও সহিষ্ণুতার সহিত আলোচ্য বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া সত্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করা; অপর দিকে বিশেষ এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবন করা—এই দুইটিই বৈজ্ঞানিকের কার্য্য। ইহাদের মধ্যে শেষোক্তটি পূর্ব্বোক্তটির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ কোন বিষয়ের স্বরূপ ও প্রকৃতি অবগত না হইলে তাহাকে কোন লক্ষ্যের দিকে চালিত করা অসম্ভব।

ধন-বিজ্ঞান এইরূপ একদিকে মানুষের ভোগপ্রবৃত্তির প্রকৃতি, ক্রমবিকাশ, রূপ-পরিবর্ত্তন এবং ইহা চরিতার্থ করিবার উপায় সমূহ নানা প্রকারে আলোচনা করিয়া বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে; অপরদিকে এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া, এই ধনসম্পত্তি সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়ম সমূহের সাহায্য গ্রহণ করিয়া দেশের বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি সাধনের উপায় উদ্ভাবন করে।

ধন-বিজ্ঞানের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড

সেইরূপ রাষ্ট্রবিজ্ঞানও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, উন্নতি, অবনতি সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাষ্ট্রশাসনের প্রণালী আবিষ্কার করে, এবং তাহার দ্বারা রাষ্ট্রের কর্ম্মচারীদিগকে কর্ম্মে সাহায্য করে।

রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের দুই ভাগ

ধর্ম্মের প্রকৃতি—অসীমের উপলব্ধি*

—·০◯০·—

ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব

ধর্ম্ম আধুনিক জগতের একটী নূতন আবিষ্কার নহে। ইহা একটী অতি প্রাচীন পদার্থ। মানবের চিন্তা ও ধারণাশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তাহার এক ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাই। মানবেতিহাসের প্রথম যুগের অতি নিম্নস্তর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগের অতি উচ্চতম সোপান পর্য্যন্ত যে কোন অবস্থার পর্য্যালোচনা করি না কেন, মানবের প্রত্যেক অবস্থানেই এক একটী ধর্ম্মের প্রভাব দেখিতে পাই।

জগতের প্রাচীনতম সাহিত্যসমূহ ধর্ম্মমূলক। বংশ-পরম্পরাগত অথবা লিপিবদ্ধ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় রীতিনীতি, এবং বিধিনিষেধসমূহেই মানবের সভ্যতা ও উৎকর্ষের বীজ নিহিত রহিয়াছে। এমন কি, যখন সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই—যখন মানবের মনোভাব প্রকাশের উৎকর্ষ ও জটিলতা সাধিত হয় নাই—যখন তাহার চিন্তা ও ভাবসমূহ প্রণালীবদ্ধ হয় নাই, যখন সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহেরবৈচিত্র্য জন্মে নাই, এবং যখন মানবজীবন অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল বলিয়া ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ প্রয়োজনই বোধ হয় নাই—সভ্যতার সেই আদিমকালেও মানব যে ভাব ও চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইত, তাহার অন্তঃকরণের উৎস হইতে যে ধারণাপুঞ্জ প্রবাহিত হইত, সেই সমুদয় ভাব ও ধারণার মধ্যেও ধর্ম্মভাবের উপাদান লক্ষিত হয়। সংস্কৃত, গ্রীক, পারস্য প্রভৃতি আর্য্য ভাষাসমূহের মধ্যে যে সকল ধর্ম্মবাচক শব্দ বিদ্যমান

---

* ম্যাক্স্‌মুলারের (Max Muller) প্রথম হিবার্ট বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত।

রহিয়াছে, তাহাদের মৌলিক উপকরণগুলি এই ভাষাসমূহের সৃষ্টির বহু পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিল। যখন আধুনিক আর্য্যভাষাভাষীদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা একই দেশে বাস করিয়া, একই সমাজের অন্তর্গত থাকিয়া, একই আর্য্যভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেন, তখনও ধর্ম্ম এবং দেবতাবিষয়ক ধাতু ও শব্দের ব্যবহার অবগত হওয়া যায়।

ধর্ম্মের প্রকৃতি-নিরূপণের দুরূহতা

কিন্তু যদিও জগতে মানবের উৎপত্তিকাল হইতেই মানবের চিন্তা-পদ্ধতি ধর্ম্মভাবাক্রান্ত হইয়াছে, যদিও মানবেতিহাসে ধর্ম্মরহিত কোনও অধ্যায় আছে কিনা সন্দেহ, তথাপি ধর্ম্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও সুনিশ্চিত এবং সর্ব্ববাদিসম্মত ধারণার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ধর্ম্ম বলিলে প্রাচীন জগতের লোকেরা একরূপ বুঝিত, আধুনিক কালের লোকেরা স্বতন্ত্ররূপ বুঝে। সকল যুগের সকল লোকেই ধর্ম্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে এবং নিজ নিজ জীবনের মধ্যে ধর্ম্মের প্রভাব ও আধিপত্য অনুভব করিয়াছে বটে, কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে যত বিশেষত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্ট হইয়াছে ইহার অর্থের যত অনৈক্য ও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, অন্য কোনও বিষয়ে তত পরিবর্ত্তন ও বিভিন্নতা ঘটে নাই। বস্তুতঃ প্রত্যেক যুগের এক একটী ধর্ম্ম, প্রত্যেক দেশের এক একটী ধর্ম্ম, প্রত্যেক ব্যক্তির এক একটী ধর্ম্ম, এবং এমন কি, স্ত্রী পুরুষ ও বয়স ভেদে ধর্ম্মের পার্থক্য হয়, এরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং ধর্ম্ম বলিলে যে কোন ভাবের উপলব্ধি হওয়া উচিত, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন।

(ক) সাধারণ ভাষায় ধর্ম্মশব্দ তি[illegible] অর্থ প্রকাশ করে

এমন কি প্রচলিত ভাষাতেই সাধারণভা[illegible] যখন আমরা ধর্ম্ম শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকি, তখন আমরা বিশেষ [illegible] অর্থে কোন এক ভাব

প্রকাশ করি না। এই শব্দপ্রয়োগের মধ্যে আমাদের বহু অনিশ্চয়তা থাকিয়া যায়। আমরা কখনও ইহাকে পরিষ্কার ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করি না—বিভিন্ন ভাবের মধ্যে কোন্‌টী আমাদের অভিপ্রেত এ সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া সকল স্থলেই এই বহু অর্থবাচক শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকি।

একই শব্দ ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কখনও হয় ত দেবতত্ত্ব, উপাসনা, পূজা প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি মত বুঝাইবার জন্য এই শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। কখনও হয়ত মতামত বা ধারণা ও চিন্তা না বুঝাইয়া দেবতা ও পূজা প্রভৃতি বিষয়ে হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। আবার অন্য স্থলে ধর্ম্মের অর্থ মানসিক ধারণা বা জীবনের ধর্ম্মপ্রবণতা এবং হৃদয়ের ব্যাকুলতা মাত্র নহে—এই ধারণা ও ব্যাকুলতার প্রকৃত পরিচায়ক ও প্রকাশক জীবনের কর্ম্মসমূহ।

যদি প্রথম অর্থে ব্যবহার করা যায়, তবে যে ব্যক্তি বা যে সমাজ ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারে, ইহার প্রকৃতি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া ইহার সাধনবিষয়ে উপায়াদি নির্দ্ধারণ করিতে পারে, এবং ধর্ম্মজীবনের কার্য্য ও উপকরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে পরিস্ফুট ধারণাসমূহ নিয়ম ও সূত্রাকারে সন্নিবেশিত করিতে পারে, সেই ব্যক্তি ও সমাজকেই ধার্ম্মিক বলা যায়। যদি দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি বা সমাজের হৃদয় ধর্ম্মের নামে গলিয়া যায়, ধর্ম্মবিষয়ে যাহাদের অনুভূতি অতি সূক্ষ্ম, যাহারা চিন্তা করিবার ও ভাবিবার অবসরের প্রতীক্ষা না করিয়া ধর্ম্মমাহাত্ম্যে আস্থাবান্, যাহাদের মানসিক জগতে [illegible]ক্তি বিচার প্রভৃতি অপেক্ষা বিশ্বাস, ভক্তি ও শ্রদ্ধাই [illegible]ধিকতর প্রভাবান্বিত, তাহারাই প্রকৃত ধার্ম্মিক। আর তৃতীয় অর্থ বুঝি[illegible] যাহারা জগতে কর্ম্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া পূজা, অর্চ্চনা, দান, [illegible]া প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে মনোনিবেশ করে, তাহারাই

ধার্ম্মিক। সুতরাং সাধারণতঃ আমাদের ধর্ম্মশব্দে তিন অর্থ প্রকাশিত হইতে পারে—(১) ধর্ম্মজ্ঞান বা ধর্ম্মবিষয়ক মতবাদ, (২) ধর্ম্মভাব, (৩) ধর্ম্মকর্ম্ম। এই জন্য কোন্ স্থলে কোন্ ভাব প্রকাশই উদ্দেশ্য ইহা স্থির করিয়া না দিলে শ্রোতা ও বক্তা অথবা পাঠক ও লেখকের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান সুসাধ্য হয় না। কাজেই পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে।

(খ) ধর্ম্মের অসংখ্য অভিব্যক্তি

আমাদের ভাষার দোষ এবং শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে অসাবধানতাই এই অনৈক্যের একমাত্র কারণ নহে। ধর্ম্মের বিষয় লইয়াই ঘোর বিভিন্নতার সৃষ্টি হইয়াছে। ধর্ম্মজীবন, ধর্ম্মশিক্ষা, ধার্ম্মিকের লক্ষণ প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রকৃতি সম্বন্ধেই মানবের ধারণার বৈচিত্র্য জন্মিয়াছে।

এরূপ অনেক সমাজের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যেথানে কোন ধর্ম্মবাচক শব্দ প্রচলিত নাই, অথচ তাহারা এমন কাজ করিয়া থাকে, তাহাদের জীবনে এমন অনেক বিশেষত্ব আছে, যেগুলিকে ধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। হয়ত কোন কোন জাতি দেবদেবী সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা পোষণ করে না; কিন্তু তাহারা মৃত ব্যক্তিদিগের প্রেতপূজা করে। আবার কোন আধুনিক পণ্ডিত হয়ত বহু গবেষণার পর নিরীশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া যুক্তির দ্বারা মানবসমাজ হইতে দেবতা-বিশ্বাস দূরীভূত করিতে যত্নবান্ হইলেন। অথচ তিনিই কোন সুহৃদের উদ্দেশ্যে শোকোচ্ছ্বাস করিতেছেন এবং মানবের বিবিধ উপকার সাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন।

কেহ হয়ত ভগবদ্ভক্তির কোন বাহ্যানুষ্ঠান করেন না অথচ ভগবানের কৃপাকাঙ্ক্ষী। কেহ মনে করেন জগৎ দেবতাময়। কেহ হয় ত ভাবিতে পারেন যে দেবদেবী নাই এরূপ ভাবাই ধর্ম্ম।

কোন ব্যক্তি জীবনের এক অবস্থায় উপাসনা, প্রার্থনা, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মে মনোনিবেশ করিয়া ভাবিতেছে সে ধর্ম্মাচরণ করিল। আবার সেই ব্যক্তিই হয়ত জীবনের অন্য এক অবস্থায় এই সমুদয় ক্রিয়াকাণ্ড নিরর্থক মনে করিয়া ধ্যান যোগ প্রভৃতি চিত্তের প্রক্রিয়ার দ্বারা পরমাত্মায় লীন হইবার উদ্যোগ ও প্রবৃত্তিকেই প্রকৃত ধর্ম্ম মনে করে! কেহ দেবতা-দিগকে ভয় করে, কেহ তাঁহাদিগকে সম্মান করে। কেহ পরকালে সুখ আশা করিয়া অথবা দুঃখ ভয় করিয়া ইহজীবন নিয়ন্ত্রিত করে। কেহ দেবতাপূজা প্রভৃতি কর্ম্ম না করিয়া মানবসেবা অবলম্বন করে অথবা জীবনে বিবিধ সংযম পালন করে, অথবা হয়ত ভগবানের সাক্ষাৎকার-রূপ পরমানন্দকর মহোল্লাসে সর্ব্বদা মত্ত হইয়া থাকে।

ধর্ম্মের অভিব্যক্তির এরূপ বৈচিত্র্য জন্মিয়াছে বলিয়াই ধর্ম্মসম্বন্ধে এক মতে উপনীত হওয়া কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের আচরণকে একমাত্র ধর্ম্ম মনে করে এবং অন্যের আচরণকে অধর্ম্ম মনে করে।

(গ) বিভিন্ন ভাষার ধর্ম্মবাচক শব্দসমূহ পরস্পর প্রতিশব্দ নহে

সুতরাং ধর্ম্মের বিষয় সম্বন্ধে এরূপ বৈচিত্র্য ও অনৈক্য আছে বলিয়া বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত ধর্ম্মবাচক শব্দসমূহ পরস্পর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কোন ভাষায় ধর্ম্মবাচক শব্দের দ্বারা যে ভাব প্রকাশিত হয়, অন্য ভাষায় ঠিক সেই ভাবপ্রকাশোপযোগী শব্দের ব্যবহার করিলে হয় ত সেই সমাজের অধর্ম্ম বা ধর্ম্ম ব্যতিরিক্ত অন্য কোন ভাব প্রকাশিত হইবে। "রিলিজ্যন" শব্দে ইংরাজীতে যাহা বুঝায় "ধর্ম্ম" শব্দে সংস্কৃত ভাষায় ঠিক সেরূপ বুঝায় না। সুতরাং এই দুইটী পরস্পর প্রতিশব্দ নহে; আবার এই ইংরাজী শব্দেরও প্রকৃতিগত অর্থ আধুনিক অর্থ নহে।

এই কারণে তুলনাসিদ্ধ ভাষা-বিজ্ঞানের সাহায্যেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা দুরূহ ব্যাপার।

(ঘ) "নানা মুনির নানা মত"

ভাষাগত অসম্পূর্ণতা ও বিষয়গত বৈচিত্র্যের জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ও সমাজসমূহের মধ্যে অনৈক্য ও মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—এই মতদ্বৈধ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-আচরণকারী প্রচারকদিগের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া যাঁহারা দার্শনিকের উপায় অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে কেবল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও প্রবিষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা কেবলমাত্র আলোচনা করিয়া ও বিজ্ঞান রচনা করিয়াই ক্ষান্ত, তাঁহারাও এ বিষয়ে সাধারণ কোন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। পৃথিবীতে যেমন ধর্ম্মের বহু পরস্পরবিরোধী অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়, সেইরূপ বহু পরস্পরবিরোধী ধর্ম্ম-বিজ্ঞানেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এক ব্যক্তি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করেন অপর একজন তাহা খণ্ডন করিয়া সম্পূর্ণ এক নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করেন। নানা জাতির মধ্যে ধর্ম্মের নানা অভিব্যক্তির দ্বারা স্বভাবতই যে বিরোধ সৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দিগের নানা মতবাদের দ্বারা সেই বিরোধ আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে।

(১) মানব-জ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত নীতি, জীবনের নিয়ন্তা

কাণ্ট (Kant) বলেন, জীবনের কর্ত্তব্যসমূহ ভগবানের আদেশরূপে বিবেচনা করাই ধর্ম্ম। কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় ভগবানের আদেশ দ্বারা মানবের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হয় না। মানব স্বকীয় বুদ্ধির প্রয়োগ করিয়াই কর্ত্তব্য সমূহের উপলব্ধি করে, এবং এইরূপ উপলব্ধি হইলে পর তাহাদিগকে ভগবানের আদেশরূপে বিবেচনা করে। ইহাঁর মতে কর্ত্তব্য সমূহ ভগবৎ-প্রসূত নহে—মানব-জ্ঞান-প্রতিষ্ঠিত। যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-

বিভাগ মানবের স্বচিন্তিত ও স্বকল্পিত নহে, যাহা কোন বহিঃস্থিত শক্তির পরিচায়ক, তাহার দ্বারা যে মানবের জীবন পরিচালিত হয় সেই মানবকে ইনি অতি নীচ ও দুর্ব্বল মনে করেন। সকল ধর্ম্মই মানবকে প্রথমাবস্থায় এক মানবাতীত বিষয়ে আস্থাবান্ হইবার উপদেশ প্রদান করে বটে, কিন্তু ক্রমশঃ এই অতীন্দ্রিয় ও বিশ্বাসমূলক সত্যের আধিপত্য হ্রাস করিয়া ইহজগতের মানবীয় জীবনের কার্য্যনির্ব্বাহই চরম আদর্শ স্থির করিয়া দেয়। সুতরাং ইঁহার ধর্ম্মমতকে নীতি বলা যাইতে পারে।

(২) মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান—জীবনের কর্ত্তব্যোপদেষ্টা নহে

ফিক্‌টে (Fichte) সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদী। ইনি বলেন, জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। কেবলমাত্র নীতিই জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ। এজন্য ধর্ম্মের সাহায্য গ্রহণ করা অনাবশ্যক। যে ব্যক্তি বা সমাজকে সুপরিচালিত ও সুসংযত করিবার জন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়, সেই ব্যক্তি ও সমাজকে ইনি অতি নীচ ও ঘৃণ্য মনে করেন। ইহাঁর মতে ধর্ম্ম জ্ঞানমাত্র—কোন কর্ম্মের উপদেষ্টা নহে। ধর্ম্মের দ্বারা মানব নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া সূক্ষ্ম প্রশ্নসমূহের মীমাংসা করিতে পারে। এরূপ জ্ঞানের ফলে মানব নিজ জীবনের সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিতে পারে এবং চিত্তের উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ হয়।

(৩) বাহ্য অনুষ্ঠান-যুক্ত উপাসনা

কেহ কেহ বলেন, দেবপূজাই ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। যেখানে এই পূজার বাহ্য অনুষ্ঠান নাই, সেখানে ধর্ম্ম নাই। ইহাঁরা আনুষ্ঠানিক কার্য্যকলাপ-বিবর্জ্জিত ধর্ম্মের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারেন না। কাহারও কাহারও মতে বাহ্য-আচারের

(৪) বাহ্য অনুষ্ঠান-রহিত উপাসনা

[illegible]হিত প্রকৃত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধই নাই। এমন কি [illegible]কোনরূপ পূজাপদ্ধতি না থাকিলেও ধর্ম্ম থাকিতে পারে—অনুষ্ঠান[illegible] ধর্ম্মের অঙ্গ নহে।

অতি নিম্ন শ্রেণীর অসভ্য সমাজেও শেষোক্ত পরস্পরবিরোধী মতদ্বয়ের প্রভাব অবগত হওয়া যায়। এমন সমাজের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে যাহারা এক সর্ব্বশক্তিমান্ বিধাতা পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করে, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে ধর্ম্মমত পোষণ করে এবং জগতের অমঙ্গলজনক তাঁহার এক আততায়ীর প্রভাবে ভীত হয়। কিন্তু তাহারা কোন দেবতা-কেই সন্তুষ্ট করিতে কোনরূপ বিধান অবলম্বন করে না। আবার ইহারই ঠিক বিপরীত সমাজের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—যাহারা জগতের স্রষ্টা অদ্বিতীয় পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রহ, নক্ষত্র, নদী, মানব, জন্তু, বৃক্ষ প্রভৃতি জগতের সকল পদার্থই শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিষয়ভাবে পূজা করিয়া থাকে।

আধুনিক সভ্যজগতের পণ্ডিতদিগের মধ্যেও এই দুই মতেরই পৃষ্ঠ-পোষক আছেন। কাণ্টের মতে বিবিধ উপচারে ভগবানের পূজা করা নিতান্তই অজ্ঞতা, মূঢ়তা ও কুসংস্কারের পরিচায়ক। ইহাকে ইনি ধর্ম্ম না বলিয়া অলীক উন্মাদনা মনে করেন। ইহাঁর বিবেচনায় মন্দির, মঠ, গির্জ্জা, মস্‌জিদ প্রভৃতি ধর্ম্মগৃহের বিচিত্র আরাধনা ও উপাসনার বিধি সমূহ বালকোচিত কর্ম্ম। ইহাঁর বিরুদ্ধবাদীদিগের মতে বাহ্য অনুষ্ঠান, পূজোপচার, ক্রিয়াকলাপ-রহিত হৃদয়ের ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়। ইহাঁরা কাণ্টের মতবাদকে নাস্তিকতা মনে করেন।

পণ্ডিত শ্লায়রমেকার (Schleiermacher) ধর্ম্মশব্দে নীতি বা জ্ঞান বা উপাসনা প্রভৃতি কিছুই বলেন না। ইনি ইহার এক স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ইহাঁর মতে জগতে এমন কোন বস্তু আছে যাহা মানবকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, কিন্তু যাহার উপর মানবের কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব থাটে না। যে মানব সেই বস্তুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে, সেই ধার্ম্মিক। সুতরাং অধীনতা স্বীকার করাই ইহাঁর বিবেচনায় ধর্ম্মের লক্ষণ।

(৫) অধীনতা

পরন্তু হেগেল (Hegel) মনে করেন, অধীনতা উপলব্ধি করা এবং স্বীকার করা ধর্ম্মভাবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। যদি অধীনতা জ্ঞানই ধর্ম্মের লক্ষণ হইত তাহা হইলে প্রভুভক্ত কুকুরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধার্ম্মিক। ইহাঁর বিবেচনায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং আত্মবশতাই প্রকৃত ধর্ম্ম। কারণ এই অবস্থায় অসীম ঐশীশক্তি সসীম মানবশক্তির ভিতর দিয়া প্রকটিত হয়।

(৬) স্বাধীনতা

আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন যাঁহারা মানবাতীত এবং অতীন্দ্রিয় কোন বিষয়ের অস্তিত্ব বা প্রভাব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে মানব কেবল ধর্ম্মের প্রচারক বা উপাসক মাত্র নহে, মানব স্বয়ংই উপাসনা এবং পূজার বস্তু,—মানবই মানবের আরাধ্য দেবতা। মানবসেবাই ধর্ম্ম।

এই মানবসেবাধর্ম্মেরও দুই বিভিন্ন ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছে। কম্‌টে (Comte) মনে করেন, মানব মানবাপেক্ষা যোগ্যতর এবং উচ্চতর বস্তুর ধারণা করিতে পারে না, সুতরাং মানবপূজাই এক মাত্র ধর্ম্ম হইয়া পড়ে বটে ; কিন্তু মানবের মহত্ত্ব ও গৌরব ব্যক্তিগত ভাবে লক্ষিত হয় না,—কেবলমাত্র সমগ্র মানবজাতিই সঙ্ঘ ও সমাজরূপে প্রকৃত ঐশ্বর্য্যশালী, গৌরবান্বিত ও শক্তিমান্। সুতরাং মানবসেবা করিতে হইলে মানবের সমাজকে পূজা করিতে হইবে। ব্যক্তিগত মানবের ক্ষুদ্রত্ব ও দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিয়া যে স্থানে বিরাট্ মানব-সমাজের মহীয়সী সম্পদ্‌রাশি পুঞ্জীকৃত হয় সেই সত্তাকেই দেবতাজ্ঞানে আরাধনা করা উচিত।

(৭) মানব-জাতি-সেবা

ফউয়েরবাকের (Feuerbach) মতে, কম্‌টে মানবসেবায় সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। কারণ ইনি বলেন, পূজার পাত্র সমাজ বা অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তু নহে ; প্রত্যেক মানব নিজেই নিজের সেবার বস্তু, এই [illegible]বা ও আরাধ্য দেবতা। ইনি মনে করেন, মানবপ্রকৃতির মধ্যে নিজের সুখাকাঙ্ক্ষা, স্বার্থাভিলাষ এবং ব্যক্তিগত

ভোগবাসনাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও আদিম প্রবৃত্তি। এই স্বার্থসিদ্ধির প্রবৃত্তিই সকল প্রবৃত্তির ভিত্তি, মানবের সর্ব্ববিধ কর্ম্মও চিন্তার পরিচালক এই আত্মপ্রতিষ্ঠাই সকল স্বার্থত্যাগ ও পরহিতের সহিত জড়িত। এই কারণে যখনই ধর্ম্মবিষয়ে অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মানব সেই প্রবল শক্তি রোধ করিয়া কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই তাহার অস্বাভাবিক আচরণ করা হয় এবং কতকগুলি অনর্থের সূত্রপাত হইতে থাকে। সুতরাং নিজের অভীষ্টসিদ্ধিই একমাত্র ধর্ম্ম।

(৮) স্বার্থসিদ্ধি

ধর্ম্মের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ

কিন্তু যদিও ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকেরা নিজ নিজ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান দ্বারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তথাপি মানবসমাজে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন কালে জীবনের যে সকল অভিব্যক্তিকে ধর্ম্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে, সেই সকল গুলিরই পরিচায়ক এক সাধারণ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা অসম্ভব নহে। কারণ যে জিনিষ অতি আদিম কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং অদ্যাপি যাহার অবারিত বিকাশ হইতেছে, তাহার অসংখ্য রূপ-পরিবর্ত্তন ও অবস্থান্তরের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ বা সামান্য ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। এই "সামান্য ধর্ম্ম" ও সাধারণ লক্ষণগুলিকেই বিশেষ ভাবে ধর্ম্মের পরিচায়ক বিবেচনা করা যাইতে পারে। সুতরাং ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের মধ্যে ধর্ম্মের প্রকৃতি নিরীক্ষণ ও প্রকৃত অর্থ অন্বেষণ করিতে হইবে।

ধর্ম্মের বিবিধ অভিব্যক্তিসমূহের সাধারণ লক্ষণ

ধর্ম্ম-জীবনের যত প্রকার অভিব্যক্তি হইয়াছে সকলগুলি সম্যক্ আলোচনা করিলে তাহাদের মধ্যে দুইটী বিষয় বিশেষরূপ প্রতীয়মান হয়।

প্রথমতঃ, স্বতন্ত্র ভাবে কেবল মাত্র ধর্ম্মেরই বিষয়ীভূত কতকগুলি পদার্থের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। বিশ্বের পদার্থ বিবিধ। এমন কতকগুলি পদার্থ আছে যাহা কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞানেরই বিষয়ীভূত—যাহা যুক্তি, ভক্তি বা মানবের অন্য কোন শক্তির আয়ত্ত নহে। যে জীব ইন্দ্রিয়শক্তি-রহিত তাহার পক্ষে সেই পদার্থের উপলব্ধি অসম্ভব। পরিদৃশ্যমান বাহ্য জগতের যাবতীয় পদার্থ এইরূপ।

(ক) বিশেষ ভাবে ধর্ম্মের বিষয়ীভূত স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব

সেইরূপ এমন কতকগুলি পদার্থ আছে যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে—যাহা কেবলমাত্র চিন্তাশক্তিরই আয়ত্ত। যে জীবের এই শক্তি নাই তাহার পক্ষে সেই পদার্থসমূহের ধারণা করা অসম্ভব। যে সকল পদার্থ বিশেষ-ভাবে মানবীয়—মানবের যুক্তি, কর্ম্ম, ভাব, চিন্তা, আন্দোলন, সমাজ-গঠন প্রভৃতি পদার্থসমূহ এইরূপ। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই সকল বিষয়ের উপলব্ধি হইতে পারে না।

পরিদৃশ্যমান বাহ্যজগৎ যেমন বিশেষ কোন এক শক্তির আয়ত্ত, মানবের অন্তর্জগৎ যেমন বিশেষ রূপে অন্য এক শক্তির আয়ত্ত, তেমনি এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহা বাহ্য জগৎ এবং অন্তর্জগৎ হইতে স্বতন্ত্র, যাহা বিশেষ ভাবে ধর্ম্মেরই বিষয়ীভূত।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মের স্বতন্ত্র বিষয়সমূহের জ্ঞানলাভোপযোগী মানবের এক বিশিষ্ট শক্তির অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। মানবের এমন এক শক্তি আছে যাহার দ্বারা কেবল মাত্র ধর্ম্মেরই উপলব্ধি করা যায়—যাহা দ্বারা অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান জন্মে না।

(খ) ধর্ম্মজ্ঞানলাভোপযোগী স্বতন্ত্র শক্তির অস্তিত্ব

এই স্বতন্ত্র শক্তি নূতন কোন শক্তি নহে। মানবের জ্ঞান, মানবের ধারণা, মানবের উপলব্ধি কেবল মাত্র এক শক্তি দ্বারাই সাধিত হয়।

প্রাকৃতিক পদার্থ এবং অন্যান্য বস্তুর জ্ঞান, ধারণা ও উপলব্ধি যে শক্তির অধীন, ধর্ম্মের জ্ঞান, ধারণা এবং উপলব্ধিও সেই শক্তিরই অধীন। তবে একই ধারণাশক্তি পদার্থভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। ধর্ম্মজ্ঞান লাভোপযোগী স্বতন্ত্র শক্তি আছে এই কথা বলিলে বুঝিতে হইবে, মানবের সেই এক ধারণাশক্তিই ধর্ম্মের বিষয়ীভূত পদার্থসমূহের প্রভাবে যে ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, অন্যবিধ পদার্থের প্রভাবে ঠিক সেই ভাবে কার্য্য করে না।

এই স্বতন্ত্র শক্তি—
(ক) নূতন কোন শক্তি নহে

অপিচ, এই স্বতন্ত্র শক্তি কোন বস্তু বা পদার্থ নহে—একটী শক্তি মাত্র। জগতে যত নির্জীব ও সজীব পদার্থ আছে, প্রত্যেক পদার্থেরই কতকগুলি বিভিন্ন শক্তি আছে। পদার্থসমূহের পরস্পর সম্বন্ধে সেই শক্তিসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং শক্তির আধার পদার্থ এক বস্তু নহে। শক্তি-ব্যতিরিক্ত কোন পদার্থ নাই এবং পদার্থ-ব্যতিরিক্ত কোন শক্তি নাই বটে, কিন্তু এই দুই জিনিষের পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে। যেমন কোন প্রস্তর এবং ইহার ওজন দুই ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ, পৃথিবী এবং ইহার মাধ্যাকর্ষণীর শক্তি দুই স্বতন্ত্র বস্তু। ধর্ম্মজ্ঞানলাভোপযোগী স্বতন্ত্র শক্তি আছে, এই কথা বলিলে বুঝিতে হইবে, মানবচিত্তরূপ পদার্থের অন্তর্নিহিত কোন এক শক্তির কথা বলা হইতেছে।

(খ) নূতন কোন পদার্থ নহে

অতএব মানবের যে ধারণা ও জ্ঞান-দায়িনী শক্তির দ্বারা অন্য সকল পদার্থের উপলব্ধি হয়, ধর্ম্মের বিষয়ীভূত স্বতন্ত্র পদার্থের জ্ঞান-দায়িনী স্বতন্ত্র শক্তিও সেই এক ধারণাশক্তিরই বিশেষ অভিব্যক্তি মাত্র। মানবচিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে। এই বিভিন্ন ক্রিয়ার

(গ) সাধারণ ধারণা শক্তির বিশেষ এক অভিব্যক্তি মাত্র

জন্য চিত্তের এবং ধারণাশক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি হয়। এই অভিব্যক্তি-সমূহের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাকেই ধারণা ও জ্ঞানের বৈচিত্র্য বলা যায়। ধর্ম্মসম্বন্ধে চিত্তের স্বতন্ত্র কার্য্য হইয়া থাকে। এইজন্য ধর্ম্মজ্ঞানকে স্বতন্ত্রজ্ঞান বলা হয়।

মানবের ধারণা-শক্তির বিবিধ অভিব্যক্তি

মানবচিত্ত যে যে উপায়ে যতপ্রকার কার্য্য করিয়া থাকে, সকলগুলি শ্রেণীবদ্ধ ও শৃঙ্খলাকৃত করিলে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ধারণাশক্তির অভিব্যক্তি তিন শ্রেণীর অন্তর্গত, সুতরাং মানবের জ্ঞান ত্রিবিধ। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়জ্ঞান—রূপবিষয়ক, শব্দবিষয়ক, গন্ধবিষয়ক, স্পর্শবিষয়ক, এবং রসবিষয়ক যাবতীয় জ্ঞান এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই জ্ঞানসমূহ চিত্তের এবং ধারণাশক্তির বিশেষ এক প্রকার কার্য্যের উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তি-প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান। তৃতীয়তঃ, ধর্ম্মজ্ঞান—ধর্ম্মের বিষয়ীভূত পদার্থগুলির জ্ঞানলাভের জন্য চিত্তের বিশেষ একপ্রকার কার্য্য হইয়া থাকে। চিত্তের অন্যবিধ ক্রিয়ায় এই জ্ঞান জন্মিতে পারে না।

(১) ইন্দ্রিয়-জ্ঞান
(২) যুক্তি-জ্ঞান
(৩) ধর্ম্ম-জ্ঞান

এই ত্রিবিধ অভিব্যক্তির প্রত্যেকটারই দুই অবস্থা—(১) অঙ্কুরের অবস্থা, (২) পরিণতির বা চরম অবস্থা। ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রথম অবস্থায় অস্ফুট ও অবিকশিতরূপে থাকে, পরে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়। যুক্তিজ্ঞান এবং ধর্ম্মজ্ঞানও এইরূপ ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে। মানবের চিত্তে এবং ধারণাশক্তিতে সকল জ্ঞানেরই বীজ নিহিত আছে। ইহাদের বিকাশ হইলেই ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন স্থলে এই জ্ঞানসমূহ কেবলমাত্র অব্যক্ত,

প্রত্যেক জ্ঞানই পরিণতি লাভের পূর্ব্বে আঙ্কুরিক অবস্থায় থাকে

গূঢ় ও আঙ্কুরিক অবস্থায়ই থাকিয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্মজ্ঞানও অনেক সময়ে অতি অস্ফুট বীজাবস্থায়ই থাকিতে পারে।

এই ত্রিবিধ অভিব্যক্তি ও জ্ঞান বিভিন্ন বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানই সকল জ্ঞানের ভিত্তি। ইহার উপর অপর দুই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। যুক্তিজ্ঞান ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিশেষ এক পরিণতি-মাত্র। একই মানবচিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার কারণ হয় বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিয়াই যুক্তিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করে। সেই-রূপ ধর্ম্মজ্ঞানও ইন্দ্রিয় এবং যুক্তিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও যুক্তিজ্ঞান এমন অবস্থায় উপনীত হইতে পারে যে সেই অবস্থায় ধর্ম্মের বিষয়ীভূত পদার্থগুলির উপলব্ধি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। মানবের চিত্ত ও ধারণাশক্তি যদি সেই অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মজ্ঞান বলিয়া কোন জ্ঞান জন্মিতে পারেনা।

ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের ভিত্তির উপর অপর দুই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত

ধর্ম্মের বিশিষ্ট বিষয় – অসীম

ধর্ম্মের বিবিধ অভিব্যক্তি সমূহের মধ্যে বিশেষ ভাবে ধর্ম্মেরই বিষয়ী-ভূত যে স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়, সেই পদার্থটি— অসীম। মানবের ধারণাশক্তি নানা ভাবে, নানা নামে, নানা উপকরণের মধ্য দিয়া সেই অসীমের উপলব্ধি করিতে প্রয়াসী হইয়াছে, এবং এই উপায়ে নানা ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে। সকল ধর্ম্মেই অচিন্ত্যকে চিন্তা করিবার এবং অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবার জন্য মানবের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। অনন্ত ঐশ্বর্য্যকে ধারণা করিবার জন্যই মানব-চিত্তের উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে। ঈশ্বর-প্রেমেই মানবহৃদয়কে ব্যাকুল করিয়াছে।

এই অসীমকে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা যায়না। ইহার স্বরূপ

দৃষ্টির গোচর নহে। কেহ কেহ ইহাকে অতি-মানব ও প্রকৃতির অতীত বলিয়া থাকেন। এজন্য দেশ-কাল-পাত্রের অনায়ত্ত, সর্ব্বাবস্থা-বিবর্জ্জিত, সকল-পরিবর্ত্তন-রহিত বিষয়কে অসীম বলা যায়। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা এরূপ বিষয়ের উপলব্ধি হইতেই পারে না। যাহার আদি ও অন্ত আছে, সুতরাং যাহা সামাবদ্ধ, কেবল তাহাই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের আয়ত্ত বিষয়। যুক্তি-জ্ঞানের দ্বারাও এরূপ অনির্দ্দিষ্ট, অদৃশ্য, সামাবিহীন বিষয়ের উপলব্ধি হইতে পারে না, কারণ যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়ের গোচর সেই সকল পদার্থই যুক্তি-জ্ঞানেরও বিষয়। সুতরাং অসীম বলিলে ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও যুক্তি-জ্ঞানশক্তির অতীত বিষয়ই বুঝিতে হইবে। সেই বিষয় অলীক বা কাল্পনিক নহে, তাহারও অস্তিত্ব আছে।

অসাম সম্বন্ধে জ্ঞান

কিন্তু এরূপ লক্ষণবিশিষ্ট অসীমের জ্ঞান সম্ভবপর কি না, এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। তাঁহারা মনে করেন, মানব এবম্বিধ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না, সুতরাং পৃথিবীতে ধর্ম্মের অস্তিত্ব অসম্ভব। অসীমের উপলব্ধিই যখন ধর্ম্মের একমাত্র অঙ্গ এবং মানবের পক্ষে এই অসীমের ধারণা যখন একেবারে অসম্ভব, তখন ধর্ম্মের প্রকৃতি-বিশ্লেষণ বা ধর্ম্মের উৎকর্ষানুকর্ষ আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

(১) সম্ভবপর নহে, সুতরাং ধর্ম্মের অস্তিত্ব অসম্ভব, যেহেতু—

তাঁহারা মানবের চিত্ত সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা করেন, সেই ধারণাই এই মতবাদের কারণ। তাঁহাদের বিবেচনায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানই সকল জ্ঞানের ভিত্তি। ইন্দ্রিয়শক্তির দ্বারা মানবের দৃষ্টি, স্পর্শ ও শব্দের জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞান তাহার সর্ব্ববিধ জ্ঞানের মূলাধার। এই সকল জ্ঞানের তুলনা সাধন ও সামঞ্জস্য বিধান করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ও শৃঙ্খলীকৃত করিলে মানবের যে

(ক) ইন্দ্রিয়-জ্ঞানই সকল জ্ঞানের ভিত্তি

নূতন জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই জ্ঞানের বাস্তবিক কোন প্রকৃতিগত নূতনত্ব নাই। ইহা ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানের রূপান্তরমাত্র।

ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকেই সকল জ্ঞানের ভিত্তি এবং ইন্দ্রিয়সমূহকেই জ্ঞানের মৌলিক দ্বার স্বীকার করিয়াও অসীমের উপলব্ধি এবং ধর্ম্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। কিন্তু ইহাঁদিগের বিবেচনায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবলমাত্র সসীমের উপলব্ধি সম্ভবপর। ইন্দ্রিয়গণ যে পদার্থসমূহের জ্ঞান আনয়ন করে, তাহারা সীমাবিশিষ্ট। অসীম বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতেই পারে না, কেবল অনস্তিত্বসূচক একটা উপসর্গ যোগ করিয়া ভাষার প্রভাবে একটী নূতন শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র।

(খ) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবলমাত্র সসীমেরই উপলব্ধি হয়

যাঁহারা অসীমের উপলব্ধি এবং ধর্ম্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান্, মানবের ইতিহাস আলোচনা করিলে তাঁহাদের সন্দেহ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে। ইন্দ্রিয় ও যুক্তিজ্ঞানের দ্বারা মানব যে যে সত্যের উপলব্ধি করিয়াছে, তদতিরিক্ত সত্যেরও উপলব্ধির প্রমাণ ইতিহাসে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। Fetish-পূজকেরা কেবলমাত্র দৃশ্যমান ও স্পৃশ্যমান প্রস্তরাদি পদার্থেরই আরাধনায় আবদ্ধ নহে—কিন্তু ধরা ছোঁয়া যায় না এরূপ বিষয়েও বিশ্বাসবান্। প্রকৃতির পূজকদিগের চক্ষে নদী, পর্ব্বত এবং বৃক্ষসমূহই পূজনীয় বস্তু নহে—ইহাদিগের অতীত স্থূলতঃ অদৃশ্য ও অতীন্দ্রিয় পদার্থসমূহই দেবতা-রূপে পূজা প্রাপ্ত হয়। দৃশ্যমান মেঘ বা শ্রাব্যমাণ বজ্র বা স্পৃশ্যমান বায়ু মানবের ধর্ম্মভাব জাগরিত করিয়া তাহাদের ভক্তির উদ্রেক করে না—মেঘ ও বৃষ্টির প্রেরয়িতা অদৃশ্য, বজ্রের নিয়োগকর্ত্তা অশ্রাব্য এবং বায়ুর চালক অস্পৃশ্য। এই অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, অতীন্দ্রিয় কারণসমূহই মানবের দেবতা।

(২) সম্ভবপর,—যেহেতু—(ক) মানবের ইতিহাস অতীন্দ্রিয় এবং অসীমের উপলব্ধির সাক্ষী

কিন্তু মানবের ইতিহাস স্থানে স্থানে অতীন্দ্রিয় এবং অসীমের উপ-

লব্ধির সাক্ষী হইলেও সর্ব্বত্র সকল কালেই যে মানব ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অসীমের, ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে, এরূপ বলা যায় না। সুতরাং কেবলমাত্র ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম্ম-সংশয়ীদিগের মত খণ্ডন করা সুকঠিন। মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহাঁদিগের যেরূপ ধারণা আছে, প্রকৃত মনস্তত্ত্বের দ্বারা তাহার ভ্রম প্রদর্শন করিতে পারিলেই তাঁহাদিগের সংশয় দূরীভূত হইতে পারে। প্রকৃত মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানই সকল জ্ঞানের ভিত্তি বটে, ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণ অগ্রাহ্য বটে, এবং সর্ব্ববিধ জ্ঞান ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে মৌলিক জ্ঞানরূপে ব্যবহার করিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞানলাভ হয় তাহা কেবলমাত্র সসীমই নহে। বলা বাহুল্য যে আমরা যাহা দেখি, শুনি ও স্পর্শ করি প্রত্যেকটীরই আদি আছে, অন্ত আছে, এবং এই আদি ও অন্তের উপলব্ধি করিয়াই আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে। আমরা যে পদার্থ দৃষ্টিগোচর করি, অন্য পদার্থ হইতে তাহার বিভিন্নতা, তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব, তাহার আরম্ভ ও শেষ প্রভৃতি জ্ঞাপক চতুঃসীমার উপলব্ধি করিয়া তাহাকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ ভাবে আয়ত্ত করি। সেইরূপ যে বর্ণ দেখি বা যে শব্দ শ্রবণ করি, সেই বর্ণের ও শব্দের আরম্ভ ও শেষ, তাহারা কোন্ কোন্ বর্ণ ও ধ্বনির অন্তর্গত, ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান জন্মে বলিয়া বর্ণ ও শব্দ আমাদের ইন্দ্রিয়ের আয়ত্ত হয়।

(খ) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবলমাত্র সসীমের উপলব্ধি হয় না, অসীমেরও উপলব্ধি হয়

এই অসীম দ্বিবিধ

কিন্তু সসীম শব্দ ও আলোক প্রভৃতির উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রিয়-গুলি সীমার বহির্ভূত অদৃশ্য ও অশ্রাব্য পদার্থের প্রভাবও অনুভব করিতে

থাকে। যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সসীমের জ্ঞান জন্মে, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই অসীমেরও,—যাহা দেখা যায় না, শুনা যায় না, ছোঁয়া যায় না, এইরূপ পদার্থেরও—অস্তিত্বের জ্ঞান লাভ হয়। যে পদার্থসমূহের চতুঃসীমা, অন্যান্য পদার্থ হইতে যাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য, আরম্ভ ও শেষ প্রতীয়মান হয়—সেই সকল পদার্থের উপলব্ধি হইতে হইতেই ক্রমশঃ মানব এক অনন্ত, অসীম, অতীন্দ্রিয়, অতি-প্রাকৃত ও অতি-মানবীয় বিষয়ের ধারণা করিতে অভ্যস্ত হয়। মানবের দৃষ্টি আকাশের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে, সুতরাং আকাশের অতি অল্প অংশমাত্রই তাহার দৃষ্টিগোচর হয়। যত দূর

(১) অতি বৃহৎ

পর্য্যন্ত তাহার দৃষ্টি পৌছে, তাহার পর হইতে এক সীমাবিহীন অনন্ত অদৃশ্য বিশ্বের ধারণা স্বতই উৎপন্ন হয়। সেই অসীমকে অন্য পদার্থের সহিত তুলনা করা অসম্ভব, ইহার গণনা করা অসাধ্য, ইহাকে কোন উপায়ে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা যায় না। ইহার প্রকৃতি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা সাধ্যাতীত—তথাপি মানব ইহার প্রভাব অনুভব করে—ইহার অস্তিত্ব স্বীকার অতি স্বাভাবিক। সেইরূপ মানবের কর্ণ আকাশের যে পরিমাণ স্পন্দন অনুভব করিয়া ধ্বনির উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, তদতিরিক্ত স্পন্দন ও উচ্চতর ধ্বনি তাহার ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। অথচ সে তাহাদের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে। সুতরাং দৃশ্যমান ও শ্রাব্যমাণ জগতের যে গণ্ডীর মধ্যে মানব আবদ্ধ রহিয়াছে—যাহাদিগকে মানব কোন মতেই অতিক্রম করিতে পারে না, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি করিলেও যাহাদের অতি সামান্য অংশমাত্রই সাক্ষাৎজ্ঞানের বিষয় হয়, সেই গণ্ডীর একদিকে অসীম ও অপর দিকে সসীম সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে—তাহার দ্বারা সীমানির্দ্দিষ্ট জগৎ, সীমার বহির্ভূত জগত হইতে পৃথক্‌কৃত হইয়াছে। এ জন্য যে ক্ষণে এবং যে শক্তিদ্বারা মানব সীমাবদ্ধ জগতের জ্ঞান লাভ করে, সেই ক্ষণেই এবং সেই শক্তিদ্বারাই সীমাহীন জগৎও তাহার ধারণার বিষয়ীভূত হইয়া

পড়ে। সুতরাং অসীমের উপলব্ধি সসীমের জ্ঞানের সঙ্গে যুগপৎ সাধিত হয়।

মানব একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমাবিহীন অতি-বৃহতের সম্যক্ ধারণা করিতে না পারিয়া এক অসীম অনন্তের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অপর দিকে সসীম জগতেরই অতি ক্ষুদ্র পদার্থসমূহও তাহার ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় না। মানবের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ একদিকে অতি বৃহৎ ও অপরদিকে অতি ক্ষুদ্র—এই দুই সীমার মধ্যে আবদ্ধ। তাহার সাক্ষাৎ জ্ঞানের গণ্ডী এই দুই সীমার কোনটীই অতিক্রম করিতে পারে না। মানব আকাশের কিয়দংশমাত্রের উপলব্ধি করিতে পারে—বিশ্বের কয়েকটী ধ্বনিমাত্র শুনিতে পায়, কয়েকটী বর্ণমাত্র দেখিতে পায়। মানবের ইন্দ্রিয়সমূহ এরূপভাবে গঠিত যে, ধ্বনি ও বর্ণ ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্রতর হইতে আরম্ভ করিলে এমতাবস্থায় আসিয়া উপনীত হইতে পারে যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ব্যবহারদ্বারা ইন্দ্রিয়শক্তির সহায়তাবিধান করিলেও বিশেষ ফললাভ হয় না। পদার্থসমূহ এত ক্ষুদ্র হইতে পারে যে, কোন উপায়েই তাহাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং একদিকে যেমন মানবের পক্ষে বৃহত্তমের দিকে এক মহান্ অনন্ত তাহার ইন্দ্রিয়কে পরাজিত করিয়া রহিয়াছে, সেইরূপ অপর দিকে ক্ষুদ্রতম পদার্থবিশিষ্ট অনন্ত জগৎ তাহার ইন্দ্রিয়শক্তিকে ব্যর্থ করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। মানবের ইন্দ্রিয়গোচর জগতের এক সীমা বৃহত্তম অনন্ত হইতে ইহার পার্থক্য সাধন করিয়াছে, অপর সীমা ক্ষুদ্রতম অনন্ত হইতে বিভিন্নতা সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং যে ক্ষণে এবং যে শক্তির দ্বারা এই গণ্ডীর অন্তর্গত সীমাবদ্ধ জগৎ মানবের জ্ঞানের আয়ত্ত হয়, সেই ক্ষণে এবং সেই শক্তির দ্বারাই ক্ষুদ্রতম অসীম এবং বৃহত্তম অসীমেরও জ্ঞান জন্মে।

(২) অতি ক্ষুদ্র

এই আলোচনার ফলে জানা গেল যে, প্রথমতঃ, অসীম অলীক পদার্থ

নহে—ইহার অস্তিত্ব আছে ; দ্বিতীয়তঃ, ইহার উপলব্ধি অসম্ভব নহে—অতি স্বাভাবিক ; তৃতীয়তঃ, এই উপলব্ধি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই সাধিত হয় ; এবং চতুর্থতঃ, সীমার উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই অসীমেরও উপলব্ধি হয়, সসীমের জ্ঞান অসীম জ্ঞানের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবেই জড়িত, এমন কি অসীমের উপলব্ধি না হইলে সীমার গণ্ডী ও সীমাগুলি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না।

অসীমের জ্ঞানের ক্রমিক বিকাশ

সসীমের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই অসীমও মানবের জ্ঞেয় হইয়া পড়ে বটে এবং মানবচিত্ত যুগপৎ সীমাবদ্ধ ও সীমাবহির্ভূত পদার্থের ধারণা করে বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সসীম জগতের জ্ঞানের মধ্যে অসীম বিশ্বের জ্ঞান সর্ব্বদা এবং সকল স্থলেই অতি স্পষ্ট ও পরিষ্কাররূপে থাকে না। কখনও অসীমের ইঙ্গিতমাত্র পাওয়া যায়—সাধারণতঃ ইহা অস্পষ্ট, অব্যক্ত ও অস্ফুট অবস্থায় থাকে। অনন্ত সাগরের অসীম বিস্তৃতি দেখিয়া মানবের যে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়, অথবা প্রাতঃসূর্য্যের প্রথম দীপ্তি দেখিয়া মানবের চিত্ত যে অভিনব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, সেই বিস্ময় ও আনন্দের মধ্যে এই অসীমের উপলব্ধির চিহ্ন বর্ত্তমান। অসীমকেই নানা ভাবে সাক্ষাৎ করিয়া, অনন্তেরই নানা অভিব্যক্তির পরিচয় পাইয়া, ইহার বিবিধ ভাবের উপলব্ধি করিয়া মানবহৃদয় স্বভাবতঃ নানা প্রকারে উত্তেজিত হয়। এই উত্তেজনার মধ্যে অসীমের জ্ঞানের বীজ নিহিত রহিয়াছে।

মানব প্রথম হইতেই অসীমের সংস্পর্শেই রহিয়াছে এবং জ্ঞানোদয়ের আরম্ভ হইতেই অসীমের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়াছে। সসীম ইন্দ্রিয়শক্তির দ্বারা মানব প্রথম হইতেই অসীম বিশ্বের নিগূঢ় তত্ত্বের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিয়াছে—ইহাকে নানা ভাবে উপলব্ধি করিয়া, ইহার নানা অভিব্যক্তির সম্মুখীন হইয়া ইহাকে স্পষ্ট, নির্দ্দিষ্ট ও পরিষ্কার রূপে

জ্ঞানের আয়ত্ত করিবার প্রয়াসী হইয়াছে। মানবচিত্তের এইরূপ প্রয়াস-সমূহ ধর্ম্মের ইতিহাসের প্রধান ঘটনা।

কখনও নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, কোথাও বা বায়ু, অগ্নি, বজ্র, কখনও বা আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির মধ্যে মানব অসীমের অনুসন্ধান করিয়াছে; ইহাকে অন্নদাতা, বৃষ্টিদাতা, আলোকদাতা, জীবনদাতা প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত করিয়া নানা উপায়ে ইহার উপাসনা করিয়াছে এবং অবশেষে স্রষ্টা, প্রজাপতি, পিতা, দেবতা, আদিকারণ, অনন্ত, অজ্ঞেয়, অজ্ঞাত, প্রভৃতির ধারণা করিয়া পূর্ণতাপ্রাপ্ত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বিভিন্ন মানবসমাজ বিভিন্ন উপায়ে অসীমের ধারণা করিয়াছে এবং এই ধারণা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রণালীতে অভিব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়াছে। অসীমকে উপলব্ধি করিতে যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন পথে ধাবিত হইয়াছে। অসীমের অনুসন্ধানের বিভিন্ন চেষ্টাসমূহই ধর্ম্মের ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়—অসীমের উপলব্ধির ক্রম-বিকাশই ধর্ম্মের ইতিহাস।

ভাষা-বিজ্ঞান

ভাবের উৎপত্তি

জগতের বিভিন্ন পদার্থ মানবচিত্তের উপর কার্য্য করিয়া এক একটী ভাব ও চিন্তার সৃষ্টি করে। এই পদার্থসমূহই মানবের চিন্তার বিষয়।

চিত্তের উপর বিশ্বের কার্য্য

প্রাকৃতিক জগতের বিবিধ শ্রাব্য ও দৃশ্য বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া মানব জল, স্থল ও নভোমণ্ডলের বিভিন্ন পদার্থের বিষয়ে চিন্তা করে। এইরূপে সমস্ত স্থূল বিশ্ব তাহার ভাবরাজ্যের আয়ত্ত হইয়া পড়ে। সেইরূপ মানবের সমাজ, রাষ্ট্র, বৈষয়িক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি মানববিষয়ক যাবতীয় পদার্থই এক একটী চিন্তার উদ্রেক করে। ইহাদের সংস্পর্শে আসিলে মনে এক একটী ভাবের উদয় হয়। মানবীয় ও প্রাকৃতিক উভয়বিধ জগতের সকল প্রকার তথ্য ও ঘটনা ব্যতীত মানব চিন্তা করিতে পারে না। মানবচিত্ত ইহাদের দ্বারা আন্দোলিত হইয়া ইহাদেরই দ্বারা পূর্ণ হয়। ইহারাই ভাব ও ধারণার কারণ, ইহারাই ভাব ও ধারণার বিষয়।

ভাবের প্রকৃতি

ভাব ও ধারণার বিষয়ীভূত বিশ্বের বিবিধ পদার্থ যখন চিত্তকে আঘাত করে, তখন মানবের নিকট ইহাদের প্রকৃতি ও স্বরূপ প্রতীয়মান হয়,

পদার্থে গুণের আরোপ

মানব ইহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হয়। যখন কোন বিষয়ে চিন্তা করা যায়, অথবা পৃথিবীর কোন পদার্থ যখন মনোরাজ্যের অন্তর্গত হয়, তখন ইহাদের ধর্ম্ম ও গুণগুলি ধরা পড়ে, ইহারা লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া সীমাবদ্ধ ও নির্দ্দিষ্ট হয়।

এইরূপে গুণ ও ধর্ম্মের পরিচয় পাইয়া ইহাদিগকে বিশিষ্ট করা ভাব ও চিন্তার কার্য্য। পরিচয়-প্রদান, স্বরূপের উপলব্ধি, ধর্ম্ম প্রকাশ এবং গুণের আরোপই ভাব ও চিন্তার প্রাণ। বৃক্ষ, পর্ব্বত প্রভৃতি জড় পদার্থ যখন চিন্তার বিষয় হয়, তখন ইহাদের স্থিতি, পরিমাণ, প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। অন্যান্য বৃক্ষাদির সহিত তুলনা সাধন করিয়া, অথবা নিজের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, অথবা বিশ্বের অন্যান্য পদার্থের সহিত সংযোগ বিধান করিয়া, মানব ইহাদিগকে বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত করিয়া তোলে। সেইরূপ চিন্তার দ্বারা সমাজের বিবিধ কার্য্যকলাপের পরস্পর তুলনা সাধিত এবং সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে সমাজের বিভিন্ন পদার্থ-গুলির পরিচয় স্থির ও নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। মানবের এমন কোন ভাবনা বা চিন্তা হয় না, যাহার দ্বারা কোন না কোনও বিষয়ের গুণ বা ধর্ম্ম প্রকাশিত হয় না। তুলনা না করিয়া, সম্বন্ধ স্থাপন না করিয়া, লক্ষণ নির্ণয় না করিয়া, ধর্ম্মবিশিষ্ট না করিয়া কোন ধারণাকার্য্য সমাধা হইতে পারে না। ভাব ও চিন্তার প্রকৃতিই এইরূপ যে, ইহাদের বিষয়ীভূত মানবীয় ও প্রাকৃতিক বিশ্ব সংযোগ, তুলনা প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত ও গুণবিশিষ্ট হয়।

ভাবের ক্রমিক বিকাশ

বিভিন্ন মানবের চিন্তাপ্রণালী ও জ্ঞানবৃদ্ধির পারম্পর্য্য ও পর্য্যায়গুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে মানবের চিন্তাপদ্ধতির কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে।

(১) একবারে একাধিক বিষয়ে ভাবের উৎপত্তি অসম্ভব

প্রথমতঃ, এক সময়ে দুইটী বস্তু চিত্তের উপর কার্য্য করিতে পারে না। সুতরাং মানব একবারে বিশ্বের সর্ব্ববিধ পদার্থই চিন্তার আয়ত্ত করিতে পারে না; সে একসঙ্গে একই আয়াসে সকল গুলির পরিচয় লাভ ও গুণ নির্ণয় করিতে পারে না। তাহাকে বিষয়গুলি বিভাগ

করিয়া এক একটির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই জন্য চিন্তাপদ্ধতির মধ্যে ক্রম ও পৌর্ব্বাপর্য্য থাকিয়া যায়।

(২)
বয়স অনুসারে ভাবের বৈচিত্র্য জন্মে

দ্বিতীয়তঃ, চিন্তার বিষয়ীভূত পদার্থগুলির মধ্যে এমন বিশেষত্ব ও পরস্পর বৈসাদৃশ্য আছে যে, মানবের বিভিন্ন বয়সে তাহার চিত্তে ইহাদের কার্য্য হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বয়সে মানব ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পদার্থের চিন্তা করিতে পারে। সকল অবস্থায়ই কোন পদার্থের সকল প্রকার ধারণা সম্ভবপর হয় না। এ জন্য ভাবের ক্রমিক বিকাশ বয়োবৃদ্ধি এবং ধারণা-শক্তির বিকাশের উপর নির্ভর করে।

(৩)
পরিচিত ভাবের ভিত্তির উপর নূতন ভাবের প্রতিষ্ঠা হয়

তৃতীয়তঃ, পুরাতন ভাব ও ধারণার ভিত্তি অবলম্বন না করিয়া, প্রতিষ্ঠিত সুপরিচিত চিন্তার সাহায্য গ্রহণ না করিয়া মানব নূতন ধারণা, নূতন ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। পরিচিত পদার্থসমূহের দ্বারা চিত্তের উপর যে যে কার্য্য হইয়াছে, এবং তাহার ফলে পৃথিবীর স্বরূপ সম্বন্ধে, পদার্থের গুণ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মিয়া রহিয়াছে, সেই চিন্তা-কার্য্যসমূহ ও জ্ঞানের সহিত তুলনা সাধন করিয়া, তাহাদিগকে ব্যবহার করিয়া এবং তাহাদের সহিত সংযোগ বিধান করিয়া, মানব অপরিচিত নূতন পদার্থের জ্ঞান লাভ করে; এই নূতন পদার্থের দ্বারা চিত্তের উপর যে কার্য্য হয়, তাহার প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং নূতন লক্ষণ ও গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য মানব প্রথমেই অপরিচিত পদার্থের, এবং দূর ভবিষ্যৎ বা দূর অতীতের বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে না। অপরিচিত আয়ত্ত করিবার পদ্ধতির মধ্যে ক্রম ও পৌর্ব্বাপর্য্য থাকিয়া যায়।

চতুর্থতঃ, মানব প্রথমেই চিন্তার বিষয়ীভূত পদার্থগুলির সর্ব্ববিধ গুণ ও ধর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে না। এক সঙ্গেই অথবা এক বয়সেই সে পদার্থের সহিত পদার্থের তুলনা সাধন বা সংযোগ বিধান

করিয়া, পদার্থের সহিত নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ইহাদের সকল প্রকার ধর্ম্ম ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। এই গুণারোপ এবং ধর্ম্ম প্রকাশেও ক্রম এবং পৌর্ব্বাপর্য্য আছে। একাধিক পদার্থ যেমন এক সময়ে মানবের চিন্তার বিষয় হইতে পারে না, সর্ব্ববিধ বিষয়ই যেমন যে কোনও এক বয়সে মানবের আয়ত্ত হইতে পারে না, এবং দূর, অতীত, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি অপরিচিত পদার্থসমূহ যেমন প্রথমেই মানবের চিত্তের উপর কার্য্য করিয়া তাহার নিকট পরিচিত, লক্ষণাক্রান্ত, ধর্ম্মসংযুক্ত ও বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না; সেইরূপ মানব কোন পদার্থের একাধিক গুণ একবারে এক সঙ্গেই উপলব্ধি করিতে পারে না, সর্ব্ববিধ গুণই যে কোন এক বয়সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, এবং প্রথমেই স্থূল, সূক্ষ্ম, জটিল প্রভৃতি বিচিত্র লক্ষণসমূহ ধারণা করিতে পারে না। বয়োবৃদ্ধি এবং চিন্তাশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও চিন্তার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। ক্রমশঃ ইহারা জটিল ও সূক্ষ্ম হইয়া বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হয়।

(৪) একবারে কোন পদার্থ সম্বন্ধে একাধিক ভাবের উৎপত্তি অসম্ভব

পঞ্চমতঃ, প্রথমেই ধারণাসমূহের মধ্যে শৃঙ্খলা বা সামঞ্জস্য থাকে না। প্রথমাবস্থায় পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন গুণগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতীয়মান হয়। ক্রমশঃ তুলনার দ্বারা ইহাদের মধ্যে যোগ সাধিত ও সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উপায়ে পদার্থ ও গুণের বৈচিত্র্য ও জটিলতার মধ্যে প্রণালী ও নিয়ম আবিষ্কৃত হয়, এবং লক্ষণ ও ধর্ম্মসমূহ শৃঙ্খলীকৃত হইয়া ভাবগুলিকে সুসম্বদ্ধ করে।

(৫) ভাব ক্রমশঃ প্রণালী-বদ্ধ ও শৃঙ্খলীকৃত হয়

ভাব ও ভাষা

মানব নিজের মনোগত ভাব সমাজ কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিবার জন্য কতকগুলি ইঙ্গিত অবলম্বন করে। যে সকল ইঙ্গিত

ব্যবহার করিয়া সমাজস্থ অধিকাংশ লোকে তাহাদের মনোভাব প্রকাশ করে এবং পরস্পরের চিন্তা-কার্য্যে সাহায্য করে, সেই ইঙ্গিতসমূহের দ্বারা তাহাদের ভাষা গঠিত হয়। যদি পৃথিবীতে একজন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি না থাকিত, যদি সমাজ বা সঙ্ঘ বলিয়া কোন পদার্থ গঠিত না হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর বিবিধ বস্তু তাহার চিত্তের উপর কার্য্য করিয়া তাহাকে বিশ্ব সম্বন্ধে যেরূপ চিন্তা করাইত তাহা প্রকাশিত হইবার কোন কারণ থাকিত না. তাহা হইলে ভাষা-সৃষ্টির প্রয়োজন হইত না। কিন্তু মানব যে প্রণালীতে গঠিত হইয়াছে তাহাতে সমাজের আবশ্যকতা আছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের মানবীয় ও প্রাকৃতিক পদার্থসমূহের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক জন যাহা উপলব্ধি করে, অপরকে তাহা ব্যক্ত করিয়া তৎসম্বন্ধে তাহার মনোভাব গ্রহণের প্রয়োজন আছে। সুতরাং ভাব ও ধারণার আদানপ্রদানের উপায়ের প্রয়োজন আছে। এ জন্য এতদুপযোগী ইঙ্গিতসমূহ বা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। এই ইঙ্গিতসমূহের মধ্যে মানব ধ্বনি ও বচনের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া বাচনিক ইঙ্গিত বা কথাই প্রধানতঃ ও মুখ্যতঃ ভাষা নামে অভিহিত হয়।

সাধারণ্যে গৃহীত ভাব-প্রকাশোপযোগী ইঙ্গিত সমূহের নাম ভাষা

যদিও ভাষা বা ইঙ্গিতসমূহ ব্যতীত পরস্পর মনোভাব ব্যক্ত করা অসম্ভব, তথাপি ভাষা উপায়মাত্র, উদ্দেশ্য ভাব-প্রকাশ। অর্থ আছে বলিয়াই বাক্যের প্রয়োজন। বৃক্ষ, পর্ব্বত, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের দ্বারা চিত্তের আন্দোলন জন্মে বলিয়া, এবং এ জন্য ইহাদের গুণনির্ণয়, লক্ষণ-নির্দ্দেশ এবং প্রকৃতি-পরিচয় ও স্বরূপোপলব্ধি হয় বলিয়াই, ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়া, বাক্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, ভাষা ব্যবহার করিয়া ইহাদিগকে ব্যক্ত করিতে হয়। অতএব ভাবই ভাষার প্রাণ।

ভাষা উপায় মাত্র, লক্ষ্য ভাব ব্যক্ত করা

সুতরাং ভাষার প্রকৃতি, উৎপত্তি ও ক্রমিক বিকাশ ভাবের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও ক্রমিক বিকাশের অনুরূপ। ভাষা সকল বিষয়ে ভাবেরই অনুসরণ করে।

ভাষার ইতিহাস ভাবের ইতিহাসের অনুরূপ

এই জন্য ভাব ও ধারণার কারণ ও বিষয়সমূহ ভাষার মধ্যে, কথার দ্বারা, ইঙ্গিতের ভিতর দিয়া ধ্বনির সাহায্যে প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক জগৎ ও মানবীয় জগতের তথ্য ও ঘটনাসমূহই মানবের ভাষার বিষয়। মানব যখন কোন ইঙ্গিত ব্যবহার করে বা কোন কথা বলে, তখন এই বিশ্বের বিবিধ পদার্থই তাহার কথা বা ইঙ্গিতের বিষয়ীভূত হয়। এই সমুদয় ছাড়িয়া দিয়া তাহার কোন ভাষা বা বাচনিক কার্য্য সমাধা হয় না। বিশ্বের দ্বারা তাহার মনের উপর যে কার্য্য হয় সেই সমুদয়ই তাহার ভাষার বিষয় ও কারণ। তাহার কথা ও ইঙ্গিতসমূহ এই বিশ্বের বিবিধ ঘটনাবলীর দ্বারাই পূর্ণ। সুতরাং ভাব যেরূপ মানব-ও প্রকৃতি-বিষয়ক, ভাষাও সেইরূপ মানব-ও প্রকৃতি-বিষয়ক।

ভাষার বিষয় – মানবীয় ও প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন ঘটনাবলী

ভাষার প্রকৃতি ও লক্ষণ

আবার ভাবের প্রকৃতি যেমন পদার্থে গুণের আরোপ করা, ভাষার প্রকৃতিও সেইরূপ সমাজে পদার্থের গুণ ব্যক্ত করা। মানব কথা বলিয়া এবং ইঙ্গিত ব্যবহার করিয়া মানবের নিকট পদার্থসমূহের তুলনা করে, সংযোগ সাধন করে, এবং নানা উপায়ে ইহাদের ধর্ম্ম ব্যক্ত করে। মানবের ভাষার ভিতর দিয়া ইহাদের প্রকৃতি ও পরিচয় সমাজে প্রকাশিত হয়। মানব যখন কোন কথা বলে, তখন সে কোন পদার্থের অন্ততঃ একটী ধর্ম্ম প্রকাশ করে। এমন কোন কথা হইতে পারে না যাহার

কোন পদার্থ সম্বন্ধে বক্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য

দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে বিশেষণ ব্যবহার করিয়া তাহাকে বিশিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট করা হয় না।

একটী মাত্র ধ্বনির সাহায্যে, একটী মাত্র পদ ব্যবহার বা শব্দ প্রয়োগ করিয়া মানব তাহার চিত্তের উপর কোন পদার্থের কার্য্য, অথবা কোন বস্তু বা ব্যক্তির গুণ নির্ণয় বা পরিচয় প্রকাশ করিতে পারে না। প্রকৃতভাবে পরিচয় প্রদান ও স্বরূপ বর্ণনা করিতে হইলে, এবং যথার্থভাবে গুণ বা লক্ষণসমূহ ব্যক্ত করিতে হইলে অন্ততঃ একটী পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করিতে হয়। এই বাক্যের দুইটী অঙ্গ থাকে। বিশ্বের যে পদার্থের দ্বারা ভাবের উদ্রেক হয় এবং যে পদার্থ সম্বন্ধে গুণের আরোপ আবশ্যক হয়, সুতরাং যে বিষয়সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন হয়, সেই বিষয়-বাচক ধ্বনি বা শব্দ একটী অঙ্গ; এবং সেই পদার্থের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মানবচিত্ত যেরূপ আন্দোলিত হয়, এবং এই আন্দোলনের ফলে তৎসম্বন্ধে যে গুণ আরোপ করা হয়, সুতরাং তাহার পরিচয় স্বরূপ যাহা বলিবার প্রয়োজন হয়, সেই বক্তব্যবাচক ধ্বনি বা শব্দ অপর অঙ্গ। কেবল একটী মাত্র ধ্বনি প্রয়োগ করিলে কোন পদার্থের সহিত তাহার গুণের সংযোগ করা হয় না, পদার্থের তুলনা-সাধন বা সংযোগ-বিধান হয় না, অথবা নিজের সহিত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং তুলনা-সাধন, ও গুণারোপ যেমন ভাবের প্রকৃতি, সেইরূপ শব্দযোজনা, পদ-সংযোগ এবং বাক্যরচনাই ভাষার লক্ষণ ও প্রকৃতি। কোন বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধি না করিলে, পদার্থের সহিত তাহার ধর্ম্মের সংযোগ না করিলে যেরূপ চিন্তাকার্য্য হয় না, সেইরূপ শব্দযোজনার দ্বারা বাক্য রচনা না করিলে কোন ভাষা সিদ্ধ হয় না। **পদবিশিষ্ট বাক্যই ভাষার মৌলিক উপাদান।** ভাষা কতকগুলি শব্দের সমষ্টি নহে। কেবল-মাত্র শব্দ ব্যবহার করিলেই ভাষা ব্যবহার করা হয় না। যেখানে

শব্দযোজনার দ্বারা বাক্যরচনা

বাক্যপরম্পরা অথবা অন্ততঃ একটী মাত্র বাক্যের প্রয়োগ নাই সেখানে ভাষার অস্তিত্ব নাই।

ভাষার ক্রমিক বিকাশ

ভাবই ভাষার ভিতর দিয়া ব্যক্ত হয় বলিয়া ভাষার ক্রমিক অভিব্যক্তি ভাবের ক্রমবিকাশের অনুরূপ। বিভিন্ন মানবের ভাবপ্রকাশপ্রণালী এবং বিভিন্ন মানবসঙ্ঘের ভাষার পরিপুষ্টির পারম্পর্য্য ও পর্য্যায়গুলি আলোচনা করিলে ভাষার বিকাশ সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা যায়। দেখা যায় যে চিন্তাপদ্ধতির মধ্যে যেমন ক্রম ও পারম্পর্য্য আছে, ভাষার ইতিহাসেও সেইরূপ ক্রম এবং পারম্পর্য্য আছে।

প্রথমতঃ, মানব একই সময়ে দুই বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে বাক্য রচনা করিয়া তাহাদের বিষয়ে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে না। সে একবারে একাধিক বাক্য রচনা করিতে অসমর্থ। এজন্য তাহাকে পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করিয়া অথবা কোন পর্য্যায় বা ক্রম অবলম্বন করিয়া পদার্থের গুণ প্রকাশ করিতে হয়।

(১)
একবারে একাধিক বিষয়ে বাক্যরচনা অসম্ভব

দ্বিতীয়তঃ, মানবের ভাষা একই বয়সে সর্ব্বভাবব্যঞ্জক হইতে পারে না। বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে তাহার বাক্যসমূহ বিবিধ-বিষয়ক হয়। প্রথমেই মানব সকল পদার্থ সম্বন্ধে এবং কোন এক পদার্থের সর্ব্ববিধ গুণ সম্বন্ধে কথা বলিতে পারে না। সে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বাক্য রচনা করিয়া বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে বক্তব্য জ্ঞাপন করে।

(২)
বয়স অনুসারে বাক্য সমূহের বৈচিত্র্য জন্মে

তৃতীয়তঃ, সর্ব্বদা যে সকল শব্দযোজনার দ্বারা বাক্য প্রয়োগ করিয়া মনোভাব প্রকাশ করা হয়, সেই পরিচিত বাক্যসমূহ, এবং সেই

পুরাতন ভাষা অবলম্বন করিয়াই নূতন বাক্য রচিত হয়। সাধারণতঃ যে ভাষা ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তাহাই নূতন ভাষা-সৃষ্টির উপাদান হয়। এই রূপে মানবের ভাষা ক্রমশঃ পরিচিত পদার্থসমূহ হইতে অপরিচিত, দূরস্থ এবং নূতন পদার্থের পরিচায়ক হইতে থাকে।

(৩) পরিচিত বাক্য সমূহের ভিত্তির উপর নূতন বাক্যের প্রতিষ্ঠা হয়

চতুর্থতঃ, মানব কোন পদার্থ সম্বন্ধে একসঙ্গে একই আয়াসে বহুবিধ বাক্য রচনা করিতে পারে না। তাহার বাক্যরচনা যেমন প্রথমেই পৃথিবীর সকল পদার্থ-বিষয়ক হইতে পারে না, তাহার বাক্যপরম্পরা যেমন একই বয়সে সর্ব্বভাবব্যঞ্জক এবং সর্ব্বপদার্থজ্ঞাপক হইতে পারে না, এবং তাহার বাক্যসমূহ যেমন প্রথমেই অপরিচিত নূতন ও অজ্ঞাত পদার্থবিষয়ক হইতে পারে না, সেইরূপ কোন পদার্থ বিষয়ে তাহার বাক্যসমূহ প্রথমেই বহুবিধ এবং নানা শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারে না। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি ও বুদ্ধিবিকাশের সহিত যেমন তাহার ধারণা ও বিচারশক্তির বিকাশ হয়, তেমন তাহার ভাষা প্রথমে সরল ও সহজ থাকে, ক্রমশঃ ইহাতে জটিলতা প্রবিষ্ট হয়।

(৪) একবারে কোন বিষয়ে বহু বাক্যের রচনা অসম্ভব

পঞ্চমতঃ, মানব প্রথমেই অতি শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে কথা বলিতে পারে না। প্রথম অবস্থায় তাহার বাক্যসমূহ অসামঞ্জস্যপূর্ণ, পরস্পরবিরোধী বা সম্বন্ধহীন ভাবে পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্বযুক্ত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে ইহারাই সুসম্বদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ হইয়া প্রবন্ধ ও সাহিত্যের সৃষ্টি করে।

(৫) বাক্যসমূহ ক্রমশঃ প্রণালীবদ্ধ হইয়া সাহিত্যে পরিণত হয়

বাক্যগুলি ক্রমশঃ বিবিধ পদার্থ বিষয়ক ও বিবিধ ভাবব্যঞ্জক

হয়। এই উপায়ে ইহারা ক্রমশঃ সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া জটিলতা লাভ করে। বাক্যসমূহের এইরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি ও ক্রমিক জটিলতা-লাভেই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধিত হয়। সুতরাং মানব ভাষার ভিতর দিয়া ক্রমশঃ বক্তব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। বক্তব্যসমূহের বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষই ভাষার সৌষ্ঠব ও উৎকর্ষের কারণ।

ভাষা-পদ্ধতির বৈচিত্র্য

মানব-সমাজ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জগতের পদার্থ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। এই জন্য বিভিন্ন ভাষাপদ্ধতির ও বাক্য-রচনাপ্রণালীর উদ্ভব হইয়াছে। সর্ব্বত্রই পদার্থের সহিত পদার্থের তুলনা-সাধন ও সংযোগ-বিধান করিয়া পদার্থের গুণনির্ণয় ও পরিচয় প্রদান করা হইয়া থাকে, এবং এ জন্য উদ্দেশ্যের অনুকূল শব্দ-যোজনা-দ্বারা পদের সহিত পদের সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠা করিয়া বাক্য রচনা করা হইয়া থাকে বটে; কিন্তু সর্ব্বত্র কেহই একই উপায়ে এবং একই নিয়মে পদার্থের ধর্ম্মপ্রকাশের উপযোগী পদসমূহের সম্বন্ধ স্থাপিত করেন না। যদি কোন পদার্থের বিষয়ে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হয়, তবে সেই পদার্থ, এবং যাহা বলিবার প্রয়োজন হয় তাহা, এই দুইএর সংযোগ-সাধন বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভাষার উপাদান ও লক্ষণস্বরূপ বাক্যসমূহের উক্ত দুই অংশ, অর্থাৎ বিষয়বাচক ও বক্তব্যবাচক শব্দসমূহ সকল সমাজে একই রীতিতে সংযুক্ত হয় না।

বাক্যে পদসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উপায়

এই বাক্যরচনাপ্রণালীর বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনটী শ্রেণী দেখিতে

পাওয়া যায়। এই জন্য ভাষা-পদ্ধতি ত্রিবিধ। বাক্যের অন্তর্গত বিষয়-বাচক এবং বক্তব্য-বাচক শব্দের সম্বন্ধ ঐ তিন প্রণালীতে সাধিত হইতে পারে।

ত্রিবিধ বাক্য রচনা প্রণালী।

প্রথমতঃ, এক প্রকার পদ্ধতি আছে, যাহাতে বক্তব্য জ্ঞাপন করিবার জন্য যে যে শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন, তাহাদের আকৃতিগত কোন পরিবর্ত্তন বিধান করিতে হয় না, শব্দগুলির কোনরূপ বৈচিত্র্য ঘটাইতে হয় না। শব্দগুলি কেবল কোন নির্দ্দিষ্ট ক্রম অনুসারে উচ্চারিত হইয়াই বাক্যসৃষ্টি করে; তবে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে বাক্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শব্দগুলি সন্নিবিষ্ট হয়। এরূপ বাক্যে একটী বিশেষ অর্থ-প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত কোন একটী শব্দ ক্রমভঙ্গ হইয়া স্থানান্তরিত হইলে, সম্পূর্ণ নূতন ভাব-প্রকাশের ও নূতন বাক্য-সৃষ্টির কারণ হয়। এইরূপ ভাষাপদ্ধতিতে সন্নিবেশ-স্থান দ্বারাই শব্দের অর্থ প্রকাশিত হয়; শব্দগুলির উচ্চারণ করিবার ক্রমই বাক্যের মধ্যে ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেয়।

(১) উচ্চারণ-ক্রমদ্বারা পদ-সমূহের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা

দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি ভাষা-পদ্ধতি আছে, যাহাতে বিষয়বাচক এবং বক্তব্যবাচক শব্দগুলির মধ্যে বিভিন্ন সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য শব্দগুলির রূপ-পরিবর্ত্তন করিতে হয়। যাহারা এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বাক্য ব্যবহার করে, তাহাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট শব্দ সন্নিবেশিত করিতে হয় না। প্রত্যেক পদের অঙ্গেই তাহার সহিত অন্যান্য শব্দগুলির সহিত সম্বন্ধ-প্রকাশক চিহ্ন সংযুক্ত থাকে। এই কারণে শব্দগুলি বাক্যের মধ্যে যে কোন স্থানেই প্রযুক্ত হউক এবং যে কোন ক্রম-অনুসারেই উচ্চারিত হউক, তাহাতে শব্দগুলির কোন অর্থ-বৈষম্য ঘটে না। আকৃতিগত

(২) রূপ-পরিবর্ত্তন দ্বারা শব্দসমূহের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা

পরিবর্ত্তনের চিহ্নস্বরূপ যে সকল বিভক্তি শব্দগুলির অঙ্গে সংলগ্ন থাকে, সেই সমুদয় চিহ্নই শব্দসমূহের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিয়া ভাব-প্রকাশে সহায়তা করে।

(৩) সংযোজনী দ্বারা শব্দসমূহের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা

তৃতীয়তঃ, আর এক শ্রেণীর ভাষা আছে, যাহাতে ভাব প্রকাশ করিতে হইলে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রণালীতে বাক্য রচনা করিতে হয়। ইহাতে শব্দসমূহেব রূপপরিবর্ত্তন করিতে হয় না, অথচ অপরিবর্ত্তিত শব্দসমূহের সন্নিবেশ-স্থান দ্বারাও ইহাতে ভাব প্রকাশিত হয় না। শব্দগুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অর্থ প্রকাশ কবিবার জন্য কতকগুলি সংযোজনীর আশ্রয় গ্রহণ কবিতে হয়। এই সংযোজনীসমূহ দ্বারা পদগুলি শৃঙ্খলীকৃত হইয়া বাক্যের সৃষ্টি করে।

সাহিত্যসেবী *

——০*০——

আধুনিক ভারতে ইউরোপের দান

মালদহেও একটা সম্মিলন হইয়া গেল। এইরূপে শিল্পে, সাহিত্যে ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদগুলি সুবিস্তৃত সমাজের সমগ্রতা ও ঐক্যের উপলব্ধি করিতেছে। ইহাতে প্রাচীন পল্লীগত জীবনের পরিবর্ত্তে এক অভিনব জীবনের বিকাশ হইতেছে।

আমরা আজকাল ক্রমশঃ এক বিচিত্র ঐক্যের সন্ধান পাইতেছি। ধর্ম্মে, সমাজে, আচার-ব্যবহারে আমাদের অনৈক্য ও বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্যের কোন দিনই অভাব ছিল না।

(১) এক-রাষ্ট্রীয়তা

কিন্তু পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষার প্রভাবে আমরা ক্রমশঃ যে অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা প্রধানতঃ ও বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় জীবনের ঐক্য—এক-রাষ্ট্রীয়তা। আধুনিক কালে আমাদের ভারতবর্ষ অভিনব উপায়ে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইতেছে। কেবল তাহাই নহে।

ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা আমাদের স্বকীয় প্রাচীন সভ্যতার নূতন পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি; এবং সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ভারতবাসী তাঁহার স্থান খুঁজিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপীয়েরা যখন ব্যবসায়নীতির বশবর্ত্তী হইয়া ভারতবর্ষে আগমনের পথ আবিষ্কার করে, তখন তাহাদের এই কার্য্য একটী ভৌগোলিক আবিষ্ক্রিয়ামাত্র রূপে বিবেচিত হইত।

---

* উত্তরবঙ্গে সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ-অধিবেশনে পঠিত, পৌষ ১৩১৭।

তাহার পর সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ-রাজ্য লইয়া ইউরোপে রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তাহাতে ভারতবর্ষ আসিয়া ক্রমশঃ ইউরোপীয় জীবন-সংগ্রামের আবর্ত্তে পতিত হইল। তাহার ফলে এক বিচিত্র রাষ্ট্র-নৈতিক ঘটনার সংঘটন—ইংলণ্ডের ভারতসাম্রাজ্য ও ভারতবাসীর অধীনতা। এইরূপে পরের বশে থাকিয়াও ভারতবর্ষ নিজের আত্মাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে। আজ দেখিতে পাইতেছি, সুদূর অতীতের আকস্মিক এক ভৌগোলিক আবিষ্করণ মানবসমাজের এক বিচিত্র জাতির আত্ম-প্রতিষ্ঠার সূচনামাত্র।

(২) জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠা

গভীরভাবে এবং দূরদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমাদের সমাজে কোন অনিষ্টই সাধিত হয় নাই। বরং যাহা কিছু আজকাল আমরা আমাদের অভিনব রাষ্ট্রীয় জীবনের গৌরবের সামগ্রী, আমাদের নূতন জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিষয় বিবেচনা করি সমস্তই আমরা ইউরোপের সহিত সংঘর্ষণে লাভ করিয়াছি।

ইংরাজী শিক্ষা আমাদের দেশে যে উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকুক এবং আমাদের সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রথমে যেরূপ ভাবেই গ্রহণ করুক না কেন,—যখন হইতে আমরা একটুকু স্বাধীনতার সহিত বিজ্ঞান, স্বায়ত্তশাসন, রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রভৃতি বিষয়ক বিদেশীয় ভাবগুলিকে স্বকীয় জাতীয় বিশেষত্বের অঙ্গীভূত করিতে কিয়ৎ পরিমাণে উপযুক্ত হইয়াছি, তখন হইতেই আমাদের বিচিত্র সমাজ সকল বিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। আমরা একে একে স্বাধীন ভাবে জাতীয় মহাসমিতি, কংগ্রেস, সাহিত্যপরিষৎ, শিক্ষাপরিষৎ, বিজ্ঞানপরিষৎ, বিদেশ-প্রেরণ-পরিষৎ প্রভৃতি বিচিত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে উপযোগিতা লাভ করিয়াছি। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম আমাদের চিন্তা

(৩) চিন্তা ও কর্ম্মের বিবিধ কেন্দ্রগঠন

ও কর্ম্মের আন্দোলনে তরঙ্গায়িত হইতেছে। সকল দিকে আমাদের স্বতন্ত্র জীবনীশক্তি বিকাশ লাভ করিতেছে।

এমন কি, বর্ত্তমানযুগে আমাদের সমাজে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, পরোপকার, লোকহিত, মানবসেবা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জগতের সত্যগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার যে সকল নূতন নূতন প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে অনেকটা পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রসূত। আমাদের প্রাচীন উপনিষদ্ ও বেদান্তের উপদেশ আমরা নূতনভাবে ইউরোপের নিকট প্রাপ্ত হইয়া গীতা-প্রচারে, দর্শনালোচনায় এবং নিষ্কাম কর্ম্মে জীবন উৎসর্গীকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের আধুনিক সন্ন্যাসী ও কর্ম্মযোগিগণ মুখ্যতঃ গেটে, কার্লাইল, এমার্সন, রাস্কিন্, টলষ্টয় প্রভৃতি ইউরোপীয় ঋষিগণের শিষ্য। তাঁহাদের চিন্তাগুলি আলোচনা করিতে যাইয়াই আমরা আমাদের ঘরের মহাত্মাদের পরিচয় পাইয়াছি।

(৪) ভাবুকতা

ফরাসী বিপ্লবের সময় হইতে ইউরোপীয়েরা নানা কারণে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের পরে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনচিন্তা, ব্যক্তিত্ববিকাশ, আত্মার পরি-পূর্ণতা, নিম্নজাতির অধিকার, ডিমক্রেসি, সোশ্যালিজ্‌ম্ প্রভৃতি সম্যক্ অবধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার ফলে ইউরোপের সাহিত্যক্ষেত্রে, ব্যবসায়ে,কর্ম্ম ও নৈতিক জীবনে একটা ব্যাপক ও সর্ব্বতোমুখী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। তাহার প্রভাবে সমাজে ভাবুকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং অতিপ্রাকৃত ও অতিমানবীয় ভাব প্রবিষ্ট হইয়া ইউরোপে এক "আফ্‌-ক্লেরাঙ্গ" বা নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। ইউরোপের এই "রোমান্টিক্" বা আধ্যাত্মিক বিপ্লবই আমাদের আধুনিক বৈদান্তিক আন্দোলনের মূল প্রস্রবণ। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীতে এই রোমান্টিক সাহিত্যের প্রভাব ছিল বলিয়া আমরা আমাদের গভীরতর দর্শন-সাহিত্য ও ধর্ম্ম-

তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি—আমাদের সাধুসন্ন্যাসী ও যোগী মহাপুরুষগণকে ভক্তি সহকারে দীক্ষা-গুরুরূপে গ্রহণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছি।

নব্য ভারতের চিত্র

ভারতবর্ষ ইউরোপের নিকট ঋণী—এ কথা স্বীকার করিলে ভারতবর্ষের গৌরবহানির কোন আশঙ্কা নাই। মানবজাতির সভ্যতা এইরূপ পরস্পর আদান-প্রদানেই পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে কতকগুলি সত্য আবিষ্কার করিয়া মানবের সভ্যতা-ভাণ্ডারে দান করিয়াছিল। আজকাল কতকগুলি নূতন সত্যের উপহার লইয়া আধুনিক ইউরোপ মানবজাতির দ্বারে দণ্ডায়মান। মিশরীয়, ব্যাবিলনীয় গ্রীক প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন সমাজ নিজ নিজ দাতব্য দান করিতে করিতেই অতীতের গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। তাহারা স্বতন্ত্র উপায়ে এই আধুনিক সভ্যতা গ্রহণ করিয়া নূতন সত্য দান করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারত এক বিচিত্র অমরতা লাভ করিয়া আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আধুনিক সত্যগুলিকে নিজ বিশেষত্বের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া মানবজাতির ইতিহাসেব এক নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিবার আয়োজন করিতেছে। আধুনিক গ্রীস, আধুনিক মিশর প্রাচীন জীবনের কোন সাক্ষ্যই বহন করে না, কিন্তু আধুনিক ভারত ইউরোপীয় জলে ধৌত হইয়াও প্রাচীনের পারম্পর্য্য রক্ষা করিতেছে। ভারতবর্ষই যথার্থ ভাবে প্রাচীন ও নবীন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনস্থল। এই সঙ্গমক্ষেত্রে যে অপূর্ব্ব সমন্বয়ের সংঘটন হইতেছে, তাহা কেবলমাত্র ইউরোপেরই অভিনয় বা প্রাচীন ভারতেরই পুনরাবৃত্তি নহে, ইহা নূতন মূর্ত্তিতে ভারতবর্ষের অভিনব শক্তির প্রকাশ—নবযুগোপযোগী নবরূপ-পরিগ্রহ।

নব-শক্তি

স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়—ভাষা ও সাহিত্য

আমাদের সমাজ জীবনীশক্তি হারাইয়া বিশ্বসভ্যতার এক অতি নিম্নস্তর-প্রোথিত অস্থিকঙ্কালের ন্যায় নিস্পন্দ ও অসার হইয়া পড়িয়া নাই। তাহার প্রধান পরিচয় এই যে, নূতন পারিপার্শ্বিকের অনুবর্ত্তন এবং নূতন নূতন সুযোগসমূহ ব্যবহার করিতে যাইয়াও আমরা আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য হারাই নাই। আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীর ভাবও কর্ম্মরাশিকে নিজের স্বতন্ত্র পুষ্টসাধনের উপযোগিরূপে ব্যবহার করিতে সমর্থ হইতেছি; এবং ইহার ফলে এক নূতন জীবনে পদার্পণ করিয়াছি। তাহার অভিব্যক্তিস্বরূপ এক অভিনব সাহিত্যের গঠন আরম্ভ হইয়াছে। নূতন ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি আমাদের জাতীয় স্বতন্ত্রতার পরিচয়। যে ভাষাসম্পদের অধিকারী হইয়া মানব নিজ বিশেষত্বের উপলব্ধি করে, এবং যে সাহিত্যশক্তির প্রভাবে মানবের জাতিগত বৈষম্য পরিপুষ্ট হয়; যে ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ফলে আধুনিক ইউরোপের বিভিন্ন জাতিসকল মধ্যযুগে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতেছিল, যাহার বিক্ষোভে আন্দোলিত হইয়া ফ্রান্সের রাষ্ট্র বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং যাহার ঐশ্বর্য্য ত্রিধাবিভক্ত গতপ্রাণ পোলাণ্ড প্রদেশেরও অধিবাসিবৃন্দকে আলোকিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে;—আমরা নূতন ভাব ও কর্ম্মশক্তিসমূহের সংস্পর্শে আসিয়া জীবন্ত জাতির বিশিষ্ট লক্ষণ সেই ভাষাসম্পদ্ ও সাহিত্য-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছি। নূতন স্বভাব, নূতন জীবন, নূতন আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিবার শক্তি আমাদের ছিল বলিয়া, আমাদের ভাষা ক্রমশঃ বৈচিত্র্যলাভ করিতেছে এবং সাহিত্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইতেছে।

প্রকৃত জীবন্ত জাতির লক্ষণ এই যে, উহার বিকাশ স্বকীয় ইতিহাসগত বিশেষত্ব এবং চরিত্র-স্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিক ক্রম-

বিকাশের অভ্যন্তরে প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র স্বভাব এবং নৈসগিক চরিত্রই পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ জন্য প্রকৃতিগত ভাষার অস্তিত্ব ও ক্রমিক বিকাশই জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তির পরিচয়। যে স্থলে স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব নাই সেই স্থলে জাতীয় জীবনেরও অস্তিত্ব নাই বুঝিতে হইবে। এই জন্যই আধুনিক জগতের সর্ব্বত্র শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে প্রকৃতিগত স্বাভাবিক ভাষার স্থান অতি উচ্চ। সকল দেশেই জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থায় জাতীয় সভ্যতার বিবিধ অঙ্গের সহিত সুপরিচিত হইবার সুযোগ আছে, এবং উচ্চতম শিক্ষার আয়োজনেও জাতীয় ভাষা ব্যবহারের বিধান আছে। জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার মূল উপাদান।

জাতীয় শিক্ষায় জাতীয় সাহিত্যের স্থান

সুতরাং যাঁহারা এ দেশের নূতন পারিপার্শ্বিকের অনুরূপ নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন এবং সমাজকে স্বাভাবিক রূপে আধুনিক জগতের সকল প্রকার অভাব মোচনের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এক দিকে বিজ্ঞান, শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন অন্ন সংস্থানের শিক্ষা দিতে হইবে। তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর এবং নৈশ-বিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের শিক্ষা পর্য্যন্ত সকল স্তরেই জাতীয় ভাষা ব্যবহারের আয়োজন করিতে হইবে। যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের বিদ্যালয়-সমূহের সকল পর্য্যায়ে মাতৃভাষা প্রচলিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত শিক্ষা-পদ্ধতি প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে না। জাতীয় বিদ্যালয়ের উন্নতি জাতীয় সাহিত্যের বিকাশের উপর নির্ভর করিতেছে। কেবল মাত্র গৃহপ্রতিষ্ঠা বা নূতন পরিষদ্‌গঠন করিলেই জাতীয় শিক্ষা দেশে

প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না। যাঁহারা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থভাবে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন। যে সকল সাহিত্যসেবী ও শিক্ষাপ্রচারক আমাদের সাহিত্যকে নানা উপায়ে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে ভবিষ্যৎ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রদূত।

বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা

আমাদের সাহিত্য এখনও অতি নগণ্য শৈশবাবস্থায় রহিয়াছে। অত্যল্পকালের মধ্যেই আমাদের ভাষা বিচিত্র ভাবপ্রকাশক হইয়া উঠিয়াছে বটে ; কিন্তু এখনও আমাদের সাহিত্য উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে সকল শিক্ষা-কার্য্যে ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে নাই। এই জন্য আমাদের মাতৃভাষা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থায় দ্বিতীয় ভাষার মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র, প্রধান ভাষার গৌরবের অধিকারী হয় নাই ; এবং এই জন্যই 'জাতীয় শিক্ষাপরিষদে'র সঙ্কল্প ও চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া কেবল মাত্র আকাঙ্ক্ষাতেই পর্য্যবসিত রহিয়াছে।

কাব্য, উপন্যাস ও কথাসাহিত্য পরিত্যাগ করিলে সাহিত্যপদবাচ্য রচনা অতি অল্পই আমাদের ভাণ্ডারে পড়িয়া থাকে। ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। তুলনামূলক ঐতিহাসিক আলোচনা-প্রণালী কাহাকে বলে আমাদের জাতীয় সাহিত্যে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সমালোচনা-বিজ্ঞানের সূত্রপাতই হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি মাসিক সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং বিদেশীয় সাহিত্য হইতে কাব্যাদির অনুবাদ মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা সাধারণতঃ দার্শনিক জাতি বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকি, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের দর্শনচর্চ্চা আমাদের আধুনিক সাহিত্যে অতি সামান্য স্থানই অধিকার করিয়াছে। যে সকল দেশে

জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সাহায্যে সকল শিক্ষা প্রদান করা হয় তাহাদের সহিত তুলনা করিলে আমাদের সাহিত্যের দারিদ্র্য ও অপ্রাচুর্য্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু চারিদিকে আশার লক্ষণ দেখা যাইতেছে; লোকশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষার গণ্ডিবিস্তারের প্রতি কর্ম্মী-দিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সাহিত্যচর্চ্চায়, ইতিহাসের তথ্য সঙ্কলনে, পুরা-কাহিনীসংগ্রহে, ধনী নির্ধন, বিদ্বান্ মূর্খ, সকলেই আগ্রহান্বিত হইতেছেন। পাঠকসমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সাধারণের মধ্যে জ্ঞানপিপাসার উদ্রেক হইয়াছে। আমরা এক বিরাট্ সাহিত্যবিপ্লব ও চিন্তার আন্দো-লনের পূর্ব্বাভাষ দেখিতে পাইতেছি।

অনতিদূর ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় সাহিত্য পল্লবিত হইয়া আমাদের সমাজকে জগতে বরেণ্য করিয়া তুলিবে। তাহার জন্য বর্ত্তমানে সকল সাহিত্যিকের একটীমাত্র কর্ত্তব্য রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে এখন ভাবিতে হইবে—কি উপায়ে এবং কত দিনে আমাদের সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি গভীর শিক্ষণীয় বিষয়সমূহে ফরাসী, জার্ম্মান ও ইংরাজী সাহিত্যের স্থান অধিকার করিতে পারিবে। যাহাতে আমাদের সাহিত্যসেবা এখন হইতে এই একমাত্র লক্ষ্যে কেন্দ্রী-ভূত হইতে পারে, সাহিত্যিকগণের সাধনা ও আদর্শ সেইরূপ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

সংরক্ষণ-নীতি

কিন্তু সাহিত্য এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে গড়িয়া তুলিতে পারা যায় কি না, এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। অনেকে মনে করিতে পারেন ভাষা ও সাহিত্য নৈসর্গিক পদার্থ—ইহাদের বিকাশ বৃক্ষলতাদি

প্রাকৃতিক পদার্থের বিকাশের অনুরূপ, মানুষের ইচ্ছাধীন নহে। ইহারা স্বাভাবিক ভাবে স্বতই সৃষ্ট হইয়া থাকে।

বাস্তবিক পক্ষে, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সামাজিক রীতি, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি মানবীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ মানবের চরিত্রের বিকাশের উপর নির্ভর করে। মানবের সাধারণ সভ্যতা অতিক্রম করিয়া এই সমুদয় বিষয় উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। উন্নত ধর্ম্ম, রাষ্ট্র অথবা সামাজিক ব্যবস্থার উপযোগী হইতে হইলে মানবকে স্বয়ং উন্নত হইতে হইবে। জাতীয় জীবনের সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়াই এই সমুদয় বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীন চিন্তা, অবাধ বাণিজ্য, মূর্ত্তি-পূজা, নিরাকারের আরাধনা প্রভৃতি বিষয়ক বিধিনিষেধ ইতিহাস-গত জাতীয় চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছি যে চেষ্টা করিয়া, সাধনা করিয়া অভাব সৃষ্টি করিয়া দেওয়া যায়। কি প্রাকৃতিক, কি আধ্যাত্মিক, কি সাংসারিক, কি রাষ্ট্রীয়—সকল জগতেই আয়োজন প্রয়োজনের এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। উৎকট ভাবে প্রয়োজন বোধ করিলেই, এবং এই প্রয়োজন অধ্যবসায়ের সহিত সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রচারিত করিতে পারিলেই, আকাঙ্ক্ষা সকল শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া জাতীয় ও সমাজ-গত হইয়া পড়ে। অভাবের কথা ভাবিতে ভাবিতেই অভাবের সৃষ্টি হয়। এই উপায়ে অনেক অর্দ্ধশিক্ষিত ও অসভ্য জাতি সভ্য জাতির প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিবার উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। যে ব্যক্তি অথবা যে সমাজকে কোন রাষ্ট্রীয়, শিল্প অথবা ধর্ম্মবিষয়ক ব্যাপারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বিবেচনা করিতেছি, অত্যল্পকালের মধ্যেই তাহার হৃদয়ে এই বিষয়ে বাসনা জাগরিত ও বদ্ধমূল হইয়া তাহাকে ইহার অধিকারী করিয়া তুলিতে পারে। আবার যে ব্যক্তি অথবা যে জাতি উন্নত, বিদ্যাবান্, শিল্পনিপুণ ও ধর্ম্মভীরু, অল্প কালের মধ্যেই সে বিচিত্র ঘটনাচক্রের প্রভাবে

একেবারে অধঃপতিত ও নির্জীব হইয়া পড়িতে পারে। জগতের ইতিহাসে শিল্পবাণিজ্যের বিনাশ ও বিকাশ সাধন, ধর্ম্মের লোপ ও প্রচার, রাষ্ট্রীয় উন্নতি ও অবনতি এবং সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও অধোগতির বিবরণে এইরূপ সচেষ্ট অভাবসৃষ্টি ও বশীকরণ নীতির যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সংরক্ষণ-নীতির দৃষ্টান্ত

প্রকৃত কথা এই যে—মানব অনুকূল চেষ্টার দ্বারা উন্নত হইতে পারে, এবং প্রতিকূল শক্তির প্রভাবে অবনত হইতে পারে; সুযোগ থাকিলে ছোট বড় হইতে পারে—সুবিধাগুলি নষ্ট করিয়া দিলে বড়কে ছোট করিতে বেশী সময় লাগে না। স্পেনের শিল্প-বাণিজ্য এইরূপে সুযোগ নাশের জন্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের বৈষয়িক অবস্থার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার শিল্প ও ব্যবসায় স্ব-সমাজের উন্নতিকামী সুযোগ-স্রষ্টা নরপতি এবং সংরক্ষণশীল কর্ম্মীদিগের প্রয়াসেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। রোমীয় সম্রাটেরা এই-রূপে সমাজের সর্ব্ববিধ শক্তি ও সুযোগগুলিকে সংরক্ষণ করিবার নীতি অবলম্বন করিয়াই রোমনগরীকে অতি অজ্ঞ অবস্থা হইতে বিশ্বার রাজ-ধানীর পদে উন্নীত করিয়াছিলেন; এবং সাম্রাজ্যনীতি অবলম্বন দ্বারা প্রাচীন গ্রীসের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কীর্ত্তি ও গৌরব নষ্ট করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ড্রিয়ার সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধি এইরূপ সুযোগ সৃষ্টি করিবার প্রয়াসেই সাধিত হইয়াছিল। রুশিয়ার শিল্পবাণিজ্য এবং শিক্ষাবিস্তার এইরূপ অভাব-সৃষ্টিকরণ-নীতি এবং শক্তি-সংরক্ষণ নীতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া-ছিল। পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক ধর্ম্মের অভ্যন্তর হইতে কালে কালে কুসংস্কার ও আবর্জ্জনা-বর্জ্জনের যত আন্দো-লন হইয়াছে, সকলগুলিই এইরূপ নূতন আকাঙ্ক্ষা ও নূতন অভাব

সৃষ্টির ফল। এইরূপ সচেষ্ট প্রচারের প্রভাবেই সভ্যজগৎ হইতে দাসত্ব-প্রথা দূরীভূত হইয়াছে। উন্নত রাষ্ট্রের নিয়মগুলি স্বীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াই প্রুসিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমাজে উন্নত স্থান লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মপ্রচারক এবং সমাজ-সংস্কারকেরাও এইরূপ সংরক্ষণনীতি অবলম্বনের সাহায্যে স্বকীয় আদর্শগুলি বিভিন্ন-সমাজে বিস্তার করতঃ অনেক নিরক্ষর, অর্দ্ধসভ্য এবং অশিক্ষিত জাতিকে সুসভ্য, সুশিক্ষিত এবং সাহিত্যবান্ করিয়া তুলিয়াছেন।

সাহিত্য-পরিপুষ্টির উপায়

ভাষা ভাবপ্রকাশের উপায়মাত্র। যত উপায়ে এবং যে যে প্রণালীতে মানব আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিতে পারে, সেই সমুদয় উপায় ও প্রণালীর সম্যক্ ব্যবহার করিলেই ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মনোভাব ব্যক্ত করিবার প্রণালীর বৈচিত্র্যে ভাষার বৈচিত্র্য। আবার, ভাবই সাহিত্যের প্রাণ। যত উপায়ে মানবের ধারণা ও চিন্তার গণ্ডি বিস্তৃত ও গভীর হয়, যে উপায় অবলম্বন করিলে ভাবনার বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়, যাহাতে মানবচিত্ত বিবিধ আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার ক্ষেত্র হয়, সেই সকল উপায়েই সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও জটিলতা সৃষ্টি হয়, সাহিত্যসম্পদ্ বৃদ্ধি পায়।

মানবের কর্ম্মক্ষেত্রই সকল প্রকার ভাব ও ধারণার কারণ। জীবনের বৈচিত্র্যে ও গভীরতায়ই চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য জন্মে। সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী করিতে হইলে, বিবিধ উপায়ে প্রকৃত জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রকে বিচিত্র সমস্যাপূর্ণ ও ঘটনাবহুল করিয়া তুলিতে হইবে। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সমগ্রতা, সর্ব্বগ্রাহিতা এবং সচেষ্ট কর্ম্মপ্রবণতা প্রবিষ্ট না হইলে ভাষা নিজের

জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্যের আবশ্যকতা

সামর্থ্য প্রকটিত করিবার সুযোগ পায় না; সাহিত্যও নিজকে সর্ব্বত্র প্রসারিত করিয়া বিপুল ও বেগবান্ হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইলে আমাদের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণের জীবন যাহাতে বিচিত্র কর্ত্তব্যময় এবং ঘটনাবহুল হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। বাঙ্গালাদেশ এবং মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব ও আন্ধ্রদেশ যাহাতে পরস্পর পরস্পরকে বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিনিতে পারে, তাহার আয়োজন করিতে হইবে। এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশে যাইয়া যাহাতে কর্ম্ম-ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে, তাহার সহায়তা করিতে হইবে। বিদ্যা-লয়ে বিভিন্ন পদেশের ভাষাসমূহ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গালা, মারাঠি ও তামিল অন্ততঃ এই তিনটী ভাষা যাহাতে ভারতবর্ষের সকল স্থানে উচ্চ শিক্ষার বিষয় হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে আমাদের প্রত্যেক প্রদেশকে অন্যান্য প্রদেশের সাহিত বিচিত্র উপায়ে কুটুম্বিতা স্থাপন করিতে হইবে।

জীবনে বৈচিত্র্য-সৃষ্টির জন্য শিক্ষা-পদ্ধতির বহুমুখীনতা আবশ্যক

এতদ্ব্যতীত, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করিতে হইবে। ভারতবাসীরা যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বাস করিয়া তাঁহাদের সমাজে বিদ্যায়, বাণিজ্যে এবং অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে কর্ম্মচারীর পদে নিয়োজিত হইয়া যাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা বিদেশেই জীবন যাপন করিতে পারেন, বিভিন্ন দেশে যাহাতে আমাদের প্রচারকেরা ভারতবর্ষের সমাজ, ধর্ম্ম ও সাহিত্য আলোচনা করিয়া শিক্ষিত জাতির সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে পারেন, এবং যাহাতে বিভিন্ন সভ্যজাতির রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সমাজের অবস্থা, সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ব্যবসায় এবং ধর্ম্মজীবন আমাদের প্রদেশসমূহে সুবিস্তৃতরূপে আলোচিত

হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফরাসী ও জার্ম্মাণ অন্ততঃ এই দুইটী ইউরোপীয় ভাষা ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষাপদ্ধতিতে সুপ্রচলিত করিতে হইবে।

জাতীয় সাহিত্যে বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রভাব

এইরূপে আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইলে, আমাদের ভাবনারাশি ক্রমশঃ বিচিত্র ও জটিল হইতে পারিবে। জীবনকে বৈচিত্র্যময় এবং কর্ম্মবহুল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে সাহিত্যের কতকগুলি উপাদান সৃষ্ট হইবে। কেবল তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব সাহিত্যই গঠিত হইতে থাকিবে। বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া এবং বহুবিধ রীতিনীতির পরিচয় পাইয়া আমাদের দেশবাসীরা স্বতঃই পরস্পরের মধ্যে তুলনা-সাধন, তারতম্য-অন্বেষণ ও সামঞ্জস্য-বিধানে চেষ্টিত হইতে থাকিবে। ইহার ফলে তুলনামূলক আলোচনা আরব্ধ হইয়া প্রকৃত সমালোচনা-বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিবে। ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি মানবীয় বিষয়গুলি ক্রমশঃ তুলনাসিদ্ধ বিজ্ঞানের আকার ধারণ করিবে। রাগ, দ্বেষ ও অন্ধবিশ্বাসের বর্জ্জন, চিন্তাপ্রণালীর নূতন পন্থা আবিষ্কার, এবং যুক্তি, তর্ক প্রভৃতির ফলে এক প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুগের আরম্ভ হইবে। সাহিত্য নূতন গতিতে নূতন পথে ধাবিত হইতে থাকিবে। এতদ্ব্যতীত, বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে সখ্য স্থাপিত হইলে এবং পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে মিশ্রিত হইলে, আমরা অজ্ঞাতসারেই ভাবপ্রকাশের বিবিধ প্রণালী অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিব। ইহাতে শব্দসম্পদ্ বৃদ্ধি পাইয়া ভাষার সৌষ্ঠব সাধন করিবে। নানা শ্রেণীর নানা বিষয়ক পারিভাষিক শব্দ আসিয়া ভাষার অভাব মোচন করিবে। ভাষা নূতন-রূপ ধারণ করিয়া বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি গূঢ় বিষয়গুলি অবাধে বহন করিতে পারিবে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সাহিত্যের উৎকৃষ্ট ভাবগুলির সারাংশ সঙ্কলন এবং বিশিষ্ট গ্রন্থনিচয়ের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া স্বদেশ-

বাসীদিগকে উপহার প্রদানের আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। ফলতঃ সাহিত্যের কলেবর বর্দ্ধিত ও সুশ্রী হইতে থাকিবে।

প্রয়োজন

(১) শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষা জাগরণ

নানা দেশে নানা যুগে মহাপুরুষেরা অভিনব জগতের বার্ত্তা লইয়া পৃথিবীতে নূতন নূতন অভাব ও আদর্শ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে সেইরূপ নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিবার, নূতন নূতন আশা প্রচার করিবার সময় আসিয়াছে। সর্ব্ব প্রথমে জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট ও বৈচিত্র্যময় এবং জাতীয় সাহিত্যকে বিপুলবিস্তৃত করিয়া তুলিবার বাসনা-সৃষ্টির প্রয়োজন। তাহার পর উচ্চশিক্ষা, নিম্নশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি শিক্ষাক্ষেত্রের সর্ব্বত্র মহৎ অভাব উপলব্ধি করিবার, এবং একমাত্র শিক্ষার জন্যই সমাজে এখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আন্দোলন সৃষ্টি করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এখন সাহিত্য-পুষ্টি, শিক্ষাবিস্তার এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য বৃত্তিভুক্ প্রচারক ও ধুরন্ধর নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতে হইবে। এই জন্য বিজ্ঞানচর্চ্চা, ইতিহাসালোচনা, শিল্পবিস্তার প্রভৃতি কর্ম্মক্ষেত্রে উপযুক্ত এবং বিচক্ষণ অধ্যাপক ও শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ এবং তাঁহাদের অধীনে কতিপয় বিদ্যানুরাগী ও কর্ম্মোপাসক ছাত্র নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা সমাজে প্রচারিত করিতে হইবে। তাঁহাদের বিশ্লেষণ, সমালোচনা, এক্সপেরিমেণ্ট, অনুবাদ প্রভৃতি কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য স্বদেশসেবকগণকে এখন "এণ্ডাউমেণ্ট" বা ভূসম্পত্তিদানের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র য়্যাকাডেমী বা আলোচনা-সমিতি প্রতিষ্ঠার ভার লইতে হইবে।

বাঙ্গালাদেশে যে সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকে এই অভাবানুরূপ প্রচার কার্য্যের উপযোগী হইবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্র

বিস্তৃত করিতে হইবে। এই জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের সম্পূর্ণশক্তি ও সম্পূর্ণ সময় নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে সাহিত্যসেবিগণকে উপযুক্ত মাসিক অর্থ-সাহায্য করিয়া তাঁহাদের সাহিত্যসাধনা সহজ ও নিরুদ্বেগ করিয়া দিতে হইবে। যদি বাঙ্গালা-সাহিত্য সৌভাগ্যক্রমে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ্ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং এই সম্মিলনের সভাপতি ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়গণের সমগ্র চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি আকৃষ্ট করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, এবং ইহাঁদের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে কতিপয় উচ্চশিক্ষিত, সাহিত্যানুরাগী যুবক নিশ্চিন্ত হইয়া সমবেতভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে দশ বৎসরের মধ্যেই বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থগুলি আমাদের জাতীয়-সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে; প্লেটো, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, গীজো, হেগেল প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের গবেষণা আমাদের স্বকীয় ভাষার ভিতর দিয়াই লাভ করিতে পারি; এবং অল্পকালের মধ্যেই বাঙ্গালাদেশের শিক্ষা-পদ্ধতি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন ও জাতীয় হইয়া উঠিতে পারে।

(২) অনন্যচিন্ত ও অনন্যকর্ম্মা সাহিত্য-সেবী

আমাদের সমাজে এখন ভাবুকতার অভাব হইয়াছে। যে ভাবুকতায় লোকে ভবিষ্যতের মহতী সিদ্ধি ধ্যান করিয়া বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র স্বার্থগুলি ত্যাগ করিতে পারে, সামান্য আরম্ভের মধ্যে অন্তর্নিহিত সমগ্রতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাতেই সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করিতে উৎসাহিত হয়; যে ভাবুকতার অনুপ্রাণনায় বিদ্যাবান্ ব্যক্তি নিজের গৌরব বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ উপেক্ষা করিয়া সমাজের সকল স্তরে বিদ্যা-প্রচারেই আনন্দ উপভোগ করিতে

(৩) আন্তরিক ভাবুকতা ও প্রকৃত বৈরাগ্য

পারেন,—স্বকীয় উচ্চতর শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা খর্ব্ব করিয়া দশের জন্য শিক্ষালাভের সুবিধা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হন ; যে ভাবুকতায় ধনবান্ স্বয়ং উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া সমগ্র সমাজকে বিদ্যায়, ধনে, ধর্ম্মে উন্নীত করিবার জন্য সচেষ্ট হন, এবং ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়া জলদান, অন্নদান, ঔষধদান ও বিদ্যাদানের ব্যবস্থা দ্বারা ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারেন ; যে ভাবুকতার প্রভাবে ভগবান যাহাকে যে শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী করিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, তিনি সমাজ-সেবায় এবং সকল প্রকার দারিদ্র্য-মোচনে সেই শক্তির সম্পূর্ণ প্রয়োগকেই জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম মনে করেন ;—সেইরূপ বৈরাগ্য-প্রসূত ভাবুকতার বন্যা না আসিলে কোন দিন কোন সমাজে নূতন অবস্থার সংগঠন হয় না। যে ভাবুকতায় চিত্তের উন্মাদনা না হইয়া উৎপ্রেরণা হয়, যাহার ফলে শক্তি বিক্ষিপ্ত না হইয়া সংহত ও সংক্ষিপ্ত হয়, যাহার বশে সমাজ ও সংসারের উন্নতি বিধানের জন্য মানব স্থির-সংযতভাবে গৃহত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, আমাদের এখন সেইরূপ ভাবুকতাময় বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর প্রয়োজন হইয়াছে।

একথা মনে রাখিতে হইবে যে, স্বাধীন চিন্তার প্রবৃত্তিই হউক, অথবা ব্যবসায়ে লাভবান্ হইবার আশাই হউক, সাহিত্যচর্চ্চাই হউক অথবা শিক্ষাপ্রচারই হউক, কোন সমাজেই কখনও অতি সত্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। অন্য সকল বিষয়ের ন্যায় এই সকল বিষয়ও ক্রমে ক্রমে গণ্ডি বিস্তার করে। নূতন কোন দিকে চিন্তার গতি পরিবর্ত্তন করিতে সমধিক কষ্ট পাইতে হয়। নূতন পন্থার অনিশ্চয়তা ও সফলতার সংশয় সাধারণতঃ মনে ভয় সঞ্চার করে। দুই চারি জনের অকৃতকার্য্যতায় পরবর্ত্তী লোকেরা বিঘ্ন, ভ্রম প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সফলকাম হইতে পারিলে, ক্রমশঃ সমাজে নূতন চিন্তাপদ্ধতি ও কর্ম্মপ্রণালীর প্রতি বিশ্বাস জন্মে। তখন কৃতকার্য্য ব্যক্তিদিগের পন্থানুসরণ করিয়া,

তাঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া দলে দলে লোক আসিয়া চিন্তা ও কর্ম্মের কেন্দ্র পূর্ণ করিয়া তোলে। তাহার পরে এই নূতন প্রবৃত্তি লোকের চরিত্রগত এবং মজ্জাগত হইয়া বংশগত ভাবে সমাজের লক্ষণ হইয়া পড়ে।

(৪)
ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যবোধ ও সাধনা

সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত সাহিত্যালোচনা, বিজ্ঞান-চর্চ্চা এবং শিক্ষা প্রচার সফলতার অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত না হয়; অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত এই সমুদায় কার্য্যে যোগদান করিয়া দেশের লোকেরা নিজেদের:স্বার্থ, নিজেদের উন্নতি, নিজেদের পারিবারিক উপকার বিশেষরূপে সাধন করিতে না পারে; যতদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণ এই সকল পন্থা অবলম্বন করিয়া সকল প্রকারে লাভবান্ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ঘোর নৈরাশ্য মাথায় রাখিয়া, সর্ব্বস্ব ক্ষতি স্বীকার করিয়া, অশেষ অকৃতকার্য্যতা সহিয়া এবং নিজ জীবনকে জলাঞ্জলি দিয়া ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য অগ্রগামী কর্ম্মীদিগকে একাকী নীরবে তপস্যা করিতে হইবে।

সাহিত্যক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন বিষয়ক প্রস্তাব *

বঙ্গ-সাহিত্যের মর্য্যাদা

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আমরা যে কয়টী সুফল লাভ করিয়াছি, তাহার মধ্যে আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও উৎকর্ষ অন্যতম। পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সম্মুখে এক অভিনব জগতের বার্ত্তা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার ফলে আমাদের জাতীয় জীবন পুষ্টি লাভ করিয়া স্বাভাবিক নিয়মেই জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যকে বৈচিত্র্যময় ও সৌষ্ঠববান্ করিয়া তুলিয়াছে।

এ দেশে যখন ইংরাজী শিক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন আমাদের মাতৃভাষার এমন অবস্থা ছিল না যাহাতে শিক্ষাপদ্ধতিতে ইহাকে উচ্চ মর্য্যাদা প্রদান করিতে পারা যাইত। তখন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যই ইংরাজীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অধিকারিরূপে বিরাজ করিতেছিল। আজ বাঙ্গালা ভাষা বিকাশ লাভ করিতে করিতে এক অপূর্ব্ব অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহাতে ইহাকে বি, এ, পরীক্ষার জন্য নির্ব্বাচিত বিষয়ের মধ্যে একটী অবশ্যপাঠ্য বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত করিতে যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবহানি হয় নাই। কিন্তু এখনও আমাদের ভাষাসম্পদ্ যথেষ্ট উন্নত নয়; এজন্য কোন উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে সকল শিক্ষণীয় বিষয়ই একমাত্র বাঙ্গালাভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া এক

* ময়মনসিংহ সাহিত্যসম্মিলনে গৃহীত, বৈশাখ, ১৩১৮।

প্রকার অসম্ভব। আমাদিগকে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য এখনও বিদেশীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থের দাসত্ব ভোগ করিতে হয়। বাঙ্গালাভাষা যথেষ্ট উন্নত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালীর জন্য ইহাকে প্রধান ভাষারূপে বিবেচনা করিয়া তাহার পঠদ্দশার সকল স্তরেই ইহাকে মুখ্য ভাষার গৌরব প্রদান করিবেন কি না—ইহা বিশ্ববিদ্যালয় ও গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন। সুতরাং এখন তাহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, আমরা ইচ্ছা করিলেও বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যকে আমাদের কলেজের সকল শ্রেণীতে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার মৌলিক অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের সাহিত্যের দারিদ্র্য এবং অপ্রাচুর্য্য ইহাকে সকল প্রকার উচ্চ শিক্ষার সাধনীভূত করিবার পক্ষে প্রধান অন্তরায়।

সাহিত্য-পরিপুষ্টির উপায়

বাঙ্গালাসাহিত্যের কোন সেবকই এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু প্রকৃতির সাহায্যে আমরা যে পরিমাণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি, তাহাকে আমাদের কর্ম্মশক্তি ও সাধনার দ্বারা বর্দ্ধিত ও বিকশিত করিতে হইবে, এবং দরিদ্র ও সঙ্কীর্ণ সাহিত্যকে ক্রমশঃ নানা বিষয়ক ও উচ্চ চিন্তা-প্রকাশক করিয়া তুলিতে হইবে। সাহিত্যসেবিগণের ব্যক্তিগত বা সাময়িক চেষ্টার ফল অপেক্ষা করিয়া আর আমরা বসিয়া থাকিতে পারি না। প্রয়োজন বোধ করিলে রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ 'সংরক্ষণ নীতি' অবলম্বন করিয়া অল্প কালের ভিতর নিরক্ষরকে সুশিক্ষিত, এবং ধনহীন সমাজকে সম্পদ্‌বান্ ও ঐশ্বর্য্যশালী করিতে প্রয়াসী হন। আমাদিগকেও এখন প্রয়াস করিয়া সংরক্ষণনীতির সাহায্যে প্রকৃতির কার্য্য এবং সাহিত্যিকগণের ব্যক্তিগত উদ্যমকে দ্বিগুণিত করিয়া তুলিতে হইবে। কি উপায়ে এবং কত দিনে আমাদের সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ

শ্রেণীতে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি গভীর শিক্ষণীয় বিষয়সমূহে ফরাসী, জার্ম্মাণ ও ইংরাজী সাহিত্যের স্থান অধিকার করিতে পারিবে—ইহাই আমাদের এখন বিবেচনার বিষয় হইয়াছে। যাহাতে আমাদের সাহিত্যসেবা এখন হইতে এই একমাত্র লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত হইতে পারে,—সাহিত্যিকগণের সাধনা ও আদর্শ সেইরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

সংরক্ষণ-নীতি

এক্ষণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে "এণ্ডাউমেণ্ট" বা ভূসম্পত্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য। তাহা হইতে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ উপযুক্ত মাসিক অর্থসাহায্য পাইয়া সাহিত্য-চর্চ্চার জন্য অনন্য কর্ম্ম ও অনন্যচিন্ত হইতে পারিবেন। এইরূপে তাঁহাদের সাহিত্যসাধনা সহজ ও নিরুদ্বেগ করিতে পারিলেই বাঙ্গালা-সাহিত্য সংরক্ষিত হইয়া শীঘ্রই উন্নত হইতে পারিবে। যদি বাঙ্গলাসাহিত্য সৌভাগ্যক্রমে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এবং বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়-গণের সমগ্র চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি আকৃষ্ট করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, এবং ইঁহাদের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে কতিপয় উচ্চশিক্ষিত, সাহিত্যানুরাগী যুবক নিশ্চিন্ত হইয়া সমবেতভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে দশ বৎসরের মধ্যেই বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থগুলি আমা-দের জাতীয় সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে; প্লেটো, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, গীজো, হেগেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গবেষণা আমাদের স্বকীয় ভাষার ভিতর দিয়াই লাভ করিতে

পারি ; এবং অল্পকালের মধ্যেই বাঙ্গালাদেশের শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন ও জাতীয় হইয়া উঠিতে পারে।

অনেক স্থলে য়্যাকাডেমীর প্রভাবে এবং পরিপোষকগণের পরিচালনায় সাহিত্য স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা হারাইয়া কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের প্রস্তাব করিতেছি, তাহাতে এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। কোন সমাজকে অনুন্নত অবস্থা হইতে উন্নীত করিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময়ে যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ে "কমিশন" বা অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সাহিত্যক্ষেত্রেও সেইরূপ অর্থসাহায্যে একটী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে মাত্র। ইহার ফলে কয়েক জন উপযুক্ত সাহিত্যিককে অনন্যকর্ম্মা করিয়া দিয়া সাহিত্যে তাঁহাদের সম্পূর্ণ সময় ও সম্পূর্ণ শক্তি-প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হইবে। তাঁহাদিগকে কোন উপায়ে বাঁধাবাঁধির মধ্যে রাখা হইবে না। তাঁহাদের মতামত বা লিখন প্রণালীকে কোন প্রকারে শাসন করা হইবে না। সকল বিষয়ে তাঁহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করা হইবে। অন্নবস্ত্রের অভাবে অনেকে সাহিত্য চর্চ্চা হইতে বিরত হইয়া থাকেন। এই প্রণালী অবলম্বিত হইলে তাঁহাদের সাহিত্য-সেবা সমাজের জন্য সংরক্ষিত হইতে পারিবে।

উচ্চ শিক্ষায় ব্যবহারোপযোগী পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদ

পদার্থবিজ্ঞান, সমালোচনা, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, ধন-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক যে কয়খানি উচ্চগ্রন্থ মানবের সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা অত্যধিক নহে। কোন দেশেই কেবলমাত্র স্বজাতীয় পণ্ডিতগণের মৌলিক গবেষণা অবলম্বন করিয়াই শিক্ষাকার্য্য সমাধা হয় না।

বিশ্বসাহিত্যের উপযুক্ত গ্রন্থগুলি সকল ভাষায় অনূদিত এবং তাহাদের আলোচ্য বিষয়গুলি সঙ্কলিত হইয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয় হইয়াছে। সুতরাং সেই কয়খানি গ্রন্থ বাছিয়া লইয়া অনুবাদ ও সঙ্কলন আরম্ভ করিলে আমাদের বাঙ্গালাসাহিত্য অতি সত্বরই অন্যান্য দেশের সাহিত্যের সমকক্ষ হইতে পারে। এই অনুবাদ ও সঙ্কলনের ফলে কেবল যে সেই গ্রন্থগুলিই বাঙ্গালাসাহিত্যে স্থান পাইবে এমন নহে, আনুষঙ্গিক ভাবে আমাদের মাসিক সাহিত্য এবং সমালোচনাও উৎকর্ষ লাভ করিতে থাকিবে।

আমাদের দেশের ভাবুকেরা বহুদূর ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও বর্ত্তমানের নগণ্য আরম্ভের মধ্যেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছেন। আমরা স্বভাবতই আশা করিতে পারি যে,,যে কমিশন-প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের ফলে অতি অল্প কালের ভিতরই সাহিত্য প্রবল হইয়া উঠিবে এবং বিদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের একচেটিয়া প্রভাব বাঙ্গালার শিক্ষা-জগৎ হইতে দূরীভূত হইবে তাহার জন্য আমাদের ধনিসম্প্রদায় এবং ভূম্যধিকারিগণ ভূমি ও স্থায়ী সম্পত্তি দান করিতে উৎসাহিত হইবেন।

সমগ্র কর্ম্ম ও চিন্তাশক্তি নিয়োগের আবশ্যকতা

আমাদের দেশের অধ্যাপকেরা সাধারণতঃ ১৫০৲ টাকায় কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকেন। এইরূপ পাঁচজন অধ্যাপকের দশবৎসর ব্যাপী, অথবা দশজন অধ্যাপকের পাঁচবৎসরব্যাপী সমগ্র প্রয়াস ও শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁদিগকে সহায়তা করিবার জন্য কয়েক-জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা আবশ্যক। বৎসরে প্রত্যেক অধ্যাপক অন্ততঃ দুইখানি করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন। এই সমুদয় গ্রন্থ

মুদ্রিত করিতে, এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা সংশোধন ও সংস্করণ করাইতেও অর্থের প্রয়োজন হইবে। মোটের উপর, যদি দশ লক্ষ টাকা মূল্যের জমিদারী সাহিত্যসংরক্ষণের জন্য সাহিত্যপরিষৎকে প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে ইহার আয় কেবল মাত্র দশ বৎসরের জন্য ব্যয়িত হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। **অর্থাৎ আমাদের কার্য্যের জন্য আগামী দশ বৎসরের মধ্যে কেবল সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মাত্র নগদ খরচ করিতে হইবে।** তাহার পরে আর সংরক্ষণের প্রয়োজন হইবে না। ইহার ফলে যে শক্তি জাগরিত হইবে তাহার দ্বারাই সাহিত্য স্বয়ং গন্তব্যপথ স্থির করিয়া স্বাধীনভাবে বিরাজ করিতে থাকিবে।

আর যদি এইরূপ জমিদারী লাভের আশা দুরাশা মাত্র হয়, অথবা একসঙ্গে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা নগদ প্রাপ্তি একেবারে অসম্ভবই হয়, তাহা হইলেও সামান্য ভাবেই সাহিত্য-সংরক্ষণ-কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক গ্রন্থের লিখন, সংশোধন ও মুদ্রণের জন্য যদি ১৫০০৲—২০০০৲ টাকা করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ছয় মাসের মধ্যেই কার্য্যের ফল বুঝিতে পারা যাইবে।

কিন্তু সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের দ্বারা যে সুফল লাভের আশা করা যাইতেছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অল্প কালের ভিতর প্রচুর অর্থ ব্যয় করিবার উৎসাহ ও সামর্থ্য বাঞ্ছনীয়। জাতীয়জীবনে সাহিত্যের স্থান হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ধনিসমাজ, একবার এদিকে দৃষ্টিপাত করুন।

একজনের দায়িত্ব বোধ

অনেক সময়ে সমাজ স্বাধীনভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে অসমর্থ, অথবা হয় ত দেশের লোকেরা উন্নত হইতেই অনিচ্ছুক থাকিতে

পারে। কিন্তু এইরূপ অনুপযুক্ত এক সমাজকে পৃথিবীর উন্নত সমাজ-সমূহের সঙ্গে সমকক্ষ করিয়া তোলা একেবারে অসম্ভব নহে। যদি কোন ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি সমগ্র দেশের উন্নতিসাধনকে একমাত্র নিজেরই কর্ত্তব্য মনে করেন, তাহা হইলে এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে পারে।

এ জন্য সমগ্র সমাজের মধ্যে তাঁহার নিজ আদর্শ সংক্রামিত করিতে হইবে। এ জন্য স্বদেশীয় ও বিদেশীয় শিল্পী, পণ্ডিত ও ব্যবসায়িগণকে তাঁহার নিজ চিন্তা ও লক্ষ্য অনুসারে কর্ম্ম করাইতে হইবে। তাহা হইলে তাঁহাদের সময় ও শক্তি সেই প্রবর্ত্তক ও ধুরন্ধরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সমগ্র দেশের শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি কল্পে সংরক্ষিত হইতে পারে। এইরূপে উপযুক্ত ব্যক্তিগণের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করাই 'সংক্ষরণ-নীতি'র উদ্দেশ্য। যাহাতে উপযুক্ত ব্যক্তিরা ক্ষেত্রের অভাবে নিজ নিজ বিশেষ সামর্থ্যপ্রয়োগ হইতে বঞ্চিত না হন, তাহার প্রতিই সংরক্ষকগণের দৃষ্টি থাকে। সুতরাং সংরক্ষকের সাহায্য পাইলে অনুন্নত সমাজও অতি অল্পকালের মধ্যে জগতে একটী শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতে পারে।

আর বাস্তবিক এইরূপ সুযোগসৃষ্টির প্রভাবেই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি তাহাদের শৈশবাবস্থা নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া মানবসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এইরূপ এক সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিয়াই অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশিয়ার পিটার ও ক্যাথেরিণ, প্রুসিয়ার ফ্রেড্‌রিক্‌ এবং অষ্ট্রিয়ার জোসেফ্‌ তাঁহাদের নিজ নিজ সমাজে শিল্প, শিক্ষা ও সাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ও উৎকর্ষ সাধন কবিয়াছিলেন;—সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের রিষ্‌লু ও ম্যাজারিণ ফরাসী সাহিত্যের সম্পদ্‌ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন;—এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালীর লোরেঞ্জো বিদ্যার পরিপুষ্টিতে সহায়তা করিয়া ইউরোপে নব যুগ প্রবর্ত্তনের সূচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এইরূপ এক প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিয়াই দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের নরপতি ও মন্ত্রিগণ শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতীয় উন্নতির পথ খুলিয়া দিয়াছিলেন, নবম শতাব্দীতে আল্‌ফ্রেড ও শার্ল্যামেন সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নতির জন্য যুগপৎ উদারতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন,—এবং বহু শতাব্দী পূর্ব্বে আলেক্‌জাণ্ডার ও তাঁহার বংশধরেরা সমগ্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগৎকে জ্ঞানে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইরূপ এক নীতি কার্য্যে পরিণত করিয়াই ভারতবর্ষের মহারাজ অশোক সমগ্র সাম্রাজ্য দেবোত্তররূপে উৎসর্গ করিয়া স্বয়ং সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্ম্ম ও বিদ্যার আলোক বিস্তার করিয়াছিলেন।

হিন্দুসাহিত্য-প্রচারক *

——:০:——

জাতীয় গৌরব বোধ

প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী পণ্ডিত গীজো তাঁহার শিষ্যগণকে শিখাইয়াছিলেন—তাঁহাদের জন্মভূমিই ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র, ফরাসীজাতিই সমগ্র সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয়। তাহার কিছুকাল পরে ইংরাজ যুবক বাক্‌ল্ পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার আয়ত্ত করিয়া প্রচার করিলেন—ফ্রান্স, জার্ম্মাণি, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশসমূহের মধ্যে ইংলণ্ডই সকল বিষয়ে উন্নত,—ইংলণ্ডের সাহিত্য, ইংলণ্ডের সমাজ, ইংরাজের আবিষ্কার, ইংরাজের শাসন-প্রণালীই সকলের আদর্শ-স্থল। সে দিন লণ্ডনের বিশ্ব-মানব-পরিষদের সভায় রুশিয়ার একজন পণ্ডিত নিবেদন করিয়াছেন—বিধাতার নিকট তাঁহার স্বজাতিই প্রাচ্য-প্রতীচ্য-সমন্বয়ের ভার পাইয়াছে—রুশ জাতিই ইউরোপীয় মানবজীবনের অসম্পূর্ণতা নিবারণ করিবে, রুশ সভ্যতাই এসিয়া খণ্ডে, বিশেষতঃ চীনের রাজ্যে, দেবতার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে। আজকাল নবীন জাপানীরাও বলিতেছেন—সমগ্র প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্র ও স্রষ্টা চীন নহে, হিন্দুস্থান নহে—জাপান; এসিয়ার বিশেষত্ব এবং প্রাচ্যজীবনের মূলমন্ত্র প্রচার করিবার জন্যই জাপানের অভ্যুদয়। মানবকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ করিবার আকাঙ্ক্ষা ইউরোপীয়-গণের স্বপ্নমাত্র ছিল—জাপানীরা তাহাই সাধন করিবে। আর একদিন ছিল যখন এথেন্স-রাষ্ট্রের কর্ণধার পেরিক্লীস সদর্পে বলিয়াছিলেন—তাঁহার নগরীই বিশ্বের বিদ্যালয়, সভ্যতার তীর্থক্ষেত্র, গ্রীসের অন্তরতম গ্রীস।

* গৌহাটি সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত, চৈত্র, ১৩১৮।

মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি

ইহাঁরা সকলেই যুক্তি দিয়া নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কেহই গায়ের জোরে, জাতীয় গৌরবের দোহাই দিয়া, স্বদেশহিতৈষণা-প্রবৃত্তির প্রভাবে কোন কথা বলেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে স্বদেশের মহিমা-খ্যাপন, স্বজাতির কীর্ত্তিপ্রচার এবং জাতীয় সভ্যতার গুণকীর্ত্তন প্রকৃত উদারতার প্রতিবন্ধক নহে। নিজের কথা বলা, নিজের আদর্শ প্রচার করা, নিজকে ভাল করিয়া বুঝা সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক নহে, এবং ক্ষুদ্রত্ব ও অহঙ্কারের পরিপোষক নহে। ইহা মানুষমাত্রেরই স্বাভাবিক নিয়ম। যেমন বাঙ্গালী সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ভাবে বটে, এবং বিপুল হিন্দুসমাজের আদর্শ ও লক্ষ্য চিন্তা করিয়া থাকে বটে,—কিন্তু তাহার স্বকীয় কর্ম্মক্ষেত্র, বাঙ্গালাদেশই তাহার জীবনের সঙ্গে, তাহার প্রতিদিনকার চিন্তা ও কর্ম্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে গ্রথিত। বাঙ্গালার জল বায়ু ও দীঘি-দুর্গই, এবং বাঙ্গালীর চিন্তা ও কর্ম্মস্রোতই তাহার জীবনের সকল বিষয়ের নিয়ন্তা। এমন কি, বাঙ্গালাদেশই বাঙ্গালীর কাছে একমাত্র অনুভূতিগম্য বিষয়,—এবং ভারতবর্ষ,হিন্দুসমাজ, মানবজাতি ইত্যাদি বাঙ্গালীর নিকট কতকগুলি অনুমানসিদ্ধ ধারণামাত্র, এরূপ বলিলেও দোষ হইবে না। অসম্পূর্ণ শক্তি-বিশিষ্ট মানুষের ইহাই স্বভাব। কাজেই প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে বৃহত্তর ভারতবর্ষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র বঙ্গদেশেরই প্রভাব বাঙ্গালীর উপর বেশী হইবে—বাঙ্গালা দেশই যে বাঙ্গালীর স্বপ্ন উদ্বুদ্ধ করিবে, বাঙ্গালীর আশা জাগরিত করিবে, বঙ্গ সমাজই যে বাঙ্গালীর কর্ত্তব্যের সঙ্গে জীবন্ত ভাবে সম্বদ্ধ থাকিবে তহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নিজেকে যে না চিনে, সে পরকে বুঝিবে না। মানুষ নিজের সুখ-দুঃখ, ও নিজের অভাব-অভিযোগই প্রথম বুঝে—এবং নিজের বিষয়-সম্পত্তি ও কর্ম্মপ্রণালীর সাহায্যেই অপরের জীবন, অপরের চিন্তা, অপরের আদর্শ বুঝিয়া থাকে। নিজে

ছোট কি বড়, নিজের লক্ষ্য ও বিশেষত্ব কি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা না করিয়া কোন লোকই মানবের ভবিষ্যৎ, মানবের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতে পারে না। গৃহস্থ না হইলে অতিথি-সৎকার করিবে কি উপায়ে ?

শিক্ষায় ব্যক্তিত্ব ও আত্মবোধ

আর এই জন্য শিক্ষার ব্যবস্থায় ছাত্রকে সকল বিষয়ে "গৃহস্থ" করাই সকল দেশের প্রধান লক্ষ্য। আমেরিকায় বা জাপানে, জার্ম্মাণিতে ও ইংলণ্ডে বিশ্বজনীনতার যুক্তি দেখাইয়া, উদারতার আশায় লুব্ধ হইয়া কেহই নিজ সন্তানকে একেবারে বিশ্ব-বালক করিয়া তুলে না। ঐ সকল দেশে ছাত্রেরা খাঁটি আমেরিকান্ বা জাপানী বা জার্ম্মাণ হইয়া বাড়িতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদেব ব্যক্তিত্ব ও আত্মবোধেরই বিকাশ করান হয়। তাহাদের আত্মোপলব্ধির প্রণালীকেই যথাসম্ভব সাহায্য করা হয়; নিজেকে সকল বিষয়ে ভাল করিয়া চিনিবার এবং নিজের সুযোগ সুবিধা, ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ বুঝিবার ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করা হয়। ফলতঃ নানাদিক্ হইতে জাতীয়তা, স্বাদেশিকতা, সঙ্কীর্ণতার প্রতিই চিত্তের গতি নিয়ন্ত্রিত করা হইয়া থাকে।

বিদ্যার সঙ্গে জীবনের কোন সম্বন্ধ না থাকিলে বিদ্যা মানুষের একটা বোঝা হইয়া পড়ে। যে বিদ্যায় মানুষ নিজ সমাজের অভাব মোচন করিতে পারে না, নিজের জীবনকে সকল বিষয়ে উন্নত করিতে পারে না সে বিদ্যা নিরর্থক। সে শিক্ষায় মানুষের জীবনীশক্তির পুষ্টি হইতে পারে না,—সংসারের কোন কাজ হয় না। সে বিদ্যালাভে আনন্দ নাই,—চিত্তের বিকাশ উহার দ্বারা সাধিত হয় না।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির উন্নতি-অবনতি ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে হয়। এক এক সমাজের এক এক চরিত্র। জগতের সাহিত্য বিচিত্র, ধর্ম্ম বিচিত্র, রাষ্ট্র-শাসন-প্রণালী বিচিত্র। আবার প্রত্যেক জাতির চিন্তাপ্রণালীও বিচিত্র।

এ জন্য বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিদ্যাগুলিও বিভিন্ন পথে বিভিন্ন প্রণালীতে বিকাশ লাভ করিয়াছে।

ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজ যে অন্যান্য সমাজ হইতে অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র, তাহা অস্বীকার করিবে কে? হিন্দুর জাতীয় প্রকৃতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনাচক্রের অভ্যন্তরে বিকাশ লাভ করিয়াছে। হিন্দুর দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম্ম:অন্যান্য সভ্যজাতির দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ রূপেই পৃথক্। সুতরাং হিন্দুবালককে শিখাইতে যাইয়া প্রথম হইতেই তাহার অপরিচিত ভাব ও কর্ম্মরাশির মধ্যে তাহাকে নিক্ষিপ্ত করা কি বিজ্ঞান-সম্মত? তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলির সাহায্য গ্রহণ না করা কি উদারনীতির পরিচায়ক? প্রথম হইতেই তাহাকে বিশ্ব-বালক গড়িবার চেষ্টা কি অস্বাভাবিক নয়? না হয় আজ-কালকার পাঠশালাগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয় নামই দেওয়া হইল, কিন্তু তাহা বলিয়া খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু সকলকে একই ছাঁচে, একই ভাবে, একই আদর্শে পরিচালিত করিবার প্রয়াস কেন? ইহার সাহায্যে সামান্য মানবতার ভিত্তিই প্রতিষ্ঠিত হইবে না,—উদারতা, বিশ্বজনীনতা আসিবে কি করিয়া?

শিক্ষালয়ে হিন্দুসাহিত্য

হিন্দুকে শিখাইবার জন্য যদি আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে বিশ্বজনীনতার পাগ্‌লামি ছাড়িয়া দিতে হইবে। হিন্দুর শিক্ষাকে যদি প্রকৃত বাস্তবজীবনের অনুকূল করিয়া তুলিবার প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে 'সঙ্কীর্ণতা,' স্বাদেশিকতা, জাতীয়তা, এবং নিজবাসভূমির উপযোগী সর্ব্ববিধ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। হিন্দুর শিক্ষাকে যদি সহজ, সরল ও দেশানুগত করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই উদ্দেশ্যে উচ্চশিক্ষার সকল বিভাগে হিন্দুসাহিত্য ছাত্রের অবশ্য গ্রহণীয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতে মৌলিক হিন্দুসাহিত্য

করা আবশ্যক। সংস্কৃত ভাষা, প্রাকৃত-সাহিত্য প্রভৃতির প্রতি উন্নত-শ্রেণীর শিক্ষার্থিগণের পূর্ণ দৃষ্টি যাহাতে থাকে তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক।

যাঁহারা দর্শন আলোচনা করিবেন, তাঁহারা প্লেটো, বেকন, ডেকার্টে মুখস্থ করিয়াই ছাত্রজীবন অতিবাহিত করিবেন, ষড়দর্শন-সংগ্রহের কয়েক পৃষ্ঠার প্রতি কৃপাদৃষ্টি-মাত্র করিবেন—এইরূপ ব্যবস্থা হইলে কি আধুনিক হিন্দুগণ স্বাধীন চিন্তা করিয়া মৌলিক গবেষণা দ্বারা চিন্তারাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন? আবার ইতিহাসের পাঠক বিশ্বের সংবাদ গ্রহণ করিবার পর মনুসংহিতার কয়েক অধ্যায় মাত্র দেখিবার কথঞ্চিৎ সময় ও সুযোগ পাইলে কি প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিৎ হইতে পারেন? যথার্থ শিক্ষার ব্যবস্থায় দর্শনালোচনা-প্রয়াসী ছাত্রকে স্বদেশীয় মনীষিগণের আবিষ্কৃত সত্যগুলির সঙ্গেই মুখ্যভাবে পরিচিত হইতে হইবে। তাহার পর এই সমুদায়ের সঙ্গে তুলনা সাধন করিয়া, অন্যান্য দার্শনিকগণের মতবাদসমূহের সামঞ্জস্য, পার্থক্য অথবা ঐক্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতে হইবে। ইতিহাসালোচনার উদ্দেশ্যেও সংস্কৃত ও প্রাকৃত-ভাষা হইতে সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিকৃতি উদ্ধার করিবার জন্য উচ্চ বিদ্যালয়ে ব্যবস্থা করা আবশ্যক। প্রাচীন হিন্দুসাহিত্য আয়ত্ত করিয়া ছাত্রগণকে পঠদ্দশায়ই প্রাচীন পুঁথি, প্রাচীন জনপদ, প্রাচীন শিল্প ও তাম্রশাসনের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। দর্শন ও ইতিহাসের শিক্ষার্থীরা হিন্দুসাহিত্যকে এইরূপে প্রতিদিনকার অধ্যয়নকালে ব্যবহার করিতে না পারিলে তাঁহাদের শিক্ষাসাধনায় প্রাণ আসিবে না। এজন্য উচ্চশিক্ষায় হিন্দুসাহিত্যের মর্য্যাদা ও প্রসার বৃদ্ধি সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

তাহার পর নিম্নশিক্ষার কথা। এ দিকেও আমাদের যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য বালক উচ্চশিক্ষার প্রথম

সোপানে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই তাহার মাতৃভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্যের প্রধান প্রধান ভাবগুলি দখল করিয়া ফেলে। সেক্সপীয়ার, হোমার, ভার্জ্জিল, দান্তে প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণের মৌলিক রচনাগুলি ঠিক তাঁহাদের মৌলিক ভাষাতে বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের সাহিত্যের আদর্শগুলি, তাঁহাদের কল্পিত দৃশ্যগুলি, তাঁহাদের প্রতিভাসৃষ্ট জীবনগুলির সঙ্গে ছাত্রের জীবন্ত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়! কিন্তু বাঙ্গালাসাহিত্যের ভিতর দিয়া আমরা কয়জন হিন্দু চিন্তাবীরের পরিচয় লাভ করিয়াছি? কিরাতার্জ্জুনীয়ের আলোচ্য বিষয় কয়জন উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী জানেন? নিম্ন-শিক্ষিতের ত কথাই নাই। রামায়ণ ও মহাভারত বাদ দিলে আধুনিক বাঙ্গালাসাহিত্য প্রাচীন হিন্দুসাহিত্যের কোন সাক্ষ্যই বহন করে না—এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

নিম্নশিক্ষায় হিন্দু সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ

অনেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে না, তাহাদিগকে বিভিন্ন পুরাণ, বিভিন্ন নীতিশাস্ত্র, বিভিন্ন কাব্য-সাহিত্যের সারাংশ সহজ মাতৃভাষায় প্রদান করিতে হইবে। অনেক ছাত্র মৌলিক সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য আলোচনার সুযোগ পাইবে না। শিক্ষার আয়োজনে তাহাদিগের জন্য হিন্দুর প্রাচীন উৎকর্ষ-বিজ্ঞাপক প্রবন্ধরাজি নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। আর যাঁহারা ইহাদের অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্, তাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ; কিন্তু পঠদ্দশার প্রথমভাগে তাঁহাদিগেরও চিন্তাপ্রণালী এবং জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্যসমূহ বাঙ্গালাভাষার সাহায্যে প্রাচীন হিন্দুসাহিত্যের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিতে হইবে।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি

এই নিম্নশিক্ষার দিকেই আমাদের সমুচিত যত্ন লইতে হইবে। এজন্য বঙ্গভাষায় হিন্দুসাহিত্যের প্রচার আরম্ভ একান্ত কর্ত্তব্য। কতশত সংস্কৃত

পুঁথি যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কতশত গ্রন্থ যে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, তাহাও ধরিয়া রাখিবার আমাদের ক্ষমতা নাই। তাহার উপর চীন, তিব্বত, তাতার ও নেপালে কতশত হিন্দু-সাহিত্যের নিদর্শন পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানই বা করে কে? এ সব বড় বড় কথা—সাহস-সাপেক্ষ, উৎসাহ-সাপেক্ষ সময়-সাপেক্ষ, ব্যয়-সাপেক্ষ। কিন্তু ইংরাজী, জার্ম্মান্ ও ফরাসী ভাষাতেই হিন্দুসাহিত্যের যে সকল বিবরণ বাহির হইয়াছে, সেইগুলি সমাজের মধ্যে সুপ্রচারিত করিবার জন্যই আমরা কয় জন লাগিয়াছি? কয় জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ইতিবৃত্তের সংবাদ রাখেন?

কিন্তু আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই। বাঙ্গালাভাষায় হিন্দু-সাহিত্যের ইতিহাস-প্রণয়ন অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে হিন্দুসাহিত্যবীরগণের জীবনী ও সাহিত্য-সমালোচনার যথোচিত সমাদর বাড়াইবার চেষ্টা করাও আবশ্যক। তাহা ছাড়া বিভিন্ন সংস্কৃত ও প্রাকৃতগ্রন্থের সার সঙ্কলিত হওয়া প্রয়োজন। এই সমুদয় গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে শিক্ষাপ্রণালীর সাহায্য হইবে, চিন্তাজীবনে নূতন ভাব আসিবে, সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষারও পুষ্টি হইতে থাকিবে। বাঙ্গালাসাহিত্যের সেবকগণ এদিকে মনোযোগী হইলে সহজে সমাজসেবার নূতন সুযোগ পাইবেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের পরিশ্রমের কিয়দংশ এদিকে প্রযুক্ত হইলে সময় বৃথা নষ্ট হইবে না—অচিরেই সমাজে নবজীবন আসিবে, পণ্ডিত মহাশয়েরাও ধন্য হইবেন।

ধর্ম্ম-জগতে হিন্দুসাহিত্য

শিক্ষাক্ষেত্রের প্রয়োজনসাধনই হিন্দুসাহিত্য-প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। আধুনিক বাঙ্গালাসাহিত্যের পুষ্টি বিধান করাই প্রাচীন সাহিত্য-

প্রকাশের একমাত্র লক্ষ্য নহে। ইহাতে আমরা আর একটা বড় স্বার্থসিদ্ধির আশা করিতে পারি। কারণ প্রাচীন সাহিত্যেই আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের আলোচনা আছে। তাহারই মধ্যে আমাদের ধর্ম্মপ্রণালী, আমাদের ত্যাগশিক্ষার উপায়, সংযমপালনের নিয়ম বিবৃত আছে। হিন্দু যাহা লইয়া গৌরব করে, হিন্দু যাহাকে ভারতবর্ষের নিজস্ব বলে, পাশ্চাত্য জগৎ যাহাকে প্রাচ্য জগতের বিশেষত্ব বলে, তাহা এই সাহিত্যের মধ্যেই নিবদ্ধ আছে। আধুনিক হিন্দুজীবনের, হিন্দুর বিচিত্র রীতিনীতির, হিন্দুর বিবিধ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা এই সাহিত্যের অভ্যন্তরেই নিহিত আছে। তাহা বাদ দিলে আমাদের সামাজিক জীবন যে অর্থশূন্য হইয়া পড়িবে? আমাদের জাতি যে নিজের অতীত কথা ভুলিয়া যাইবে?

হিন্দু সাহিত্যে আধ্যাত্মিক ভাব

বাইবেল-প্রচারের জন্য খৃষ্টানেরা কি না করিতেছেন? হিন্দুই কেবল নিজের ধর্ম্মসাহিত্য বিসর্জ্জন দিয়া, ধর্ম্মজীবনের উন্নতির চেষ্টা না করিয়া কাল কাটাইতে থাকিবে? ঘরে ঘরে পুরাণ ও তন্ত্র না থাকিলে আধুনিক সমাজের বিচিত্র বিধিনিষেধগুলি বুঝা যাইবে কি উপায়ে? ঘরে ঘরে গীতা, বেদান্ত, উপনিষৎ বিরাজ না করিলে অনন্তমুখীনতা, ত্যাগলিপ্সা বিষয়ে অনাসক্তির উপদেশ শুনা যাইবে কোথা হইতে?

সংস্কৃতসাহিত্যের প্রচারে মানবের ধর্ম্মভাব কিরূপ প্রসার লাভ করিতে পারে, আমরা জার্ম্মান্ পণ্ডিত সোপেনহয়ারের দৃষ্টান্তে তাহা দেখিয়াছি। তিনি বলেন,—'উপনিষৎ আমার জীবনে শান্তি দিয়াছে, উপনিষৎই আমাকে চরমে শান্তি দিবে।' হিন্দুর গৌরব আর এক জন জার্ম্মান্ প্রচার করিয়াছিলেন—তিনি ম্যাক্স্‌মূলার। তিনি বলিতেন—"যদি কেহ জানিতে চাহেন পৃথিবীর মধ্যে কোন্ জাতি বিশ্বের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ

ধর্ম্মপ্রচারে হিন্দু সাহিত্যের আবশ্যকতা

আলোচনা করিয়াছে, জগতের কোন্ স্থানে মানবচিত্তের উৎকর্ষ বিশেষ সাধিত হইয়াছে ; যদি কেহ জানিতে চাহেন, প্লেটো ও কাণ্টের দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিবার পর আর কোন্ তত্ত্ব আলোচনা করা যুক্তিসঙ্গত, যদি কেহ জানিতে চাহেন, সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা কোন্ সমাজ করিয়াছে, তাহা হইলে আমাকে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। আর যদি আমাকে বলিতে হয়—গ্রীক, রোমান্ এবং ইহুদী সভ্যতার উত্তরাধিকারী হইয়া আমাদের আর কোন্ বিষয়ে উৎকর্ষ লাভের প্রয়াস করা কর্ত্তব্য, যদি কেহ জানিতে চাহেন, ইউরোপীয়েরা তাঁহাদের জীবনকে মানুষোচিত করিবার জন্য কাহাদের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পারেন, যদি কেহ জানিতে চাহেন, কোন্ সাহিত্যের আলোচনার ফলে ইউরোপীয় মানব নিজের কর্ম্ম ও চিন্তাপ্রবাহকে অতীন্দ্রিয়, অসীম ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভাবে উন্নত, উদার, মহান্ ও পূর্ণ করিতে পারেন, কোথা হইতে সার সংগ্রহ করিলে তাঁহাদের অসম্পূর্ণতাগুলি দূরীভূত হইতে পারে—তাহা হইলেও আমাকে ভারতবর্ষের কথাই ভাবিতে হইবে।"

ধর্ম্মগ্রন্থভাবে বিবেচনা করিলে, হিন্দুসাহিত্যের প্রচার কেবলমাত্র আমাদের মাতৃভাষায় হইলে চলিবে না, কারণ, এই ধর্ম্মভাব সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র বিশ্বেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, আধ্যাত্মিক জীবনের বাণী, অতীন্দ্রিয় জগতের কথা প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। পাশ্চাত্যসাহিত্য ও কলাবিদ্যায় এই অতি-প্রাকৃত ও অতি-মানবীয় ভাবের প্রকাশ না হইলে মানবজগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এই উদ্দেশ্যে যত উপায়ে যত ভাষায় হিন্দুসাহিত্যের প্রচার হয়, ততই বিশ্বের মঙ্গল।

কিন্তু ভারতবর্ষ মানবের গুরু—হিন্দুজাতি অন্য জাতিকে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করিবে—এরূপ ভাবা হয় ত অনেকে সহ্য করিতে পারিবেন না।

আধ্যাত্মিক জীবনের কথাটা না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া গেল। সকল জাতিই নিজকে বড় মনে করে—সুতরাং জাতীয় অভিমান চরিতার্থ করিয়া ফল নাই। আর, কয়েকজন জার্ম্মান্ পণ্ডিত হিন্দুর জীবনে আধ্যাত্মিক ভাব দেখিয়া চমৎকৃত ও পুলকিত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু সেই উচ্ছ্বাসকে কেহ কেহ বাতুলতা মনে করিতে পারেন। তাঁহাদের ভাষার আবেগকে অনেকেই উন্মত্তের প্রলাপ বলিবেন। কেহ কেহ হয় ত ভাবিবেন—পাশ্চাত্য সমাজ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নূতন চিন্তাপদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া নূতন ভাবে মানবজীবন গড়িবার ব্যবস্থা করিতেছিল। সেই নূতন যুগের আরম্ভ কালে ভারতের এক অভিনব কর্ম্ম ও চিন্তা-প্রণালীর পরিচয়পাইয়া কয়েকজন ভাবুক ভাবের বন্যায় ভাসিয়া যাইবে, তাহা ত নিঃসন্দেহ। কাজেই সমালোচনার কষ্ঠি-পাথরে ঘষিলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের হিন্দু-সমাদর না টিকিতেও পারে।

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ এবং পাশ্চাত্য মানব-জীবন

সমাজ-বিজ্ঞানে হিন্দুসাহিত্য

কিন্তু আর একটা দিক্ হইতে সকলেই—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য—হিন্দুসাহিত্যের আলোচনা করিতে অনায়াসে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। সেটা বিদ্যার রাজ্য,—বিজ্ঞানের রাজ্য। সেখানে জাতীয় অভিমানের স্থান নাই, স্বাদশিকতার অবসর নাই। সেই ক্ষেত্রে ইতর-ভদ্র, উচ্চ-নীচ ভেদ নাই। সকল শ্রেণীর তথ্য, সকল জাতীয় সংবাদ, সকল প্রকার ঘটনাই প্রকৃত বিদ্বানের আলোচ্য—যথার্থ অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে সমান মূল্যবান্। পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে, বিশেষতঃ মানব-বিষয়ক বিদ্যার ক্ষেত্রে, এখন অনেক নূতন তথ্য, নূতন ঘটনা, নূতন সংবাদ সঞ্চয় করা প্রয়োজন হইয়াছে। সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনা

বিশ্বসাহিত্যের অসম্পূর্ণতা

তথ্যাভাবে অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে। সাহিত্য ও কলা-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন সমাজের মধ্যে অনেক নূতন অনুসন্ধান আবশ্যক। মানবের বিষয়-সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের সম্বন্ধে যথার্থ সত্য নির্দ্ধারণও এখন এক প্রকার অসম্ভব। এই সমুদয় মানবীয় বিষয়ের আলোচনায় ইউরোপে যাহাকে বিজ্ঞান বলিয়া চালান যাইতেছে, তাহা বাস্তবিক প্রকৃত বিজ্ঞান-পদবাচ্য নহে।

এই সকল মানব-বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতার কারণ আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই এই সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের কর্ম্ম ও চিন্তাক্ষেত্রের অভ্যন্তর হইতেই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ইউরোপের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে যে বিশাল ও বিচিত্র মানবজগৎ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সমাচার তাঁহাদের মধ্যে বেশী বিস্তৃতি লাভ করে নাই। তাঁহারা নিজের দেশে মানুষ সম্বন্ধে যে সত্য পাইয়াছেন, সমগ্র মানবজাতি সম্বন্ধেই সেই তত্ত্ব খাটাইতে যাইয়া মহা ভুল করিতেছেন। এমন কি, তাঁহারা এত অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে, মানবের প্রকৃত সভ্যতার প্রথম স্তর গ্রীস্, এই ধারণা প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হ'ন না। কাজেই অন্যান্য প্রাচীন দেশগুলিকে তাঁহারা 'প্রাচ্য' বা 'অ-বৈষয়িক' অথবা 'অ-রাষ্ট্রীয়' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা এক কথায় সারিয়া দিতে চাহেন। এই জন্য ইউরোপীয়ের সঙ্গে যে জাতির জীবন-প্রবাহের মিল নাই, সেই জাতি অসভ্য অথবা ইউরোপীয় সভ্যতাবিন্যাসের প্রাথমিক স্তরমাত্রে অবস্থিত—এইরূপ তাঁহাদের মত। ফলতঃ সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম্ম, অর্থ, রাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয়ক বিদ্যাগুলি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। সকলগুলিই 'একদেশদর্শিতা'-দোষে দুষ্ট, জাতীয়তার প্রভাবে সঙ্কুচিত।

আলোচ্য ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা

অথচ জড়-বিজ্ঞানে, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানে, জীব-বিদ্যায়, প্রাণ বিজ্ঞানবিষয়ে সার্ব্বদেশিক এবং সার্ব্বকালিক সত্য আবিষ্কৃত হইতে চলিয়াছে। এই

সকল বিষয়ে প্রকৃত 'বিজ্ঞানে'র প্রতিষ্ঠা-কাল আগতপ্রায়। ইহার কারণ এই যে, এ বিষয়ে 'রাগদ্বেষ' বর্জ্জন করা কঠিন নহে—বিচিত্র দেশ হইতে পদার্থ-জগতের বিচিত্র বস্তু সংগৃহীত হইতেছে এবং যথাসম্ভব নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা চলিতেছে।

কিন্তু মানবের বিবিধ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্র এখনও অতি সঙ্কীর্ণ। বিভিন্ন দেশের আচার-ব্যবহার, বিভিন্ন সমাজের রীতিনীতি, বিচিত্র জাতির ধর্ম্মকর্ম্ম ও সৌজন্য-শিষ্টাচার আলোচনা করিবার সুযোগ এখনও বিশেষভাবে সৃষ্ট হয় নাই। তাহা না পাইলে পদার্থ-বিজ্ঞানের ন্যায় ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, ধন-বিজ্ঞান উন্নতি লাভ করিবে কি উপায়ে? পৃথিবীর কেবলমাত্র দুই তিন শ্রেণীর উদ্ভিদ্ আলোচনা করিয়া সমগ্র উদ্ভিদ্‌জগৎ সম্বন্ধে মত প্রচার করিলে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়। বিশ্বের দু'একটি জাতির গোটাকয়েক মোটা কথা আলোচনা করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে উপদেশ দিবার প্রয়াস করিলে সেইরূপই ফললাভ হইবে মাত্র।

তুলনাসিদ্ধ বিজ্ঞান সৃষ্টির উপায়

হিন্দুজাতি এক বিচিত্র দৃষ্টিতে বিশ্বকে নিরীক্ষণ করিয়াছে, এক স্বতন্ত্র উপায়ে সমাজ গঠন করিয়াছে, পারিবারিক জীবনের ব্যবস্থা করিয়াছে—অভিনব প্রণালীতে অন্ন-সংস্থানের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। সুতরাং পাশ্চাত্য দেশীয় তথ্য-সমূহের আলোচনার ফলে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-বিজ্ঞানকে বিশ্বজনীন করিয়া তুলিতে হইলে হিন্দুর ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনের আলোচনা অতীব আবশ্যক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও মানব-বিষয়ক অন্যান্য বিজ্ঞানগুলিকে সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বদেশিক ভাবে গঠন করিবার পক্ষে হিন্দুসাহিত্য-প্রচার অশেষবিধ ভাবিবার কথা প্রদান করিবে। হিন্দুসাহিত্যের সুবিস্তৃত আলোচনা আরব্ধ হইলে চিন্তা-রাজ্যের নূতন নূতন দিক্ খুলিয়া যাইবে—এক বিচিত্র জগৎই সাহিত্য-সংসারে

আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবে। ইহার ফলে তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালীর কার্য্য দ্রুতগতিতে চলিতে থাকিবে—পাশ্চাত্য জগতের উপদেশ ভারতীয় চিন্তাপদ্ধতির দ্বারা অনেক বিষয়ে পরিশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারিবে।

ইংরাজপণ্ডিত মেইন সংস্কৃতসাহিত্য আবিষ্কারের ফলে তুলনাসিদ্ধ 'অনুশাসন'-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার আশা করিয়াছিলেন। জার্ম্মান্‌পণ্ডিত শ্লেগেল তুলনাসিদ্ধ ধর্ম্ম ও ভাষা-বিজ্ঞানের পূর্ব্বাভাষ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই সকল দিকে কথঞ্চিৎ কার্য্য হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের সুধীমণ্ডলীর মধ্যে হিন্দুসাহিত্যের অতি বিস্তৃততর ও গভীরতর আলোচনা আবশ্যক। সেই আশা ফলবতী করিতে হইলে জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যালয়ে, সভাসমিতিতে, সংবাদপত্রে, সাময়িক সাহিত্যে, হিন্দু-সভ্যতার বিচিত্র অঙ্গের বিশ্লেষণ ও হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে গবেষণা অতীব প্রয়োজনীয়। এই উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চশ্রেণীতে দর্শন ও ইতিহাসের ছাত্রগণকে সংস্কৃত ও প্রাকৃতসাহিত্য এবং হিন্দুদর্শন পাঠ করাইবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পাশ্চাত্য জগতে কত শত ছাত্র দর্শনশাস্ত্রে সর্ব্বোচ্চ উপাধির অধিকারী হইয়া প্রতি বৎসর বাহির হইতেছেন, অথচ তাঁহারা সংস্কৃতভাষা এবং হিন্দুজগতের বিস্তীর্ণ ও বিচিত্র দার্শনিক মতবাদ বিষয়ে অজ্ঞ। এই সঙ্কীর্ণতা দূর না করিলে পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাকে প্রশংসা করা যায় না। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতেছে, অন্ততঃ তাহাদের উচ্চশ্রেণীর সকল ছাত্রেরই হিন্দুসাহিত্য অবশ্যগ্রহণীয়রূপে নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য।

জগতের বিশ্ব-বিদ্যালয়-সমূহে হিন্দুর সাহিত্য-সমাজ ও ধর্ম্মের আলোচনাবিস্তার

এই বিষয়ে ভারতবাসীর দৃষ্টিই সর্ব্বপ্রথমে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত সাহিত্যের আবিষ্কার করিয়া বিশ্বসাহিত্যের

সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। এখন হিন্দুর পালা। তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত পথে কর্ম্ম করিবার জন্য হিন্দুগণকে প্রস্তুত হইতে হইবে। জার্ম্মানি, জাপান, আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে, চীন, রুসিয়া ও ফ্রান্সের শিক্ষাপদ্ধতিতে আমাদের সাহিত্য যাহাতে উন্নত মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে, তাহার প্রতি আমাদের কর্ম্মিগণের পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করিতে হইবে।

ভারতীয় বিদ্যায় মানবের যুগান্তর

প্রাচীন গ্রীকসাহিত্য-বিস্তারের ফলে ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীতে মানবজাতির নব-অভ্যুদয় হিন্দুসাহিত্যপ্রচারের প্রভাবে সংঘটিত হইবে। ভারতের শিক্ষাপ্রচারক, বিদ্যা-প্রচারক ও সাহিত্যপ্রচারকগণ, বিশ্বের বিজ্ঞান-ভাণ্ডার,—মানবজাতির সারস্বতক্ষেত্র, আপনাদের অপূর্ব্ব সাহসিকতা, বিপুল-বিস্তৃত অধ্যবসায় ও জগদ্ব্যাপিনী সাধনার ফল প্রতীক্ষা করিতেছে।

OPINIONS

1. Mahamahopadhyaya Pandit **Adityaram Bhattacharyya,** M A., Fellow, Allahabad University, Late Professor, Muir College, Allahabad, author of *Riju Vyakarana* —

"I write this in my appreciation of your effort to facilitate and **popularise the study** of Sanskrit. Your method to teach Sanskrit without the learner's going through a first course of grammar merits trial

The old method has done its part so long and will remain inevitable in the case of higher and thorough study. But if **quicker methods** of acquiring languages, living or dead, be discovered and introduced, humanity will bless him whose inventive genius can succeed to achieve the object which every well-wisher of learning has at heart.

At the very outset the attempt looks somewhat revolutionary. But in other fields it is such **revolutionary departures** from the old track that has hastened the advance of arts and sciences."

২। শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল্, পি, এচ্, ডিঃ—

আপনার প্রদত্ত পুস্তকগুলি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি এবং ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। পুস্তক কয়েকখানির অধিকাংশই পাঠ করিয়াছি, এবং পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি, আর মধ্যে মধ্যে তাহাতে নূতন কথাও পাইয়াছি।

আপনার ইতিহাস ও অর্থবিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপরীক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপকারে লাগিবে।

আপনার 'শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা' অতি উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ। ইহাতে আপনি চিন্তাশীলতার প্রচুর পরিচয় দিয়াছেন। এই পুস্তকে যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা শিক্ষাসম্বন্ধে গভীর তত্ত্বকথা। তাহার কোন কোন কথা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু আপনি যে প্রণালীতে তাহার সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

3. **Rai Sarat chandra Das Bahadur C I.E.** the Tibetan explorer and oriental scholar :—

If Sanskrit, for ordinary purposes, could be learnt without grammar, it would undoubtedly be a great gain. I am of opinion that this is quite possible. Prof. Benoy Kumar Sarkar, M.A., of the National College, Calcutta, has shown the method in his excellent manuals which are now being printed in Calcutta. No preliminary training in the generalisations and definitions of grammar is required. I suggest that a fair trial be given to his method in the *tols* and schools of this country, for in my opinion it will encourage the study of Sanskrit.

[Extract from the paper submitted to the Conference of Orientalists, held at Simla, 1911, under presidentship of Sir Harcourt Butler, Member, Education Department, Government of India.]

4. **Pandit Mahavir Prasad Dwivedi**, Editor, Saraswati, Allahabad :—

" Your admirable series on শিক্ষাবিজ্ঞান* very useful and very interesting, * especially the four parts relating to সংস্কৃত শিক্ষা। Their arrangement is very good. I wish you would get the Sanskrit ones **rendered into Hindi**.

5. P. N. Bose, Esq., B.Sc (*London*), F.G.S., M.R.A.S.

A perusal of your শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা and সাহিত্যসেবী has convinced me that the Bengali language in the hands of a master could be made as good a vehicle for high thoughts and ideas as any language in the world. But your শিক্ষাবিজ্ঞান is on such an elaborate plan and embraces such a wide variety of subjects which would be interesting and instructive not only to all educated Indians, but probably also to cultured men of other nationalities, that I almost regret it should be written in a Provincial vernacular Hope you will have an **English Edition of the work**.

৬। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,—

এই গ্রন্থ বিশেষ অবধানের সহিতই আলোচনার যোগ্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাঁহারা শিক্ষাব্যবসায়ী, তাঁহারা এই বই যত্ন করিয়া পড়িবেন ও উপকার লাভ করিবেন, এইরূপ আশা করি। বিনয়বাবু যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিপুলবিস্তৃত ও দুঃসাধ্য। ইহা সম্পন্ন করিয়া তিনি দেশের মহৎ উপকারসাধন করুন, এই আমি অন্তরের সহিত কামনা করি।

৭। শ্রীযুক্ত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ,—

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার ভূমিকা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম ও সঙ্গে সঙ্গে চমৎকৃত হইলাম। এ গ্রন্থ সম্বন্ধে সুপণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থই লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থের বিপুলতার কথা ভাবিতে গেলে মনে সহজেই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, এই প্রকার বিপুল গ্রন্থ এক ব্যক্তির দ্বারা সংগৃহীত হইতে পারে কি না। কিন্তু পুস্তক-লেখক ভূমিকায় স্বীয় অভিজ্ঞতার, ক্ষমতার ও অধ্যবসায়ের যে প্রকার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বিলক্ষণই আশা করা যাইতে

পারে যে, তিনি যথাসময়ে তাঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্যে কৃতকার্য্য হইবেন। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবেক ও সেই উদ্দেশ্যে, আমার বিবেচনায় কেবল বাঙ্গালা ভাষায় নয়, ইংরাজী ভাষাতেও পুস্তকখানি প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষের সকল বিভাগের লোকেরা পাঠ করিতে পারিবেক।

8. Dr. Satish Chandra Banerji, M. A., D. L., PREMCHAND ROYCHAND SCHOLAR :—

I entirely agree with you in thinking that the methods adopted for the study of languages in this country are defective. Your own plan seems to have been carefully thought out, and it has been admirably worked out. I have no doubt that by following your method our boys will be able to pick up English and Sanskrit much more quickly than they do at present.

9. Babu Sarada Charan Mittra, M. A. B. L., PREMCHAND ROYCHAND SCHOLAR :—

I have gone through the books *Ingraji Siksha* and *Sanskrita Siksha* and *Prachin Greecer Jatiya Siksha* of your 'Siksha Bijnan Series' and am of opinion that they will be of great help to those for whom they are intended. I am glad you are doing a great service in the art of teaching.

১০। 'গৌড়দূতে'—শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ, বি, এল ঃ—

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ, মহাশয় এক বিশাল কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বাঙ্গালাভাষায় শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কোন গ্রন্থ নাই বলিলে চলে। এ দেশে জাতীয়ভাবে শিক্ষা প্রচারের জন্য বিদ্যালয় ও পরিষৎ স্থাপিত হওয়ায় তাহার আবশ্যকতা দিন দিন অনুভূত হইতেছে। বিনয়বাবু স্বয়ং এই শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী, সুতরাং তিনি এই বিশাল কার্য্যে ব্রতী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য; সম্প্রতি এই বিরাট গ্রন্থের ভূমিকামাত্র প্রকাশিত

হইয়াছে। এই গ্রন্থের বিশালতা দেখিয়া একা বিনয়বাবুর দ্বারা এই কার্য্য সংসাধিত হওয়া অনেকে অসাধ্য মনে করিতে পারেন, কিন্তু তিনি ছাত্রাবস্থা হইতে এই কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, এবং কেবল স্বয়ং প্রস্তুত নহে, অপর সহচর ও সাহায্যকারী ব্যক্তিও প্রস্তুত করিয়াছেন। সুতরাং এই বিশাল গ্রন্থের সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই।

11. **The Leader,** *Allahabad, 13th October,* 1911 :—

Every lover of vernacular literature will welcome the nice little pamphlet 'The Man of Letters' from the pen of Prof. Benoy Kumar Sarkar, Lecturer in the Bengal National Council of Education. It sets forth in a forcible manner a scheme for the fostering of vernacular literature in India.

Prof. Sarkar holds that literature in common with everything else requires **protection** in its infancy. He says that our literature is still in its non-age and it is due to this backwardness and poverty of our language and literature that it has been only accorded a position of second language in the Government's scheme of higher education and has not been entitled to the dignity of the first language.

But this can be achieved if learned bodies like the Bangiya Sahitya Parishad of Calcutta and Nagri Pracharini Sabha of Benares undertake to employ some of the best students of our country to work together for the development of our literature under the guidance and control of such literary men as Dr. Seal of Bengal and Dr. Jha of our Provinces But to secure the services of these students it is essentially necessary that they should be free from all pecuniary wants.

The Bangiya Sahitya Parishad of Bengal took up the suggestion of Prof. Sarkar and on the occasion of

the fiftieth birth-day anniversary of Babu Rabindra Nath Tagore, the greatest living poet of Bengal, have collected a decent fund the proceeds of which will be utilised in the manner indicated above.

The Nagri Pracharini Sabha of Benares can do the same. The Sabha can raise funds on similar occasions and spend them likewise. If this can be done, perhaps it will not be then too much "to expect that in the course of ten years we can have the best literary treasures of the world in our own national literature, that we can have the thoughts and investigations of Plato, Herbert Spencer, Guizot, Hegel and other European philosophers through the medium of our own language and that in no time the education of these Provinces can grow into one that is natural and really national."

১২। প্রতিভা—ঢাকা

সংস্কৃতশিক্ষা :—বিজ্ঞানসম্মত সংস্কৃত-শিক্ষাদান-প্রণালীর প্রথম গ্রন্থাবলী। ইতিপূর্ব্বে আর এরূপ গ্রন্থ রচিত হয় নাই। মাতৃ-ভাষা শিক্ষা-প্রণালীর সাহায্যে প্রথম হইতেই বাক্যরচনা ও পদযোজনা লইয়া শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। শুদ্ধ বাক্যগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলে অশুদ্ধ বাক্যকে শুদ্ধ করিবার প্রয়াস করিতে হইবে। প্রথমতঃ কেবল শুদ্ধবাক্য প্রয়োগ করিয়া শিক্ষার্থীর কর্ণকে শুদ্ধ বাক্যের ধ্বনিতে অভ্যস্ত করিতে হইবে।

অধ্যাপক সরকারের প্রবর্ত্তিত পাঠ-সন্নিবেশের পারম্পর্য্য বিজ্ঞানসম্মত এবং আরোহ প্রণালীর প্রয়োগমূলক। ব্যাকরণ শিক্ষা ব্যতিরেকে এই প্রণালীতে শিক্ষার্থী অতি সহজে সংস্কৃত অনুবাদ ও রচনা-পদ্ধতির এবং সাহিত্যের প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে।

পাঠগুলি এত সুন্দর ধারাবাহিকরূপে ও ব্যবহারিকভাবে বিন্যস্ত যে,

ব্যাকরণের অতি জটিল সূত্র-নিয়ন্ত্রিত এবং বিভক্তি ও রূপ-বহুল সংস্কৃত ভাষা অতি সরলভাবে (এবং রূপ ও বিভক্তিহীন ভাষার ন্যায়) অনায়াসে আয়ত্ত হইতে পারে। ইহা গ্রন্থকারের বিশেষ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার পরিচায়ক।

সংস্কৃতশিক্ষার সৌকর্য্যসাধনে অধ্যাপক সরকারের পুস্তিকাবলী তজ্জাতীয় আধুনিক গ্রন্থনিচয় অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট ও আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর কত উপযোগী, তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই অনুভব করিতে পারিবেন। যুগধর্ম্মের ও সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী ; সুতরাং শিক্ষাদানের প্রাচীন প্রণালী বর্ত্তমানকালে আর প্রযোজ্য নহে। পণ্ডিতবর্গ ইহা বিবেচনা করিয়া অধ্যাপক সরকারের প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অনুসারে শিক্ষাকার্য্য সাধন করিবেন, ইহা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

গভর্ণমেণ্ট-প্রস্তাবিত প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার উন্নতি বিষয়ে এই প্রণালী অবলম্বিত হইতে পারে কি না, তাহার বিচার হওয়া উচিত।

ইংরাজী-শিক্ষা :—এরূপ গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় বিরল না হইলেও মাতৃভাষার সাহায্যে লিখিত ঈদৃশ গ্রন্থ সম্পূর্ণ নূতন। সংস্কৃত শিক্ষাদান প্রণালীর ন্যায় এগুলিও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির প্রবর্ত্তক এবং ধারণা ও স্মৃতিশক্তির অপব্যবহার-নিবারক।

মৌখিক শিক্ষা হইতে শিক্ষার্থী ক্রমশঃ বাক্যের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারে অগ্রসর হইবে। ইতিমধ্যে আপন আপন বেষ্টনীর মধ্যে প্রযোক্তব্য ইংরাজী শব্দ লইয়া ইংরাজী বাক্যে সেই সেই শব্দের ব্যবহার শিক্ষা করিতে হইবে। এইরূপে বিনা আয়াসে বিভিন্নজাতীয় সাধারণ পদার্থের সহিত পরিচিত হইয়া শিক্ষার্থী সরল বাক্য-রচনার কৌশল আয়ত্ত করিবে। মৌখিক শিক্ষাকালেই প্রশ্নোত্তর এবং আদেশ সম্বন্ধীয় বাক্য শিক্ষার্থীর অভ্যস্ত হইবে।

পাঠবিন্যাসগুলি ধারাবাহিক ও ক্রমিক। এই প্রণালীতে শিক্ষাদান করিলে স্বল্পায়াসে সুফল লাভ হইবে। প্রথমভাগের দ্বিতীয় অনুশীলনে উচ্চারণ-বিষয়ক পাঠগুলি প্রথম শিক্ষার্থীর বিশেষ উপকারে আসিবে।

দ্রষ্টব্যাংশগুলি গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতার পরিচায়ক এবং শিক্ষকের পক্ষে মূল্যবান্।

13. Empire—*23rd September,* 1911 :—

All students of Sanskrit language and literature should note the improvements made by Professor Sarkar, and educational authorities may see their way to give a **fair trial to his method** of teaching in the schools under their jurisdiction.

The author's "Prachin Greecer Jatiya Siksha" is in some respects a **unique production** in Bengali. It contains an excellent introduction to the science of education. Then follows on account of the systems of education which obtained in Sparta and Athens. In the concluding chapter ancient Greece and India have been compared from several points of view.

Professor Sarkar's volume is an **important contribution to Bengali literature** and should be bought in hundreds. We understand that all profits arising out of the sale of this book will go to the funds of the Bangiya Sahitya Parishad, the leading literary Society of Calcutta.

১৪। হিতবাদী—১৭ই আশ্বিন, ১৩১৭ সাল

এ পুস্তকের আলোচনাপদ্ধতি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অধ্যাপক ও বিদ্যার্থিবর্গের মধ্যে ইহার আদর হইবে।

15. The Bengalee—*September,* 1910 :—

"A MONUMENTAL WORK.

Shiksha Bijnaner Bhumica" or Introduction to the Science of Education contains an appreciative preface by **Babu Hirendranath Datta,** is to be a *compre-*

hensive work treating of all the aspects of education, ***historical***, *theoretical* and *practical.*

* * * * *

It is highly desirable that the **New Method of Teaching** inaugurated in his work should find its trial in our Public Schools and Colleges

Government is also alive to the cause of primary education. It is evident that we are in need of a number of educated men, like the present author, who can devote their lives to lift and leaven the general mass of the community.

Slur is often flung at our graduates that they are not fit for any original work We invite the public to take note of this comprehensive and **original work** on the Science of Education and to see if they can adopt its ideals and methods of education.

The author deserves the most hearty thanks from the public for the long and steady efforts that are being made to the **cause of educational reform.**

১৬। প্রবাসী—ভাদ্র ১৩১৭

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ভূমিকায় এই গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন—শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে গ্রন্থকার এক প্রকাণ্ড পুস্তক কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত করিবেন, তাহাতে শিক্ষাপদ্ধতির ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর আলোচনা থাকিবে। সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যদেশের শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থির করিবার চেষ্টা হইবে। শিক্ষার অন্তর্গত জগতের যাবতীয় বিষয় আলোচিত হইবে। সেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারমর্ম্ম প্রকাশ করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

গ্রন্থকার বিদ্বান্ ও শিক্ষাকর্ম্মে ব্যাপৃত। তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা

প্রকাশিত হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে, আশা করা যায়। পুস্তিকার শেষে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সকল দেশ হিতেচ্ছুর চিন্তা ও অনুকরণের যোগ্য বলিয়া এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"শীঘ্রই বিদ্যা-দান এবং শিক্ষাবিস্তারই স্বদেশসেবা ও সমাজহিতের প্রধান অঙ্গ ও লক্ষণ হইয়া দেশের মধ্যে বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে। শিক্ষার আন্দোলনই সকল আন্দোলনকে গ্রাস করিয়া ক্রমশঃ গভীরতর ও বিস্তৃততর হইতে থাকিবে। কর্ম্মিগণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব-বিকাশের সহায়ক জ্ঞানমন্দিরসমূহের প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের ধর্ম্ম মনে করিবেন এবং এই কর্ম্মেই সম্পূর্ণ শক্তি ও সময় দান করিয়া জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য দেশবাসীদের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। শিক্ষাপ্রচারই সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের নূতন সন্ন্যাস হইবে। শিক্ষকই নূতন সন্ন্যাসী হইবেন।" এরূপ সন্ন্যাসী দেশে দেখা দিয়াছেন। গ্রন্থকার তাঁহাদের অন্যতম।

১৭। বসুমতী—ভাদ্র ১৩১৭

গ্রন্থকার "শিক্ষাবিজ্ঞান" নামক বিশ খণ্ডে সমাপ্ত যে বিরাট গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই ভূমিকা তাহারই পরিচয় ও নির্ঘণ্টস্বরূপ লিখিত হইয়াছে। শিক্ষা-বিজ্ঞান গ্রন্থ বঙ্গভাষায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

গ্রন্থকার মাতৃভাষায় এই অভাব দূর করিবার জন্য তিন চারি বৎসর কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শিক্ষাবিজ্ঞানের রচনা করিয়াছেন। সেজন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদার্হ। সংস্কৃত, ইংরাজী, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা-বিজ্ঞানের অন্তর্গত চারি পাঁচখানি পুস্তক ইতিমধ্যেই যন্ত্রস্থ হইয়াছে।

এই রাজনীতিক আন্দোলনের দিনে শিক্ষাবিজ্ঞানের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া নবীন গ্রন্থকার শিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছেন। হীরেন্দ্রবাবুর সহিত আমরাও বলি—সুধীমণ্ডলী এই নূতন গ্রন্থের উপযুক্ত

সমাদর করিবেন এবং শিক্ষাবিষয়ে নিজ নিজ চেষ্টা ও চিন্তার প্রয়োগ করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত "বিজ্ঞানের" প্রতিষ্ঠা করিবেন।

১৮। ভারতী—কার্ত্তিক ১৩১৭

ভূমিকায় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় গ্রন্থকারের যোগ্যতা, অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ মহৎ অনুষ্ঠানের সফলতা সম্বন্ধে সবিশেষ আশান্বিত, আমরাও তদ্রূপ আশান্বিত। গ্রন্থকার শিক্ষাব্রতে আপনার সকল চিন্তা, সকল চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন। শিক্ষাদান কার্য্যে তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সমগ্র ভারতবাসীর শ্রদ্ধাভাজন। শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকাপাঠে গ্রন্থকারের শক্তি সম্বন্ধে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না। এমন পাণ্ডিত্য ও তাহার সদ্ব্যবহার আজকালকার এ স্বার্থের যুগে দুর্লভ, প্রাচীন ভারতের কথা মনে পড়ে। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এই গ্রন্থ বিরাজ করুক, শিক্ষার প্রকৃষ্টতর আদর্শে বাঙ্গালী উন্নতির পথে উঠিবে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

19. **The Modern Review**—*October*, 1910

The author is engaged in the preparation of a 'Science of Education Series' which will be completed in twenty parts. The book under review is an Introduction to the whole series. The author deserves our best thanks for the services he is doing to the cause of **Educational Reform** in our country, and we recommend this Introduction to our teachers for perusal.

২০। আর্য্যাবর্ত্ত—কার্ত্তিক ১৩১৭

আমাদের সমালোচ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অতি প্রকাণ্ড বিষয়ের পূর্ব্বভাষ বা অবতরণিকা। তিনি যে জীবনব্যাপী মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ভূমিকায় তাহারই উদ্বোধন হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় কেন, বোধ হয় পৃথিবীর কোন ভাষায় শিক্ষাবিজ্ঞানের এমন বিপুল আয়োজন একজনের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। স্পেন্সার তাঁহার ক্রমোন্নতিক দর্শনে, কোমৎ তাঁহার বিজ্ঞান-শ্রেণী-বিভাগে যে একটি ভাবসমগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও এ শ্রেণীর সমগ্রতা নহে। 'শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা'-প্রণেতা যে সমগ্রতাকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও জীবন-ব্যাপিনী সাধনার প্রয়োজন ; জীবনব্যাপিনী সাধনায়ও সিদ্ধিলাভ করা যায় কি না সন্দেহ। ভূমিকার ভূমিকা-লেখক হীরেন্দ্রবাবুও সে আভাস দিয়াছেন। অবশ্য শিক্ষাবিজ্ঞানের গ্রন্থকারের এই বিপুলতার জন্য সঙ্কুচিত হইবার প্রয়োজন নাই।

সমস্ত জড়বিজ্ঞান ও সমস্ত অধ্যাত্মবিজ্ঞানই মানব-মনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বর্ত্তমান যুগে মানবের শিক্ষায় এই সমস্ত বিজ্ঞানেরই যথানির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। এই কথাটি বিস্মৃত হইলে শিক্ষায় সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করা কখনও সম্ভবপর হয় না। শিক্ষাবিজ্ঞান-আলোচনা-প্রয়াসী অধ্যাপক মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে এই নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিয়া, এই পূর্ণ আদর্শটি সাধারণের সমক্ষে ধারণ করিয়া বড় ভাল কাজ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার পরিধি এখনও সঙ্কীর্ণ, আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী এখনও অতীতের জড়ত্ব পরিহার করিতে পারে নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এখন সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার অনুকূল নহে ; কিন্তু তাহা হইলেও এ আদর্শটি মহান্, সুন্দর এবং সার্থক, সুতরাং অবশ্যম্ভাবী বিঘ্নসত্ত্বেও আমরা নবীন লেখকের উদ্যমের সফলতা কামনা করি। * * *

বিষয়ের গুরুত্ব তুলনায় ভূমিকাটি নিতান্ত ক্ষুদ্র ; তাহা হইলেও লেখক যেরূপভাবে তাঁহার বক্ষ্যমাণ বিষয়ের আভাস দিয়াছেন, তাহা হইতেই তদীয় আরব্ধ ব্যাপারটির ব্যাপকতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। গ্রন্থকারের উপর আমাদের নির্ভর ও বিশ্বাস আছে, তাঁহার ক্ষমতারও আমরা পরিচয়

পাইয়াছি। আমাদের কামনা, তিনি নিজব্রতে সফলতা লাভ করিয়া জাতীয় সাহিত্যের ও জাতীয় শিক্ষার ভাণ্ডার পূর্ণ করুন।

21. **The Hindusthan Review**—*Allahabad.*

Professor Benoy Kumar Sarkar's *Economics* in his *Aids to General Culture Series* is an exposition of the science as conceived in Europe from Adam Smith to Marshall, but the last chapter "*The Meaning of Indian Economics—Different Standpoints*" is bound to prove not only interesting but instructive to students in the country. In this the author gives a lucid summary of the different standpoints from which the subject may be studied.

He distinguishes between what passes for Indian Economics in the curriculum as a study of present-day facts and phenomena relating to the industrial, financial and commercial organisations of the society and the position the subject should have as a contribution to the universal science of Economics, which is yet in the making according to the principles of the inductive-philosophical method. According to this view Indian Economics *as an applied science* should mean not an Economic History as set forth by Mr. Romesh Dutt or a summary of what is available in the Economic and Administrative sections of the *Imperial Gazetteer of India*, but a study of the methods and means of the socio-economic and economic-political advancement of India.

22. RAI BAHADUR **Srish Chandra Basu**, B. A., *District and Sessions Judge* (*U. P.*), Author of the *Ashtadhyai of Panini.* (M. A. Text-Book, London

University) and Translator (and annotator) of Bhattaji Dikshita's *Siddhanta Kaumudi*, the *Upanishads*, *Vedanta Sutra* and the *Mitakshara* in the 'Sacred Books of the Hindu Series' —

The scheme of Sanskrit works in Professor Benoy Kumar Sarkar's pedagogic series is based on the conception that any language, whether inflectional or analytical, living or dead, can be learnt exactly in the method in which the mother-tongue is acquired. No preliminary training in the generalisations and definitions of grammar is therefore required, and the student may be at once introduced to the *sentence* as the unit of thought and expression.

By a skilful and systematic application of this method, Professor Sarkar has been able to build up, through lessons and exercises in translation, conversation, questions and answers, and correction of errors, a text-book in Sanskrit which serves the *double purpose* of a guide to composition and a series of primers on Sanskrit literature. From this series of books the reader can master not only the necessary rules of Sanskrit Grammar, but also will be familiar with some of the most important passages of standard classics, *e.g.*, *Raghu-vansam*, *Kumar sambhavam*, *Ramayanam* and *Manu Samhita*, adaptations or originals of which the author has incorporated in his book as specimens of narrative, historical, poetical and other styles.

In applying to the study of Sanskrit principles and methods that have been utilised in modern languages in Europe, Professor Sarkar has demonstrated,

through practical illustrations, lesson by lesson, that the most highly inflectional languages may, with considerable economy of time and labour and other pedagogic advantages, be reduced to the same method of teaching and treatment, as those languages which are not bound hard and fast by Grammar. To all students of Sanskrit language and literature, Professor Sarkar's series cannot but be eminently useful and instructive; and scholars interested in the art of teaching and the history of Sanskrit learning cannot but note the considerable improvement on the existing readers and primers that are in most cases mere imitations or occasional modifications of the really original works of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, C.I.E.—whose genius succeeded in simplifying and adapting Panini for the use of students in Bengal.

The method of the pioneer of Sanskrit learning can no longer be profitably used under the altered conditions of the times; and it is desirable that the new method should have a fair trial in our secondary schools in the interest of educational reform.

২৩। প্রাচীন সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি, এল্ 'সাধনা'র ভূমিকায় লিখিয়াছেনঃ—এমন গুরুতর বিষয়ে, এমন সর্ব্বজনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে, এমন আড়ম্বরশূন্য, অলঙ্কার-শূন্য, নিরেট ভাষায়, এত কথার আলোচনা—বোধ হয় বাঙ্গালায় আর নাই। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে' নাই, 'অনুশীলন-তত্ত্বে' নাই, 'ভক্তিযোগে' নাই—বোধ করি, আর কোথাও নাই।

২৪। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এম্, এ, বি, এল, এম্, আর, এ, এস্, (Modern Review) :—

'The Science of History and the Hope of Mankind'—

It is singularly striking that the author has in the narrow compass of his book stated some important teachings of history with considerable lucidity and precision * * will meet with the approval of all scientific men. * * Prof. Sarkar is master of his subject.

25. **The Collegian**, Calcutta

These *Historical Essays* open a new chapter in the history of Bengali Prose Literature. The author commands the power of expressing high and serious thought in clear, simple and yet powerful language. * * Each marked by originality and freshness that instruct as well as suggest. * * Prof. Sarkar is continuing the work of Bhudev Mookerji not only as a historical scholar and man of letters but also as an educational missionary.

26. **Hon'ble Principal R. P. Paranjpye,** Senior Wrangler (Cantab.), Fergusson College, Poona :—

The reading of the book ('The Science of History') has been very stimulating, and I congratulate your pupils who have the good fortune to listen to your lectures. Such teaching is sure to make them think for themselves.

27. **Hon'ble Rai Bahadur Dr. Sundar Lal,** C.I.E., L.L.D., Vice-Chancellor, Allahabad University :—

'The Science of History and the Hope of Mankind.' * * Valuable work. * * The book is really an excellent one. I have gone through the book and found it very

interesting. I will keep the book among my best books in the library.

28. **Dr. Rashbehari Ghosh,** M A., D. L., C. S. I., C. I. E.—

It is a very interesting book and may be read by every body with profit.

29. **Dr. Shambaugh,** M. A., Ph. D., Iowa University, U. S. A., :—

Your discussion is very interesting and suggestive, and I have profited by its reading.

30. **The Punjabee**

A small but learned summary of lectures on the Science of History. * * Observations and conclusions very thoughtful.

31. **The Statesman**

The book is written in a lucid style and neatly printed and published by Messrs Longmans Green & Co , London.

৩২। **উদ্বোধন**

বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের যে শুভ ফলগুলি ফলিয়াছে, বিনয় বাবুর এই গ্রন্থখানিকে তাহার অন্যতম বলা যাইতে পারে।

সর্ব্ব বিষয়ে জাতীয় উন্নতি কিরূপে হইতে পারে, এই গ্রন্থে নানাদিক্ হইতে তদ্বিষয়ের আলোচনা আছে। প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেইগুলি একত্রিত করিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া বিনয় বাবু ভালই করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে যুবার অদম্য উৎসাহ অথচ বৃদ্ধোচিত বিজ্ঞতার অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে। কথোপকথনের ভাষায় গ্রন্থখানি লিখিত হইলেও কোথাও ভাবের গাম্ভীর্য্যহানি হয় নাই। প্রাচীন সুলেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়

গ্রন্থারম্ভেই একটী ভূমিকা লিখিয়া পাঠককে গ্রন্থের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থকার জাতীয় উন্নতির উপায় সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অনেক মতের সাদৃশ্য দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। গ্রন্থখানিতে আগাগোড়া চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে। গ্রন্থকার কার্য্যপ্রণালীর যে সকল ইঙ্গিত করিয়াছেন, সেইগুলি অনুসরণ করিলে যে আমাদের দেশের সমূহ কল্যাণ হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শুনিতেছি, অনেক যুবক আগ্রহের সহিত এই গ্রন্থখানি পড়িতেছেন। কিন্তু শুধু যুবকগণের নহে, ইহাতে তাঁহাদের অভিভাবক বৃদ্ধগণেরও ভাবিবার ও শিখিবার অনেক জিনিষ আছে। গ্রন্থকারের বিভিন্ন মতের সঙ্গে কাহারও মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে আন্তরিকতার সহিত প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি আলোচনা করিয়াছেন, যে অদম্য কর্ম্মপ্রাণতার ভাব গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ঢালিয়া দিয়াছেন, পাঠকবর্গ সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের উন্নতির উপায় নিজে নিজে ভাবিতে শিখেন এবং সাধ্যমত কার্য্যে তাহা পরিণত করেন, তবেই এই গ্রন্থপ্রণয়নের সার্থকতা হইবে মনে করি। আর গ্রন্থকারকেও বলি, তিনি যে মহান্ ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—এই গ্রন্থখানি যাহার সামান্য পরিচয় মাত্র—ভগবান্ তাঁহাকে ঐ ব্রতসাধনের দিন দিন অধিকতর উপযুক্ত করুন। তিনি যে সাধনায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, নিরভিমানে দৃঢ়পদে সেই পথে অগ্রসর হইতে পারিলে অনেক নূতন নূতন আলোক পাইবেন ও পরিণামে ঈশ্বরকৃপায় তাহাতে সিদ্ধিলাভও করিবেন।”

৩৩। বসুমতী

“আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের অধ্যাপক স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয় ইদানীং বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল গ্রন্থ লিখিতেছেন, তাহাতে

তাঁহার ভাবুকতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সেই ভাবুকতাই তাঁহাকে ইতিমধ্যে বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্রে যশস্বী করিয়া তুলিয়াছে।

'সাধনা'র প্রতি প্রবন্ধেই লেখকের চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, অনেক অমূল্য রত্ন জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। এই গ্রন্থ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পঠিত হওয়া উচিত।

৩৪। নায়ক

'সাধনা' একখানি ভাবগ্রন্থ; নিবেদনে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, 'মাতৃভাষা আয়ত্ত করিবার প্রয়াসই জীবনের সাধনায় প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।' এরূপ সুন্দর সুমিষ্ট আশার কথা বড় একটা শুনা যায় না। বাঙ্গালার ধীমান্ পাঠকবর্গকে এ পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সাহিত্য ও ভাব উভয় হিসাবে পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে।

৩৫। সময়

লেখক সমালোচ্য পুস্তকখানিতে তাঁহার স্বাধীন মতের যে সুন্দর অভিব্যক্তি করিয়াছেন, চিন্তার যে অনন্যসাধারণ মৌলিকতা দেখাইয়াছেন, তাহার প্রশংসা শতমুখে করিলেও ফুরায় না। তাঁহার রচনাপ্রণালীতে যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও মৌলিকতা দৃষ্টিগোচর করিয়াছি, আমরা আধুনিক লেখকগণের রচনায় তাহা দেখিবার পক্ষপাতী। আমরা আশা করি, বিনয়কুমারের 'সাধনা' সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীই পাঠ করিয়া দেখিবেন। দেশের ও সমাজের উন্নতি এবং জাতীয় শিক্ষার বিকাশসাধনের নানা সঙ্কেত এই গ্রন্থে বিদ্যমান। আমরা তাঁহার গ্রন্থ হইতে 'হিন্দু ও মুসলমান' নামক একটী প্রবন্ধ এ সংখ্যার 'সময়ে'

উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতেই পাঠক তাঁহার সুগভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইবেন।"

৩৬। বঙ্গবাসী

"গ্রন্থকার ধ্যানে ভাব আনিতে পারেন, তাঁহার ভাবিবার শক্তি আছে।"

৩৭। Telegraph

The work under notice is comprised of fifteen different chapters of different themes, every one of which stands foremost in the rank of importance, interest and instructiveness. In the essay entitled 'Bangey Naba Juger Nootan Shiksha' (New teaching of the new era in Bengal) the author has very ably dwelt upon the various phases of national life, delineating the ways of creating national strength by taking recourse to self-reliance and struggling with enterprising efforts against failures. We wish we could quote passages from some of the chapters, but the limited space at our command does not permit us to do so. Under the circumstances we cannot do better than make a repetition of what Babu Akshay Chandra Sarkar observes in his introduction to the book. He says—'I doubt very much if there is a second book, written in Bengali, in which such grave and all-important subjects as those dealt with in his book, have been so ably and nicely discussed in a language absolutely free from flourish and rhetoric; and within the narrow space of 171 pages.' And in this we echo his voice."

৩৮। মানসী

শিক্ষা-সমালোচনা—গ্রন্থখানিতে মনুষ্যাত্বলাভের সোপান, চিন্তায় মৌলিকতা, চরিত্র-গঠনের উপাদান, আরোহ পদ্ধতির অধ্যাপনা-প্রণালী, জাতীয় শিক্ষা কাহাকে বলে, ভাষাশিক্ষাপ্রণালী, শিক্ষার আন্দোলন ও প্রচারক, আদর্শ শিক্ষাপ্রণালী, বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন, "স্বদেশের ইতিহাসকে সত্য-ভাবে পড়িব ও যথার্থ ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান করিয়া আমাদের এই স্বতন্ত্র সভ্যতা উদ্ধার করিতে যত্নবান্ হইব, এই ভাব প্রতি শিক্ষার্থীর মনে থাকা উচিত।" শুধু শিক্ষিত হইলে চলিবে না, চরিত্রগঠন করিতে হইবে, "সমাজ ও দেশের গুরুভার বহন করিতে হইবে।"

লেখক এই গ্রন্থে অনেক স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন। দেশের শিক্ষার অবস্থাটিকে ভাল করিয়া বুঝিয়া তাহার সম্বন্ধে তিনি যে সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। লেখকের মতে কোথাও একটুও সংকীর্ণতা নাই। "সমগ্র সমাজের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষের বিকাশ সাধন করিয়া যে শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয় প্রকৃতি ও বিশেষত্বের পরিণতি ও পূর্ণতা বিধানের সহায় হয়, সেই জাতীয় চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশসাধনোপযোগী শিক্ষাই তাঁহার মতে জাতীয় শিক্ষা।" "বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক বলিতেছেন—"আমরা শিল্পের উন্নতি বিধান করিব, নবাবিষ্কৃত বিজ্ঞানালোচনায় যত্ন করিব—পার্থিব সুখ-ভোগের দাস হইবার জন্য নহে, নূতন নূতন নিষ্কাম কর্ম্মের পন্থা আবি-ষ্কারের জন্য। আমরা স্বদেশকে ভালবাসিব, জাতীয় সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিব—বিরোধ ও বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিবার জন্য নহে, মানবসমাজের বৈচিত্র্য ও ভগবানের ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। আমরা বিজ্ঞান-সম্মত শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিব—ইউরোপের অনুকরণে সমাজগঠনের

জন্য নহে, পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রের বুক্নি লাগাইয়া জগৎকে বিজ্ঞান ও প্রকৃতিপুঞ্জের স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে ভক্তি, বৈরাগ্য ও প্রেমের অদ্ভুত সমন্বয় বুঝাইবার জন্য।"

গ্রন্থকার বাংলা ভাষায় একটা নূতন আলোচনার পথ দেখাইয়াছেন। গ্রন্থের স্থানে স্থানে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহাতে তাঁহার চিন্তাশীলতা, যত্ন ও পরিশ্রমের নিদর্শন পাওয়া যায়। সকলে তাঁহার সহিত একমত না হইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার গ্রন্থের মূল্য একটুও কমিবে না। বিনয়বাবুর যত্ন সফল হোক, তিনি এইরূপ আলোচনায় বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে থাকুন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

ঐতিহাসিক প্রবন্ধ—এই পৃথিবীর কোন্‌খানে কখন্ কি ঘটিয়াছে, শুধু তাহারই বিবরণ জানিয়া রাখাই প্রকৃত ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য নয়। ঘটনাসমূহের মধ্য দিয়া যে সত্য বিকশিত হইতেছে, তাহা সংকলন করিতে হইবে। পুরাতন মানবজাতি সহস্রযুগের অভিজ্ঞতার ফলে যে সত্যের পরিচয় পাইয়াছে, তাহা শুনিতে হইবে ও পরকে তাহার সহিত পরিচিত করিয়া দিতে হইবে। ইতিহাস এমন ভাবে আলোচনা করা উচিত, যাহাতে এই সত্যটুকু কোনো মতেই চক্ষু এড়াইয়া না যায়।

বিনয়বাবু প্রকৃত ঐতিহাসিকের মতই ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে। এমন করিয়া ইতিহাসের আলোচনা খুব অল্প লোকেই করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

"ইতিহাসের উপদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক বলিতেছেন,—"ইতিহাস একটি বিশ্বনীতিমূলক নাটক। একটি নাটক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই কবির উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বিশ্বকবিবরের কোন্ মহামন্ত্র জগতের ইতিহাস-রচনার মূলে, সভ্যতার শেষ অঙ্ক কোথায়, শেষ দৃশ্যে

কোন্ সত্য ও কোন্ বিদ্যা প্রচারিত হইয়া কোন্ অসত্যকে দলন করিবে, তাহা অবধারণ করা অসম্ভব। তবে এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্যসমাজ ক্রমশঃ শুভের পথেই চলিতেছে এবং মঙ্গলেরই জয় ঘোষণা করিতেছে।"

গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র; সুতরাং লেখক অনেক বিষয় আলোচনা করিবার সুযোগ পান নাই। আশা করি, অন্যান্য গ্রন্থে তিনি আরো চিন্তাশীলতা ও ঐতিহাসিক গবেষণার পরিচয় দিবেন। লেখকের অন্তর্দৃষ্টি আছে, তিনি যে সফলকাম হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

"বিপ্লব" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক বিপ্লবের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া বলিতেছেন,—"ইহা ক্রমবিকাশেরই ফল।" কয়টি ঐতিহাসিক বিপ্লব আলোচনা করিয়া তিনি ইহার আনুসঙ্গিক ফলও দেখাইয়াছেন। "গ্রীক ও হিন্দু" শীর্ষক প্রবন্ধে গ্রীক ও ভারতের বিশেষত্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে গ্রীকেরা রাষ্ট্রকেই প্রাধান্য দান করিয়াছিল। ভারত কিন্তু চিরকাল ব্যক্তিকেই প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। "আধুনিক ভারত" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক বলিতেছেন,—"প্রকৃত প্রস্তাবে বিদেশীয় সভ্যতা এবং শিক্ষার সুফল বাঙ্গালা দেশেই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে।" "দেশের মহান্ অতীতকে না ভুলিয়া এবং বর্ত্তমানের ভাবসমষ্টিকে অবহেলা না করিয়া ভবিষ্যতে কোন্ পথ ধরিয়া চলিতে হইবে"—তাহা ঠিক করিয়া দেওয়াই প্রকৃত নেতার কাজ। "ইতিহাস-বিজ্ঞান ও মানব জাতির আশা" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক বলিতেছেন,—"যত দিন পর্য্যন্ত পৃথিবীর ভাব ও শক্তিসমূহ নিজের প্রয়োজন মত প্রয়োগ করিয়া নূতন অবস্থা সংঘটনের সূত্রপাত করিবার উপযুক্ত একজন মাত্র ব্যক্তি থাকিবেন, তত দিন পর্য্যন্ত মানবসমাজ যুগে যুগে দেশে দেশে বিচিত্র অবস্থায় বিচিত্র তথ্যের আলোচনা করিবে, তত দিন পর্য্যন্ত মানবজাতির আশা অটুট

থাকিবে।" "ইউরোপ ও ভারত" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক ইউরোপের সম্পর্কে ভারতের কি উপকার হইয়াছে ও ভারতের সম্পর্কে ইউরোপের কি উপকার হইতে পারে, তাহারি বর্ণনা করিয়াছেন।

আশা করি, গ্রন্থখানি সকলের নিকট সমাদৃত হইবে।

৩৯। আনন্দবাজার

'সাধনা'—"গ্রন্থকার অল্পদিনের মধ্যে অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি শিক্ষাবিষয়ে বিবিধ পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার ১৫টি প্রবন্ধের সমষ্টি। 'সাধনা'য় বিনয়বাবু প্রধানতঃ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন,—"প্রত্যেক দেশের জাতির ও সমাজের ক্রমবিকাশের এক একটি ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে। সেই সেই নিয়ম মেনে চল্‌তেই হবে। সকল সমাজের প্রকৃতি এক নয়—এজন্য সকলের ব্যবস্থাও এক নয়। এক সমাজের নিয়ম আর এক সমাজের পক্ষে হানিকরও হ'তে পারে। যার যেখানে প্রাণ, সেখানটা খুঁজে বার ক'রে তবে কাজ করা উচিত।" আমরা এই কথাটা বুঝিলে আমাদের অনুকরণ-স্পৃহার অবসান হয়, স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে—ভারতের বিশেষত্ব বজায় থাকে—আমাদের প্রকৃত উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়। বিনয়বাবুর গ্রন্থখানি আমাদের বিশেষ আদরের।"

ইতিহাসের বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা—"এই নাম দিয়া ন্যাশনাল্ কলেজের সুযোগ্য ও সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্, এ. মহাশয় একখানি ক্ষুদ্র অথচ অতি সারগর্ভ গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা যেমন চিত্তাকর্ষী, তেমনই স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল ও প্রসন্নগম্ভীর। ইংরাজ সাহিত্যিকগণও এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব এবং ভাষার মনোহারিত্ব সম্বন্ধে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। অধুনা পাশ্চাত্য প্রদেশে বৈজ্ঞানিক

প্রণালীর পারিপার্শ্বিক কিরণ-সম্পাতে ঐতিহাসিক সত্য পাঠ ও সত্য সমীক্ষার প্রবর্ত্তন ক্রমশঃই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। অধ্যাপক সরকার মহোদয় অতি সংক্ষেপে অথচ পরিষ্কাররূপে সেই প্রণালীর সার মর্ম্ম পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এইরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করা ইউরোপীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণের পক্ষেও জ্ঞানগরিমার গৌরবোদ্দীপক।

আমরা এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে বিনয়বাবুর গভীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিস্ফুট ও সমুজ্জ্বল নিদর্শন দেখিতে পাইয়া যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিলাম। বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণ যদি ভারতীয় ইতিহাসের তথ্যনিচয় সঙ্কলন করিয়া বিনয়বাবুর হস্তে প্রদান করিতে পারেন, তবে এ দেশের ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রত্যেক স্তর হইতে তিনি যে সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে বহুল ঐতিহাসিক সত্যের শৃঙ্খলাবদ্ধ সন্দর্ভ ও উদাহরণ দ্বারা এক অভিনব ভারতীয় ইতিহাস-বিজ্ঞান প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইবেন, এ বিষয়ে আমাদের অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভারতের প্রকৃত ইতিহাস এখনও আমাদের জ্ঞানের বহু অন্তরালে অবস্থিত। উপাদান প্রভৃতির যদিও অত্যন্ত অসদ্ভাব নাই, কিন্তু অধ্যয়নশ্রম ও পাণ্ডিত্য-প্রতিভা এখন কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োজিত না হওয়ায় আমাদের এই অভাব এখনও অপনোদিত হয় নাই। কিন্তু অধুনা ক্রমশঃ আমাদের হৃদয়ে অভিনব আশার কনক-কিরণ উদ্ভাসিত হইতেছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারের ন্যায় কর্ম্মধ্যানমজ্জিত জ্ঞানসমুজ্জ্বল কর্ম্মবীরগণের কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণে এই সকল বিষয়ের নবীন আলোকে আমাদের সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতির অনেক তথ্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রকটিত হইয়া পড়িবে—আমাদের মনে এই আশা ক্রমশঃই বলবতী হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদানের অপ্রচুরতায় যদিও ভারতীয় ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত হয় নাই; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যখন আমরা ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিতে

পাইব, তখন এ অভাবও পরিলক্ষিত হইবে না, ইহা নিশ্চয়। আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠে আশাতীত আনন্দলাভ করিলাম।"

শিক্ষা বিজ্ঞান—"উদ্যমমূর্ত্তি কর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্, এ, বঙ্গীয় জাতীয় বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক। বিনয় বাবু এখন কেবল বঙ্গদেশে নয়, ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র জগতে সুপরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠা সকলেরই সুবিদিত। শিক্ষা বিস্তার ভিন্ন জাতীয় উন্নতি-সাধনের অন্য উপায় নাই। বিনয় বাবু দেশের অবনতির এই প্রকৃত নিদান লক্ষ্য করিয়াছেন। যে উপায়ে এই শিক্ষাহীনতারূপ উৎকট ব্যাধির প্রতীকার হইতে পারে, তিনি সে উপায়ও দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা, ইংরাজী ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা এই তিন ভাষা অবলম্বনে বাঙ্গালীদের শিক্ষোন্নতির পথ প্রশস্ত ও প্রসরতর হইবে। বিনয় বাবু এই তিনটি ভাষা-শিক্ষারই সুগম উপায় প্রদর্শন করিবার জন্য শিক্ষা-বিজ্ঞান নামে খণ্ডে খণ্ডে অনেকগুলি গ্রন্থ উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে প্রকাশিত করিয়া শিক্ষা-বিস্তারপ্রয়াসী দেশহিতৈষিগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া আমা-দের অনন্ত ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই সকল কার্য্যের জন্য বিনয় বাবু চিরদিনই দেবতা ও মানব-সমাজের শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন। আমরা তাঁহার এই গ্রন্থগুলি দেখিয়া বাস্তবিকই পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই সকল গ্রন্থ শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষা-সৌকর্য্যের যে যথেষ্ট সহায়স্বরূপ হইবে, তৎপক্ষে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। বিনয় বাবু সুদীর্ঘ জীবন, অনবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্য, অনন্ত শান্তি, অপ্রতিহত অধ্যবসায় ও অনন্ত উদ্যম লইয়া দেশের শিক্ষোন্নতি সাধন করুন, ইহাই আমাদের আশীর্ব্বাদ।"

৪০। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"স্বদেশের ও বিদেশের

অতীত কথার আলোচনা করিয়া তাহা হইতে শিক্ষালাভের চেষ্টা দেখি না। * * কেবল একটি উদাহরণ মনে পড়ে, সে স্বর্গগত ভূদেব মুখোপাধ্যায়। * * বাঙ্গালাদেশে একটী বই ভূদেব জন্মিল না। * * হায় বাঙ্গালা দেশ! * * শ্রীমান্ বিনয়কুমার সরকার উৎসাহশীল অধ্যবসায়শীল যুবা। এই তরুণ বয়সে ইঁহার উদ্যমের পরিচয় পাইয়া আশার সঞ্চার হয়। ইনি স্বদেশের ও বিদেশের অতীত কথার আলোচনা করিতেছেন; সেই তুলনা-মূলক আলোচনায় যে উপদেশ পাওয়া যায়, তাহার অর্জ্জনে উদ্যম করিতেছেন। * প্রত্যেক প্রবন্ধে একটা আকাঙ্ক্ষার ও আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইবে।”

৪১। কবিবর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্, এ, সি, এস, ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্‌স জজ ‘শিক্ষাসমালোচনা’ সম্বন্ধে বলেন,—“এই পুস্তকে কর্ম্ম জ্ঞানের অঙ্গীভূত। কর্ম্মের দ্বারাই জ্ঞানার্জ্জন কর, আবার জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার বৃদ্ধি কর ও প্রকার নির্ব্বাচন কর। * * সামাজিক জীবনে চরিত্র-গঠন; রাজনৈতিক জীবনে শক্তির পরিচালনা; বিজ্ঞান-জগতে প্রকৃতির গুপ্তাগারে রক্ষিত রহস্য কাড়িয়া লইবার জন্য প্রকৃতির সহিত সম্মুখ-সমর। * * কথাটা ভাল—উন্নতির জন্য * * হৃদয়ঙ্গম করিবার যোগ্য। পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস ইহাই জ্ঞাপন করে। পুস্তক-বর্ণিত শিক্ষার ‘আরোহ-প্রণালীর’ উদ্দেশ্যও এই। ইউরোপীয় শিক্ষাবিজ্ঞানবিদেরা এই মতের সমর্থন করেন। * * কিন্তু যদিও বিনয়কুমার পশ্চিম মুখে গমনশীল, তাঁহার উদ্দেশ্য সূর্য্যাস্ত দেশের মণিরত্ন আহরণ করিয়া নিজের ঘরে ফেরা। সকল জ্ঞান বঙ্গভাষাতেই অর্জ্জন করিতে হইবে। সকল রত্নই বঙ্গ-সরস্বতীকে সমলঙ্কৃত করিবে। * * ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে পুস্তকে যে আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা যথার্থই আশাপ্রদ। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ধর্ম্মশিক্ষার অবান্তর সহায় হইলেও

মুখ্য উপায় নয়। তাহার জন্য কর্ম্মের আবশ্যক, নিষ্ঠার আবশ্যক, সাধনার আবশ্যক, ত্যাগের আবশ্যক। ব্যক্তিগত জীবনের অশেষ বিচিত্রতার মধ্যে একটি চরম লক্ষ্যের জীবন্ত অনুপ্রাণনা ও সর্ব্বমুখী প্রভাবের আবশ্যক।"

42. The World's Messenger

"Sixty years ago, in Bengal, a remarkable man Pandit Iswar Chandra Vidyasagar shortened the road to the study of Sanskrit language by introducing a short and easy Sanskrit grammar in Bengali after abridging and simplifying Shiddhanta Kaumudi. Pandit Vidyasagar's chief aim was to quicken the road to Sanskrit learning. " One who shortens the road to knowledge lengthens life" is the saying of a great man. Pandit Vidyasagar's grammar was certainly a great improvement on the old method. During sixty years the method of teaching Sanskrit has been exactly where the great pioneer left it. After sixty years we notice with great pleasure that the work of Pandit Vidyasagar has been taken in hand by Professor Sarkar whose profound research in this direction has rendered to the public a conspicuous service. His **Sanskrita Shiksha** or Lessons on Sanskrit is **a new and important departure from the track of Vidyasagar**. It is based on a plan which is fundamentally opposed to the old and orthodox method of study, but is, as recognised by eminent educationists, calculated to prove of practical value to those who set themselves to learn or to teach the language.

Now the Government has taken up the cause of oriental learning in right earnest and has decided to en-

courage Sanskrit scholarship. We can reasonably hope that a fair trial will be given to the new manuals of Professor Sarkar.

43. THE TELEGRAPH.

The Science of History and the Hope of Mankind.—This is a book complete in 76 pages divided in ten chapters, each dealing with different phases of history. The author of this small work is Srijut Benoy Kumar Sarkar, M. A., Lecturer in Political Science, Bengal National College, Calcutta, who also claims the authorship of "The Aids to General Culture Series" in English and "The Science of Education and the Inductive Method of Teaching Series" in Bengali. Srijut Benoy Kumar has already made his mark in the field of literature and has acquired enough of reputation to need fresh introduction at our hands. The work under review is, as we see in the preface, based on the Lectures on the Science of history, delivered by the author to his classes in History at the National College. Judging the smallness of the book and the importance of its contents we are bound to say that it is a bit of solid precious metal with bright lustre not to be compared with a large heap of ashes with very little of value and material interest in them. Every chapter of the book is interesting, every page of the book bears the weight and importance of volumes of Science and Philosophy. Unfortunately our space is too limited to allow us to dwell in details on all the points touched and discussed by the author within the short and limited seventy-six pages, but at the same

time though it would not be absolutely impossible to review at least some one of them for the sake of justice, yet we are compelled to refrain from so doing apprehending injustice to the others thereby. The book is not the narration of mere incidental facts such as conflicts between States which ensue through certain bones of contention, vacancy and succession, battles fought and treaties concluded, so on and so forth; but it is a philosophy of the different aspects of life of the races and nations as well as the causes and effects of the social and physical atmosphere of an individual and a nation. In short the book says what History is and directs the lines to be adopted in teaching and studying History. This is, we believe, the first of its kind in India and we congratulate the author on the success he has achieved in his attempt to throw a new light on the lines of the study of History. The book is published by Messrs. Longmans, Green and Co. 39 Paternoster Row, London, New York, Bombay, and Calcutta; and has been priced at 2s. 6d. per copy."

44. Babu Sarat Chandra Ray, *M.A., B.L.,*

in the Modern Review, for January 1912.

The Science of History and The Hope of Mankind by Prof. Benoy Kumar Sarkar, M. A. (London: Longmans, Green, & Co. 2s. 6d.)

"Of late years it has been the fashion to consider human history as merely a department of Biology, and human society as a phenomenon, albeit the highest phenomenon, in the science of life. The principles and

methods of Biology appear to us to be carried beyond their appropriate limits when they are transferred to the domain of the mind and the soul. As intellect and soul are the very possessions that mark off man from the lower animals. Dr. J. G. Fraser of Cambridge rightly deprecated such attempts at what he called reducing "multiformity of fact to uniformity of theory." The learned writer of the essay under review follows the current fashion when at the end of sec. II, he declares —"Biology is thus the true basis of Sociology and the Science of History. Founded on the Science of Life, History will be competent to formulate clear and definite principles about the course of human progress, the development of society and the evolution of civilisation." Our author's practice, however, is better than his precept. Indeed, a writer of Prof. Sarkar's learning and acumen could not have failed to see that man has, to no small extent, been his own 'history-maker.' Section IX of the essay under review shows that its author fully recognises the part that men of high individuality—men of genius, great thinkers, patriots, philanthropists and other men of action—have taken in the making of human history. Barring the passages which show a tendency to exaggerate the claims of Biology, the whole of **this interesting essay deserves unqualified praise.** The only other defect which the critic might perhaps pick out is that the race-factor in the problem has not been brought out in as clear a light as the factor of environment has been. But this appears to have been due to the limited space at the author's disposal.

We expect great things from Prof. Sarkar in the not distant future. So far as it goes, the essay under reveiw is an exceedingly suggestive and well-written one. And, we are sure, our readers will profit immensely by a study of this instructive little book."

45. The Ceylon Patriot—'The Place of Vernaculars in Higher Education'.

"Our views on this subject are being confirmed by several writers; and in India there is a growing conviction among educationists about the inadequacy of a foreign language as a permanent medium of instruction for higher studies. Psychologically, it is an untenable proposition to lay down that a foreign tongue can be as efficacious a medium for instruction as one's own mother-tongue.

On this subject we come across the following passage in the *Collegian and Progress of India*, an excellent bi-monthly educational Magazine and Review, Calcutta (No. I., November, 1912).

"If there is anything that retards the progress of education in India it is the compulsion to learn every subject through a language that is not the pupil's mother-tongue. It is this that explains the lack of originalityin our student folk and accounts for the abstract, unpractical turn of mind that characterises the educated section of the Indian community. It is therefore in the fitness of things that Prof. B. K. Sarkar, the advocate of the theory that the student should be regarded not merely as a learner

but as "the *discoverer* of truths and a pioneer of learning" should in his *Educational Creed* give due importance to the vernaculars. We refer to the following two articles in the *Creed* :—

1. The mother-tongue must be made the medium of instruction in all subjects and through all standards And if in India the provincial languages are really inadequate and poor the educationists must make it a point to develop and enrich them within the shortest possible time by a system of patronage and endowments on the 'protective principle'.

2. Two Foreign languages besides English and at least two provincial vernaculars must be made compulsory for all *higher culture* in India "

46 The Vedic Magazine and the Gurukula Samachar (Hardwar)

"It is indeed a notable sign of the times that leaders of thought all over the country are coming round to the view that the Gurukula System of Education alone can save the tottering civilization of the ancient Aryans and produce men of culture that will lead India to heights of glory, advancement, and progress. Professor B. K Sarkar, M.A., the eminent Calcutta educationist, contributes an excellent article to the December number of the "Collegian" on "the Educational Institutions and Message of Ancient India" in which he proves in forcible, eloquent and convincing language that the graduates of ancient seminaries did not get an extra doze of other-worldiness but acquitted themselves creditably as worthy citizens making a mark in all professions, walks of life

and departments of human activity, and states the mission of New India—a New India which is not ashamed of acknowledging the parentage of the past and hopes to transmit untarnished its splendid inheritance.

47. Amrita Bazar Patrika

Shiksha Bijnan :—"The author is a well-known scholar and a highly reputed author of several works much appreciated by the educationists of this country. The series in Bengali named Shiksha Bijnan containing the Inductive method of teaching reflect really a very great credit to the author, and we have no doubt that they are calculated to render a very great service in the direction of teaching the Sanskrit and English languages in the schools in Bengal. Method and order serve to facilitate all sorts of works, however heavy they may be, in less time and with less exertion, and thus they tend to help the workers to proceed rapidly onward to attain progress and success. Language is the medium through which all sorts of instructions are imparted. For the Indians, a knowledge of the English and Sanskrit languages is indispensably necessary and our worthy author has devoted his energy to the easy method of teaching these two languages, to the immense benefit of those for whom they are intended. The method adopted in these works is, we are very much pleased to see, based on the natural process of learning one's own mother-tongue. In order to make it scientific, the method of teaching must have a psychological basis without which it cannot be rendered easy and natural. Of course we cannot expect its rapid growth and development at the present as our

knowledge on the subject is very meagre, but still we can expect that our scholars here will work steadily for its advancement. Every one interested in the education of our children ought to thank most cordially the most energetic and self-less author of these works to whose patriotic and noble exertions we owe this and other beacon lights of such a useful and beautiful method of teaching."

48. THE 'MODERN REVIEW' ON THE HINDI EDITIONS

1. Hindu Sahitya-procharak

"Herein we find a plea for the better encouragement of the ancient Sanskrit literature in its various forms on the part of the Indians The writer rightly deplores the comparative laxity shown in this respect by the Indians, when much is being done in this direction by the Germans, Englishmen, etc.

2. Shiksha Vijnan ki-Bhumika.

"The writer of the pamphlet, who is a distinguished alumnus of the Calcutta University is doing much good work in his unostentatious manner. A gigantic and ambitious scheme of writing a voluminous book in several parts on the art of teaching has been formulated in this book. For aught we know, the writer has had no special training in the modern methods of education,—however in his introduction he has unknowingly given expressions to some of their principles. They have no doubt some special characteristics of their own and we hope, if given a trial, they will have success. Indeed any method systematically followed cannot but

have its success and though only time will solve the question what value to attach to Prof. Sarkar's scheme, we can see that much careful attention has been given to it. The translation has been done in chaste and correct style by one who has considerable mastery over the Hindi language."

৪৯। 'প্রতিভা'য় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ এম, এ, বিএল,

'The Science of History and the Hope of Mankind.'

নূতন প্রণালীতে আলোচিত হইলে পুরাতন সিদ্ধান্তও নূতন অর্থ-সমন্বিত হয়। যেমন কোন পদার্থকে চিরাভ্যস্ত দিক্ হইতে না দেখিয়া নূতন দিক্ হইতে দেখিলে তাহা নূতন বলিয়া বোধ হয়, তাহার অনেক অজ্ঞাত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। যাহা পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ছিল, বিনয়বাবুর আলোচনার ফলে তাহা স্পষ্টীকৃত এবং সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিনয়বাবু যে অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব সে কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। আমাদের দেশে ইতিহাসের আলোচনাই হইয়াছে কম। যতটুকু আলোচিত হইয়াছে তাহাতে যে এই অভিনব প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

50. Secretary, Hindu Religious Union, Trichinopoly Madras.

"Steps to a University"

I read with much interest your elaborate syllabus of modern intellectual culture. It is so scientific and natural. I only wish that my countrymen here may see their way to start and conduct at least one small institution on those lines.

The most charming contribution of yours to education is that in. "The Pedagogy of the Hindus" I have read it a number of times and I beg to thank you sincerely for your emphasising spiritual training and insisting on going back to 'domestic system' of education.

51. Dr. Brajendra Nath Seal, M. A., Ph. D. King George Professor cf Philosophy in Calcutta University.

"Professor Benoy Kumar Sarkar's scheme of educational works is based on sound and advanced ideas of Educational Science, and, as such, is well calculated to impart a valuable stimulus to the diffusion of culture in the country. Professor Sarkar's notes on **Mediæval** and **Modern History,** on **Economics,** and on **Politics,** show wide knowledge of the subject matter, and are evidently the outcome of a mind trained in habits of clear, patient, and accurate thinking. His brochure on the **Study of Language** may serve as a useful summary of present-day ideas on the subject, and he has given practical illustrations of some of these in his **Lessons on English** and on **Sanskrit,** which, so far as they go, specially the latter, are an improvement on existing Guides and Hand-books. Professor Sarkar's programme is certainly an ambitious one, but he is fully qualified to carry it out ; and there can be no doubt that it will be found to be a healthy and stimulating force in the Indian educational world of to-day, especially with the correction and expansion it must receive in the light of practice and experience."

৫২। প্রতিভা

সাধনা—এই গ্রন্থে প্রধানতঃ বর্ত্তমান সময়ের কয়েকটি সমস্যা আলোচিত হইয়াছে। 'বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা', 'হিন্দু ও মুসলমান,' বাঙ্গালা -সাহিত্য তথা হিন্দুসাহিত্য, 'আমাদের কর্ত্তব্য' প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের স্বাধীন ও সংযত আলোচনা দ্বারা গ্রন্থকার হিন্দুজাতির উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় কি তাহাই নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন? তাঁহার মতে, হিন্দুর জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কাজ করিলে আমরা কখনও প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। গ্রন্থোক্ত সকল মতগুলিই সর্ব্বসাধারণ্যে গৃহীত না হইতে পারে, কিন্তু গ্রন্থের সর্ব্বত্রই যে চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সর্ব্বথা প্রশংসার্হ। গ্রন্থের আর একটী গুণ, গ্রন্থকারের ব্যক্তিত্বের (personality) আশ্চর্য্য অভিব্যক্তি। গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে এইকথাই বিশেষ করিয়া মনে হয় যে, গ্রন্থকার কেবল তর্কের খাতিরে অথবা পাণ্ডিত্য বিকাশের জন্য কিছুই লেখেন নাই। তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহার যাথার্থ্য তিনি বিশেষ ভাবে স্বীয় হৃদয়েই উপলব্ধি করিয়াছেন। গ্রন্থোক্ত সত্যগুলি তাঁহার ঐকান্তিকী সাধনার ফল। আলোচ্য পুস্তকখানি বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

53. THE MODERN REVIEW:

The Pedagogy of the Hindus.

In this little brochure Professor Sarkar has provided us with much wholesome food for thought. The first part is devoted to an exposition of the antagonism in the western system of education between religion and learning, faith and culture, religious education in the west being mainly a branch of intellectual culture and

having little or nothing to do with one's practical life. This rivalry is, in the opinion of the writer, due to the fact that western life is not dominated and controlled by the spiritual sense. The western view of man is that he is a pigmy surrounded by mighty natural forces which are the sole reality The soul, which is super-sensuous and transcends all limitations, is taken little count of and life consequently becomes a matter of compromise with our environment. In the Indian system of education which the author calls the "Cottage" system as opposed to the "Factory" system of Europe where production on a large scale is aimed at, religion is not opposed by reason, and harmony between worldliness and other-worldliness, attachment and renunciation, has been realised. Under that system the arts, industries and commerce of India flourished exceedingly. The graduates trained up under it were competent to found and administer states, and could build up a Grater India beyond the seas. The domestic system of education under a Guru trained the whole life of the student in methods of **self-control** and **social service**. It was therefore a successful system, and in the learned professor's opinion is still the one thing needful. 'Modern civilization has no doubt developed one or two characteristic products' but 'India can surely assimilate the scientific methods of the west' without denationalising her educational system.

"We will demonstrate that equality is not an apology for hiding real inequalities and self-aggrandisements, and that inequality, is not necessarily a hindrance to

real equality, love and fellow-feeling. It will be our mission to prove to mankind that it is possible for an individual to give up all worldly cares and anxieties and live a life of contentment and solitude after one of real absorption in the secular interests of the world, that it is possible for man to maintain his faith and reverence even while undertaking scientific investigations, and that it is possible for a man, who has been in the householder's stage a political leader, social dictator or an organiser of economic concerns, to adopt the retired life of a 'Muni' in old age and wait for passing away by practising yoga. It is for the propagation of this message that the Hindu is still alive."

Professor Sarkar writes eloquently and thoughtfully, and what is more, he has faith in his mission and has devoted his life to the building up of an educational scheme on a strictly national basis. His plea for what he calls 'cottage' education, therefore, deserves careful consideration.